প্রথম প্রকাশ
ভাদ্র ১৩৯০
আগষ্ট, ১৯৮৩

প্রকাশক
নীহার দাশগুপ্ত
ইণ্ডিয়ান রেনেসাঁ পাবলিকেশনস্
৪।২এ, ওয়াটার্লু স্ট্রীট
কলকাতা-৬৯

মুদ্রাকর
শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রিন্টার্স
১৩৮ বিধান সরণী
কলকাতা-৪

প্রচ্ছদশিল্পী
খালেদ চৌধুরী

আলোকচিত্র
ল্যাণ্ড অ্যাণ্ড লাইফ

পরিবেশক
করুণা প্রকাশনী
১৮এ, টেমার লেন
কলকাতা-৯

রাজ্যের বাম আন্দোলনের

অন্যতম পুরোধা, অকৃত্রিম সুহৃদ

অশোক ঘোষ-কে

কৃত্তিবাস ওঝা

ছাব্বিশে আগষ্ট। উনিশশো তিরাশি॥

সবিনয় নিবেদন

'চরকা-বুলেট-ব্যালট' বই-এর কোনো ভূমিকার প্রয়োজন নেই। বই তার নিজের কথা নিজেই বলবে। তবে প্রয়োজন আছে ঋণ স্বীকারের; কৃতজ্ঞতা প্রকাশের। এই বই লেখার ক্ষেত্রে যাঁর কাছে আমার ঋণ ও কৃতজ্ঞতার সীমা নেই, তাঁর কানে আজ কোনো কথাই পৌঁছবে না। যদি কয়েকমাস আগে বইখানা প্রকাশিত হতো, তাহলে হয়ত যাঁর জীবন ভিত্তি করে এই বই, তাঁর হাতেই এই বই প্রথম তুলে দিয়ে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ পেতাম।

অনেকদিন আগে থেকেই আমার সাংবাদিক জীবনের অভ্যাসমতো প্রমোদ দাশগুপ্তর সঙ্গে যে কোনো আলোচনার সময় যখন নোট বইতে নোট করতাম, তখন মাঝে মাঝে তিনি প্রশ্ন করতেন, এগুলো কি খবর যে লিখছেন? আমি বলতাম, না—শুধু খবরের জন্য নয়, নোট করে রাখি, কখন কী কাজে লাগে। উনিশশো তেষট্টি/চৌষট্টি সাল থেকে আমি পাকা নোট বই ব্যবহার করি। গত দুই দশকের রাজ্য-রাজনীতির প্রায় প্রতিটি ঘটনা আমার এই সব দিনলিপিতে আছে।

প্রমোদ দাশগুপ্তকে চিনতাম বাহান্ন সাল থেকে। কিন্তু সে চেনার অঙ্গন ছিল আলাদা। একষট্টি সালের পর তাঁকে কাছে থেকে দেখবার নতুন ক্ষেত্র তৈরি হলো সাংবাদিকতায় প্রবেশ করে। চৌষট্টি সাল থেকে প্রায় প্রতিদিন (কোলকাতায় থাকলে) প্রমোদ দাশগুপ্তর সঙ্গে দেখা করা, কথা বলা অন্য পাঁচজন সাংবাদিকের মতো আমারও ছিল নিত্য দিনের কাজ।

'একাশি সালে 'সত্যযুগ' সম্পাদক জীবনলাল বন্দ্যোপাধ্যায় শারদীয়া সংখ্যার লেখা প্রসঙ্গে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কী লিখবেন?—আমি বললাম একটা লেখার কথা ভেবে নিজেকে প্রস্তুত করেছি, কিন্তু সেটা এখনো বেশ সময়-সাপেক্ষ। লেখার বিষয় কী, জানতে চাইলে বললাম প্রমোদ দাশগুপ্তর জীবনী। সামান্য একটু বিবরণ শুনে জীবনবাবু প্রায় লাফিয়ে উঠলেন, বললেন, যেভাবে হোক লেখাটা শেষ করুন।

প্রমোদ দাশগুপ্তর জীবনী লিখতে সবচেয়ে জরুরী প্রয়োজন ছিল, যাঁর জীবনী লিখছি তাঁর সঙ্গে কথা বলা। জীবিত ব্যক্তির জীবনী লেখা (বিশেষ করে সেই

ব্যক্তি যদি হন প্রমোদ দাশগুপ্তর মতো মানুষ) খুবই কঠিন কাজ। শরণাপন্ন হলাম সরোজ মুখোপাধ্যায় ও অনিল বিশ্বাসের। দুজনের কাছেই বুঝিয়ে বললাম প্রমোদ দাশগুপ্তর জীবনী লিখতে চাই। দীর্ঘ বিশ বছরে সংগ্রহ করা নানা তথ্য আমার কাছে আছে, কিন্তু প্রমোদবাবুর নিজের কাছ থেকেও কিছু শোনা এবং আমার কিছু প্রশ্নের জবাব পাওয়া দরকার। সরোজ মুখোপাধ্যায় ও অনিল বিশ্বাস সহযোগী হলেন এবং প্রমোদ দাশগুপ্ত রাজি হলেন তাঁর জীবন নিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলতে। বসলাম প্রমোদ দাশগুপ্তর মুখোমুখি। শরীর খুব খারাপ, তবু আমার সঙ্গে কথা বলেছেন একাধিক দিন। ছোটবেলার কথা, পারিবারিক জীবনের কথা, রাজনৈতিক জীবনের কথা। তাই ঋণী এবং কৃতজ্ঞ যেমন প্রমোদ দাশগুপ্তর কাছে, তেমনি সরোজ মুখোপাধ্যায় ও অনিল বিশ্বাসের কাছে। অনিল বিশ্বাসের সহযোগিতায় প্রমোদ দাশগুপ্তর ভাইবোনদের কাছেও পৌঁছেছি, গেছি বহরমপুর। মানিক দাশগুপ্ত শুধু দাদার জীবনের কথা নয়, কয়েকখানা দুর্লভ ছবি অ্যালবাম থেকে খুলে আমাকে দিয়েছেন। অনিল বিশ্বাস সহযোগিতা না করলে প্রমোদ দাশগুপ্তর আবাল্য সুহৃদ হরিচরণ নাথের কাছ থেকে অনেক অমূল্য উপাদান পাওয়া কিছুতেই সম্ভব হত না। কৃতজ্ঞ বিশেষ করে দুজন সাংবাদিক বন্ধুর কাছে, শ্রীপ্রফুল্ল রায়চৌধুরী ও শ্রীঅরুণ দাশগুপ্ত যাঁরা তাঁদের প্রথম জীবনে স্বাধীনতা পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত থেকে প্রমোদ দাশগুপ্তকে দেখেছেন খুব কাছাকাছি। এই বই প্রকাশের ক্ষেত্রেও তাঁদের উৎসাহের সীমা ছিলনা।

কিন্তু শারদীয়া সত্যযুগে লেখা প্রকাশিত হলনা। কারণ, জীবনলাল বন্দোপাধ্যায়ের মাথায় তখন নতুন পরিকল্পনা এসেছে। সাপ্তাহিক সত্যযুগ বার হবে। তাতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে প্রমোদ দাশগুপ্তর জীবন-ভিত্তিক 'চরকা-বুলেট ব্যালট'। শারদীয়া সত্যযুগ প্রকাশিত হবার অনেকদিন পরে প্রমোদ দাশগুপ্ত একদিন জিজ্ঞাসা করলেন,—কী, শারদীয়া সত্যযুগে কিছু লিখলেন না? —আমি বললাম, আপনার জীবনী একটা প্রবন্ধ নয়, সম্পূর্ণ বইয়ের আকৃতি নিয়েছে। সত্যযুগ সাপ্তাহিক বেরোচ্ছে এবং তা শুরু হবে আপনার ধারাবাহিক জীবনী প্রকাশের মধ্য দিয়ে

ওরা ব্যবসা করতে চায়। ছোট্টো মন্তব্য করেন তিনি। ব্যবসা কেন? পত্রিকা বার করতে চায়।—আমি জবাব দিলাম। হুঁ—একটা শব্দ করে প্রসঙ্গান্তরে গেলেন।

পত্রিকা প্রকাশের আগে একদিন জিজ্ঞাসা করলাম, পত্রিকা তো বেরোচ্ছে, লেখাটা একটু দেখবেন ?—না না, অত সময় আমার নেই, বাবার নামতো ভুল লেখেন নি।—স্বভাবসিদ্ধ জবাব দিলেন তিনি। সাপ্তাহিক সত্যযুগ বার হতেই প্রথম সংখ্যা হাতে দিলাম। একটু পাতা উলটে দেখে রেখে দিলেন। আমার ভয় ছিল নামটা নিয়েই। মূলতঃ প্রমোদ দাশগুপ্তর জীবনী লিখছি, অথচ নাম হল, চরকা-বুলেট-ব্যালট। এরপর দু-একদিন একটু ভয়ে ভয়েই গেছি। কিন্তু কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখান নি। সাপ্তাহিক সত্যযুগে ধারাবাহিকভাবে বার হচ্ছে 'চরকা-বুলেট-ব্যালট'। প্রতি সংখ্যা প্রমোদ দাশগুপ্তর কাছে যায়। একসময় কয়েক সংখ্যা প্রমোদবাবুর কাছে যায় নি। আমি নিজেও বাইরে ছিলাম। ফিরে এসে দেখা করতেই বললেন, আপনার পত্রিকা কি বন্ধ হয়ে গেছে ? —কেন ? আপনি পাচ্ছেন না ? —প্রশ্ন করি আমি। অনিল বিশ্বাস বললেন, না কয়েকসংখ্যা আসেনি। আমি বললাম, কালই সব সংখ্যাগুলো দিয়ে যাবো। —আমি ভাবলাম বন্ধ হয়ে গেছে বুঝি—জীবনের তো কাজ —বলা যায় না। প্রমোদ দাশগুপ্তর কথায় সকলেই হাসলেন।

'চরকা-বুলেট-ব্যালট' নিছক জীবনীগ্রন্থ নয়—বাংলার রাজনীতির নানা উত্থান-পতনের কাহিনী। বেশ বিতর্কিত বিষয়ও বার হচ্ছে। কিন্তু একটা দিনের জন্যেও শুনিনি—এই তথ্যটা ভুল লিখছেন বা এই তথ্যটা ঠিক নয়। ভুল বা ত্রুটি কি কিছু ছিল না ? —নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু তিনি কোনো তুচ্ছ ত্রুটি বিচ্যুতি নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। চোখের দৃষ্টিকে অনেক উঁচুতে রেখে সব দেখাই ছিল তাঁর স্বভাব। এই বই নিয়ে, বইয়ের বহু রাজনৈতিক তথ্য নিয়ে আজ হয়ত অনেক প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু আমার দিক থেকে সবচেয়ে বড় ভরসা এবং আনন্দের কথা প্রমোদ দাশগুপ্ত 'চরকা-বুলেট-ব্যালট' পড়ে গেছেন।

প্রমোদ দাশগুপ্ত পিকিং-এ আছেন। খবর আসছে কখনও ভালো কখনও খারাপ। একদিন রাত্রে তৎকালীন বার্তা সম্পাদক (সত্যযুগের) প্রায় শেষ রাত্রে আমায় টেলিফোন করে জানালেন যে, এইমাত্র গণশক্তি পত্রিকা থেকে একজন এসে সাপ্তাহিক সত্যযুগের 'চরকা-বুলেট-ব্যালট'-এর সব সংখ্যাগুলো নিয়ে গেলেন। ব্যাপার ভালো মনে হচ্ছে না। তার দিন দুই পর দুপুরে অফিসে যেতেই টেলিপ্রিন্টারে ফ্ল্যাশ—প্রমোদ দাশগুপ্ত আর নেই।

এই বইয়ের জন্য অজস্র বই ও ব্যক্তির রচনা থেকে সাহায্য নিয়েছি। বইয়ের

ভিতরেই সেই বইয়ের লেখকের নাম উল্লেখ করেছি। সব লেখকের অনুমতি গ্রহণ সম্ভব হয়নি। তাই সেই গ্রন্থকার ও রচয়িতাদের উদ্দেশ্যে আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

শ্রীনীহার দাশগুপ্ত এই বইয়ের প্রকাশক বলে এবং বই প্রকাশের জন্য তাঁর পরিশ্রমের উল্লেখ করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে তাঁকে ছোটই করা হবে। তিনি এই বই প্রকাশের মধ্য দিয়ে প্রমোদ দাশগুপ্তর প্রতি তাঁর অতীত জীবনের প্রীতি ও শ্রদ্ধার ছবিটাকেই তুলে ধরতে চেয়েছেন। আমি সেখানে উপলক্ষ্য মাত্র।

কৃত্তিবাস ওঝা

এক

চরকা-বুলেট-ব্যালট। তিনটি কাল। কালের আধারে ধরা পড়েছে তিনটি যুগ। এই তিন যুগের ছবি আলাদা। চরিত্র আলাদা। চরকার যুগে নিজ হাতে সুতো কাটা ও সেই সুতোয় তৈরী জামা-কাপড় পরার মধ্য দিয়েই প্রতিফলিত হয়েছে ভারতবর্ষের জনসাধারণের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা। স্বাধীনতার স্বরূপ অজ্ঞাত। সম্ভাবনা সম্পর্কেও সম্যক জ্ঞান নেই। তবু বাংলার ঘরে ঘরে চরকার ঘর্ঘর। গ্রামের গৃহবধূ থেকে সুরু করে শহর পর্যন্ত সর্বত্র আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা চরকা কাটে। কেউ বা নিজের চরকায়, কেউ কেউ মিলিতভাবে অন্যের চরকায়। সেই সুতোয় তৈরী জামা-কাপড় পরাই হল স্বদেশী করা! সেই স্বদেশীর দীক্ষায় দীক্ষিত হয়েছে বাংলার মানুষ।

ভারতের রাজনীতিতে যোগদান করেছেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। 'মহাত্মা গান্ধী' নামে তিনি সুপরিচিত হয়ে উঠেছেন। সর্বত্র একটি কথা যাদুমন্ত্রের মতো চালু হয়ে গিয়েছে—এক বছর চরকা কাটলেই 'স্বরাজ'। 'স্বাধীনতা' কথাটি তখনও বহুল উচ্চারিত নয়। 'স্বরাজ' শব্দের মধ্য দিয়েই স্বাধীনতার মর্মবাণী প্রতিফলিত। 'গান্ধীজী' 'স্বরাজ'—এই সব কথা যাদের কাছে শুধু শব্দমাত্র, তারাও চরকা কাটে। সব চরকায় হয়ত সুতো ওঠে না। উঠলেও তাতে হয়ত জামাকাপড় হয় না। তবু মানুষ চরকা কাটে। চরকা কাটছি মানে স্বদেশী করছি। স্বদেশী করছি স্বরাজের জন্য—এটাই ছিল তখনকার বাংলার মানসিকতা।

চরকার এই কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি আর একটি কর্মধারা তখন প্রবলভাবে সক্রিয়। এই দ্বিতীয় কর্মধারার সূচনা প্রকৃতপক্ষে চরকার যুগের আগে থেকেই। সেই কর্মধারা বোমা-পিস্তল-বুলেটের যুগ হিসাবেই চিহ্নিত। ভারতবর্ষে, বিশেষ করে মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব ও বাংলায় এক শ্রেণীর যুবসম্প্রদায় চরকার প্রভাবকে অস্বীকার না করেও উপলব্ধি করত শুধু চরকা কেটে স্বরাজ আসবে না। তারা হাতে তুলে নিয়েছিল মারণাস্ত্র। তাদের মন্ত্র ছিল 'মরো' এবং 'মারো'। এই মন্ত্রে দীক্ষিত সেই অগ্নিপ্রাণ তরুণরা ইংরেজশক্তির প্রতিভূদের নিশ্চিহ্ন করার পথ বেছে নিয়েছিল। নির্বিচারে ইংরেজনিধন নয়। চিহ্নিত অত্যাচারী ইংরেজদের নিধন। এই অকুতোভয় তরুণদের আত্মত্যাগে বাংলার শহর ও গ্রাম তখন

উদ্বেলিত। মজঃফরপুরে কিংস্‌ফোর্ডকে মারতে গিয়ে কিশোর ক্ষুদিরাম ধরা পড়ল। হাসতে হাসতে ফাঁসির দড়িতে প্রাণ দিল প্রফুল্ল চাকী নিজের কপালে গুলি করে মৃত্যুকেই তুচ্ছ করল স্বাধীনতার স্বরূপ ও সার্থকতাকে উপলব্ধি করার মতো বয়সও যাদের হয়নি তারা প্রাণ দিল সবার আগে। নেপথ্যে ছিলেন অনেক জ্ঞানীগুণী পণ্ডিত—অরবিন্দ-বারীণ-উল্লাসকর-উপেন এবং আরও অনেকে। ক্ষুদিরামের ফাঁসি, প্রফুল্লচাকীর মৃত্যুবরণ, মাণিকতলা বোমার মামলা সারা দেশকে আলোড়িত করে তুলল। চলছে চরকা। চরকার পথ বেয়ে এসেছে অসহযোগ। এসেছে আইন-অমান্য সত্যাগ্রহ, এমন কি অনশন। শুধু একক ও বিচ্ছিন্নভাবে অস্ত্র নিয়ে নয়, সশস্ত্র যুদ্ধ ঘোষণার পরিকল্পনাও এসে গিয়েছে। বিদেশ থেকে অস্ত্র আমদানী করে ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার উদ্দেশ্যে অস্ত্রের সন্ধানে বিদেশে চলে গিয়েছেন অনেকে। বিদেশ থেকে অস্ত্র তৈরি শিখে ফিরে আসছেন অনেকে। বুড়িবালামের তীরে সশস্ত্র ইংরেজ-বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করে বাঘা যতীন দেখিয়ে দিলেন বাংলার তরুণরা সম্মুখ-সমরে অপটু নয়। ইংরেজ শাসনের দুর্গ রাইটার্স বিল্ডিং-এর অলিন্দ যুদ্ধে সর্বোচ্চ ইংরেজ কর্মচারীকে নিহত করেন বিনয়-বাদল-দীনেশ। সূর্যসেন দখল করলেন চট্টগ্রামের ইংরেজ অস্ত্রাগার। জালালবাদ পাহাড়ে উড্ডীন হ'ল স্বাধীনতার পতাকা। একদিকে গান্ধীজী যখন ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহে ব্যস্ত, লবন-আইন অমান্য করছেন, ঠিক তখনই অন্যদিকে ভগৎ সিং, বটুকেশ্বর দত্ত, রাজগুরু অস্ত্র হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন ইংরেজদের উপর। সূর্য সেন, গণেশ ঘোষ, অম্বিকা চক্রবর্তী, অনন্ত সিংহ দখল করছেন ইংরেজ-দুর্গ। চরকা ও বুলেট—দুই ধারা চলেছে পাশাপাশি। চরকার ধারায় চলেছে আপোষ-আলোচনা, লেনদেন, ভাগ-বাঁটোয়ারা, ওয়াভেল-মাউন্টব্যাটেন-এর মুখোমুখি বসা। এই পটভূমিতেই সুভাষচন্দ্র ইংরেজদের কড়া পাহারা ফাঁকি দিয়ে চলেছেন জার্মানী। সেখান থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া। গড়ে তুলছেন স্বাধীন সরকার পূর্ণ সামরিক বাহিনীর সাহায্যে।

চরকা ও বুলেট—বিশের দশকে এই দুই ধারার গতি যখন বেশ জোরালো, তখনই সুরু হ'ল আরও এক নতুন ধারা। ইংরেজ সামান্য কিছু কিছু ক্ষমতা উচ্ছিষ্টের মতো দিতে সুরু করল ভারতবাসীকে। ক্ষমতার এই উচ্ছিষ্ট দেওয়া সুরু হল সীমিত ব্যালট বা নির্বাচনের মাধ্যমে। যে দশকে ইংরেজকে মারতে একের পর এক তরুণ বোমা ও গুলি ছুঁড়ছে, সেই দশকেই মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করে মন্ত্রী

হচ্ছেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ। যে দশকে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে স্বাধীন সরকার পত্তন করছে এক দল দুঃসাহসী তরুণ, ঠিক সেই দশকেই বাংলা দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়ে বাংলার কৃষক-সমাজের উন্নতি বিধানে আত্মনিয়োগ করছেন এ কে ফজলুল হক। যে দশকের সুরুতে সারা দেশে আগস্ট বিপ্লবের আগুন জ্বলছে, বিদ্রোহ ঘটছে পুলিশ ও নৌবাহিনীতে, সেই দশকেই দেশ স্বাধীন হচ্ছে। ব্যালটের মাধ্যমে ক্ষমতায় বসছে নির্বাচিত সরকার। যে দশকে সংবিধান প্রবর্তিত হয়ে ব্যালটের মাধ্যমে সরকার গঠনের বিধি প্রচলিত হচ্ছে, সেই দশকেই হাতে অস্ত্র তুলে নিচ্ছে তেলেঙ্গানা, কাকদ্বীপ, বড়াকমলাপুর। যে দশকে পশ্চিমবঙ্গে ব্যালট যুদ্ধে জয়ী হয়ে বামপন্থীরা শাসনক্ষমতা দখল করছে, সেই সময়েই বামপন্থীদেরই এক অংশ নক্সালবাড়িতে এক নতুন রাজনীতির জন্ম দিচ্ছে—'বন্দুকের নলই শক্তির উৎস।'

চরকা ও বুলেট নিয়ে যে স্বাধীনতা যুদ্ধের সুরু, তারই পরিণতি ঘটে ব্যালট যুদ্ধে। চরকা আজ অনুপস্থিত। সশস্ত্র ক্ষমতাদখল আজ একটা দার্শনিক তত্ত্ব মাত্র। ব্যালটের পথ বেয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষমতাদখলে ব্রতী হয়েছেন সকলে। অনেকে ক্ষমতা দখলও করেছেন।

চরকা-বুলেট-ব্যালটের সমন্বয় ঘটেছে ভারতের অনেক রাজনীতিবিদের জীবনে। ৮০-র দশকেও ভারতবর্ষে অনেক মানুষ আছেন যাঁরা এই ত্রি-ধারার সমন্বয়ে জীবনকে পুষ্ট করেছেন।

দুই

পশ্চিমবঙ্গের যে কয়জন বিরল ব্যক্তি তাঁদের জীবনে চরকা-বুলেট-ব্যালট—এই তিনধারার সমন্বয়কে পরিপূর্ণভাবে আত্মস্থ করেছেন তাঁদের অন্যতম হলেন প্রমোদ দাশগুপ্ত। প্রমোদ দাশগুপ্ত, সংক্ষেপে পি-ডি-জি নামটি আজ দেশবিদেশে নানা-ভাবে পরিচিত। সত্তর দশকে ভারতের রাজনৈতিক গবেষণা ও অনুশীলনে আগ্রহী বিদেশীরা এ দেশে এসে যাঁদের সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন প্রমোদ দাশগুপ্ত তাঁদের একজন। ইংলণ্ড, আমেরিকা, রাশিয়া, জাপান—যে দেশেরই কোন সাংবাদিক ও রাজনৈতিক গবেষক ভারতবর্ষে এসেছেন, পশ্চিমবঙ্গে এসে তাঁরা দেখা করেছেন প্রমোদ দাশগুপ্তের সঙ্গে। কোন বিশেষ তত্ত্ব বা বিশেষ

রাজনৈতিক দর্শনের প্রবক্তা প্রমোদ দাশগুপ্ত নন। অতি সাধারণ বেশভূষার সাধারণ একজন মানুষ। রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে এমন একটা রাজনৈতিক ওলট-পালট ঘটিয়েছিলেন যা দেখতে ও বুঝতে মানুষ ছুটে আসত প্রমোদ দাশগুপ্তের কাছে।

চরকায় সুতো কেটে জীবনের সূচনা। সশস্ত্র বিপ্লবী দলে অন্তর্ভুক্তি ও বিচরণ এবং গণ-আন্দোলন সংগঠনে ব্যালটের পথে ক্ষমতা দখল—এই তিনেরই প্রথম সারিতে ছিলেন প্রমোদ দাশগুপ্ত। বাল্যে বিদ্যালয় থেকে ফিরে সন্ধ্যায় নিয়মিত চরকা কেটেছেন; যৌবনে বোমা-পিস্তলের কর্মকাণ্ডে নিজেকে যুক্ত করে কারাবরণ করেছেন, বন্দী থেকেছেন দেউলী বক্সা ক্যাম্পে; প্রৌঢ়ত্বের সীমানা পেরিয়ে বৃদ্ধবয়সে ব্যালট-যুদ্ধে ক্ষমতা দখলের বিজয়ী সেনাপতি হয়েছেন। ব্যালট-যুদ্ধে যুক্তফ্রন্টের মাধ্যমে কংগ্রেসকে পরাজিত ও পর্যুদস্ত করে ক্ষমতা তুলে দিয়েছিলেন বামফ্রন্টের হাতে। যে বামফ্রন্টের তিনি ছিলেন আমৃত্যু চেয়ারম্যান।

শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়। ভারতবর্ষও নয়। ভারতের বাইরেও রাজনৈতিক জগতে প্রমোদ দাশগুপ্ত একটি বিশেষ পরিচিত ও কৌতূহল উদ্রেককারী নাম। অপরিচিতের গণ্ডি ও অতি সাধারণ কর্মিস্তর থেকে নিজেকে এক কিংবদন্তিতে পরিণত করার নজির আধুনিক কালে বিরল। হঠাৎ চমক দেবার মতো কোন বড় ঘটনার নায়ক নন, আলোড়ন সৃষ্টিকারী কোন আন্দোলনের নেতা নন, পরিষদীয় রাজনীতির কোন দিক্‌পাল নন, দেশী-বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীতে চমকপ্রদ নন, পারিবারিক ঐতিহ্যে মহিমান্বিত নন—এ সবের কোন সোপান বেয়েই প্রমোদ দাশগুপ্তের উত্থান সম্ভব হয়নি। সকলের মধ্যে একজন। মিছিলের সারিতে পা মিলিয়ে চলতে চলতেই মিছিলের মধ্যে অনন্য হয়ে উঠেছেন। পৌঁছে গেছেন প্রথম সারিতে, একেবারে প্রথমে। তাত্ত্বিক নন, বড় বাগ্মীও নন। মনজয়ী দেহকান্তিরও অধিকারী নন। অতি সাধারণ চেহারার অতি সাধারণ কর্মিস্তর থেকে বেরিয়ে আসা এক সাধারণ মানুষ। সাধারণ মাপের, সাধারণ পোষাকের, সাধারণ জীবন যাপনের এক অনন্য ব্যক্তিত্ব প্রমোদ দাশগুপ্ত। কঠিন দুরারোগ্য ব্যাধি। শ্বাসকষ্টে বেশি কথা বলবার শক্তি নেই। বেশি পথ চলবার সামর্থও ছিল না। সিঁড়ি ভেঙ্গে বেশি উপরে উঠতে পারতেন না। তবু একজন এগিয়ে চলা মানুষ প্রমোদ দাশগুপ্ত। শরীর এবং রোগকে অগ্রাধিকার দেননি; সভাসমিতিতে না গিয়ে, ভাষণ না দিয়ে দৈহিক কষ্টের রেহাই কোনদিনও চাননি। উদ্বেগ এবং উৎকণ্ঠা—এই দু'টি শব্দের সঙ্গে প্রমোদ দাশ-

গুপ্তের পরিচয় ছিল না। বাহ্যিক মায়া এবং লৌকিকতা—দুই-ই ছিল তাঁর অজ্ঞাত। ১৯৮১ সালের ৮ই সেপ্টেম্বরের সন্ধ্যার ঘটনা মনে পড়ে। অনেক বছর ধরেই প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় প্রমোদ দাশগুপ্তের সঙ্গে দেখা হয়, কথা হয়। সেদিন সন্ধ্যায় আমরা অনেকেই ছিলাম। অনেকক্ষণ বসে কথা হ'ল। সকালে বামফ্রন্টের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ছিল—সেই বৈঠকের কথাই হচ্ছিল আমাদের সঙ্গে। আলোচনা শেষে আমাদের ওঠার সময় হল। তখন গণশক্তির বার্তা-সম্পাদক অনিল বিশ্বাস বললেন "অন্য একটা খবর আছে। প্রমোদদার মা কাল রাতে মারা গিয়েছেন।" আমরা হতবাক। এতক্ষণ ধরে সমানে আমাদের অজস্র প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলেন, নানা কৌতূহল নিবৃত্ত করছিলেন। অথচ আমরা ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারিনি যে কয়েক ঘণ্টা আগে তিনি মাতৃহারা হয়েছেন। সকালে বামফ্রন্টের বৈঠকে যাঁরা ছিলেন, তাঁরাও জানতে পারেননি যে দীর্ঘ গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে যিনি সভাপতিত্ব করলেন, মাত্র কয়েকঘণ্টা আগে তিনি তাঁর মাকে হারিয়েছেন। কী গভীর সম্পর্ক ছিল তাঁর মায়ের সঙ্গে তা আমি জানতাম। প্রমোদ দাশগুপ্ত প্রথম পুলিশের হাতে ধরা পড়েন অসুস্থ মাকে দেখতে গিয়েই। সময় ও সুযোগ পেলেই বৃদ্ধবয়সে তিনি বহরমপুরে ছুটে যেতেন বৃদ্ধা মাকে দেখবার জন্য।

প্রমোদ দাশগুপ্তের বাবা মতিলাল দাশগুপ্ত সরকারী ডাক্তার ছিলেন। অবসর গ্রহণের পর বহরমপুরে গোরাবাজারে জমি কিনে ছোট একটি বাড়ি তৈরি করেন। বাবা-মার সঙ্গে দেখা করার জন্য পঞ্চাশ দশক থেকেই প্রমোদবাবুর বহরমপুরে যাতায়াত। তবে নিজেদের বাড়িতে উঠেছেন খুব কম। দলের দপ্তরেই উঠেছেন এবং থেকেছেন। বাবা মতিলাল দাশগুপ্ত কোনদিনই ছেলেকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেননি। সংস্কারমুক্ত মানুষ মতিলাল জানতেন যে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বড় ছেলে মুখাগ্নি বা অশৌচ পালন করতে আসবেন না। তিনি নিজেই বলতেন গলায় কাছা নেওয়া বা মাথা মুড়োনো বাবা-মার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি দেখাবার একমাত্র পথ নয়। শ্রদ্ধাভক্তি অন্তরের জিনিষ। প্রমোদের তা' আছে। বাবা বেঁচে থাকতে বহরমপুরে বেশী না গেলেও পরবর্তীকালে মাকে দেখতে তুলনামূলকভাবে অনেক বার তিনি বহরমপুরে গিয়েছেন। শেষের দিকে মা যখন অসুস্থ তখন বাড়িতেও থেকেছেন। দলের কাজে উত্তরবঙ্গে যাতায়াতের পথেও মার সঙ্গে দেখা করে এসেছেন। ছেলে বাড়ি এলে মা চারুলতা দেবী ছুটে আসতেন দোরগোড়ায়। জড়িয়ে ধরতেন তাকে। যেমন করে মা শিশু-সন্তানকে জড়িয়ে ধরে। ১৯৮১-র সেপ্টেম্বর মাসে মা অসুস্থ শুনে বহরমপুর

গিয়েছিলেন। কিন্তু সকালেই বামফ্রন্টের বৈঠকে যোগ দেবার জন্য চলে এসেছিলেন কলকাতায়। চলে আসার পর মা মারা গিয়েছেন। কাউকে জানতে দেননি একটা বন্ধন ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। দীর্ঘদিনের এক গভীর বন্ধন।

তিন

এমন একটি অঞ্চলে প্রমোদ দাশগুপ্ত জন্মগ্রহণ করেছেন এবং তাঁর বাল্য ও কৈশোর অতিবাহিত করেছেন, যে অঞ্চলের প্রতিটি সহরে ও গ্রামে তখন বিদ্রোহের বারুদ ছড়ানো। এই বারুদগন্ধ বরিশালেই 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিকে জাতীয় ধ্বনি, স্বাধীনতার আকাঙ্খার ধ্বনি, সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের ধ্বনি হিসাবে গ্রহণ করা হয়। মন্ত্রে পরিণত এই ধ্বনিই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রেরণা হিসাবে কাজ করেছে।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পর থেকে দেশের মানুষের মনে যে বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠেছিল, ১৯০৬ সালে বরিশালের প্রাদেশিক সম্মেলনে তা একটা অবয়ব পেল। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বদেশী আন্দোলন একটা নতুন মোড় নিল। আব্দুল রসুলের সভাপতিত্বে প্রাদেশিক সম্মেলনের উপর জেলা-শাসক এমার্সন নিষেধাজ্ঞা জারি করলেন। কোন শোভাযাত্রা নয়, 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি নয়। ইংরেজ শাসকের নিষেধাজ্ঞা তুচ্ছ করে বেরুল শোভাযাত্রা। উচ্চারিত হল 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি। বৃষ্টির ধারায় নেমে এল পুলিশের লাঠি। অজস্র যুবক আহত হল। গ্রেপ্তার হলেন সম্মেলনের প্রধান বক্তা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতায় রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীটে সংবর্ধনা দেওয়া হল বরিশালের লাঞ্ছিতদের। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বরণ করা হল রাষ্ট্রগুরু হিসাবে।

এই সম্মেলনেই এক বক্তার কণ্ঠে উচ্চারিত হল স্বরাজ্যের দাবী। ঘোষিত হল, বয়কট আর প্রতিরোধে স্বাধীনতা আসবে না; রাশিয়ায় গিয়ে নিহিলিস্টদের কাছ থেকে বোমা তৈরি শিখে আসতে হবে। এই ১৯০৬ সালেই কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হল অনুশীলন সমিতি। বরিশালের এই সম্মেলনে ও পরবর্তী আন্দোলনে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিতে এক নতুন ব্যঞ্জনা সন্নিবিষ্ট হল, বয়কটের পথ প্রদর্শিত হ'ল। সেই সঙ্গে মাথা উঁচু করল এক নতুন চিন্তা: সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম। বয়কট আন্দোলনে সুরু হ'ল 'বিলিতি বর্জন'। সর্বস্তরের মানুষ যোগ

দিল এই বর্জন আন্দোলনে। ইংরেজ শাসকের অত্যাচার তীব্র হ'ল। সুরু হল নির্বিচার গ্রেপ্তার ও নির্যাতন। ভূপেন্দ্রনাথ গ্রেপ্তার হলেন, চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ কিংস্‌ফোর্ডের বিচারে তাঁর এক বছরের কারাদণ্ড হ'ল। পুলিশ গ্রেপ্তার করল 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার সম্পাদক অরবিন্দ ঘোষ ও 'সন্ধ্যা' পত্রিকার সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়কে। অরবিন্দ ঘোষের মামলায় বিপিনচন্দ্র পালকে সাক্ষ্য দিতে ডাকা হ'ল। বিপিনচন্দ্র সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করলেন। আদালত অবমাননার দায়ে তাঁর ছয় মাস কারাদণ্ড হ'ল। পুলিশ হাজতে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়। বিপিনচন্দ্র পালের বিচারের দিন আদালত প্রাঙ্গণে ছাত্র-পুলিশের এক সংঘর্ষ হয়। ম্যাজিস্ট্রেট কিংস্‌ফোর্ড সুশীল সেন নামে এক কিশোর ছাত্রকে পনেরোটি বেত্রাঘাত করে। ইংরেজের অত্যাচারের প্রতিবাদে গর্জে ওঠে সারা দেশ। এই প্রতিবাদের প্রথম অভিব্যক্তি বাংলার ছোট লাট স্যার এন্‌ড্রু ফ্রেজারের ট্রেন উড়িয়ে দেবার চেষ্টা। ১৯০৮ সালে মজঃফরপুরের দায়রা জজ এবং কলকাতার ভূতপূর্ব চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডের প্রাণ-নাশের চেষ্টায় ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী নামে দুই বিপ্লবী তরুণের হাতে ৩০শে এপ্রিল ভ্রমক্রমে প্রিংগি কেনেডি নামে এক ইংরেজ ব্যবহারজীবীর পত্নী ও কন্যা নিহত হন। প্রফুল্ল চাকী পুলিশের হাতে ধরা না দিয়ে আত্মহত্যা করে। ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়। এই হত্যাকাণ্ডের পরই পুলিশ কলকাতার মাণিকতলায় বোমা তৈরির একটি কারখানা আবিষ্কার করে এবং ২রা জুন বারীন্দ্রনাথ ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র দাস, নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, কানাইলাল দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতিকে গ্রেপ্তার করে। অরবিন্দ ঘোষকেও তাঁর গ্রে ষ্ট্রীটের বাসভবন থেকে ঐদিন গ্রেপ্তার করা হয়। বিখ্যাত রাজনৈতিক মামলাগুলির অন্যতম আলিপুর বোমার মামলা এক বছর ধরে চলেছিল। এই মামলা চলাকালীন আরও কয়েকটি হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়। সত্যেন্দ্রনাথ ও কানাইলাল গুপ্তকথা প্রকাশের আশঙ্কায় জেলের মধ্যে রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাইকে হত্যা করে। জেলের মধ্যেই স্বতন্ত্র বিচারে উভয়ের ফাঁসি হয়ে যায়। ১৯০৯ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী বিপ্লবীদের হাতে নিহত হয় আলিপুর বোমার মামলার সরকারী উকিল আশুতোষ বিশ্বাস। ঠিক দু'মাস পরেই নিহত হন একজন দারোগাও। ১৯০৮ সালে ৭ই নভেম্বর স্যার এন্‌ড্রু ফ্রেজারের উপর দ্বিতীয়বার আক্রমণ হয়। ইংরেজের উপর আক্রমণ যত বাড়ে ইংরেজ শাসকের অত্যাচার ততই নির্মম হয়ে ওঠে। প্রতিশোধ আন্দোলনও দুর্বার হয়। এই অত্যাচার, প্রতিরোধ

ও প্রতিশোধের কাল হিসাবে ১৯১০ সাল বিশেষভাবে চিহ্নিত। এই অগ্নিগর্ভ ১৯১০ সালের ১৩ই জুলাই তারিখে প্রমোদ দাশগুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন।

চার

ফরিদপুর জেলার পালং থানার কুঁয়ারপুর গ্রাম বলতে গেলে নিতান্তই গণ্ডগ্রাম। কিন্তু এই গণ্ডগ্রামে দাশগুপ্ত বাড়ির যথেষ্ট পরিচিতি ও নামডাক ছিল। বহুকালের নামডাক। ভুঁইয়াবাড়ি বলেই সকলের কাছে পরিচিত ছিল। অপূর্বলাল দাশগুপ্তের বাবার আমলে এই নামডাক যথেষ্ট বিস্তার লাভ করে। অপূর্বলালের আমলে তা আরও ছড়িয়ে পড়ে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে। ওই তল্লাটে কোঠাবাড়ি বলতে একটিই। ভুঁইয়াবাড়ি। পাঁচ দশখানা গ্রামের মধ্যে ওই একটিই পাকাবাড়ি। পথচারী মানুষ দাঁড়িয়ে দেখত। জেনে নিত বাড়ির মানুষের নাম, পরিচয়। জমিদারী নয়, জোতদারী নয়, সুদ মহাজনী ও দাদনের টাকাতেও নয়, শুধু চাকরীর উপার্জনের টাকায় দাশগুপ্ত-বাড়ি পাকাবাড়ি হয়েছিল। কিন্তু বাড়ির মালিকের একটি পরিচিতি ছিল অনেক আগেই। সেই সিপাহী বিদ্রোহের আমলে। অপূর্বলালের বাবা ১৮৫৭-র সিপাহী বিদ্রোহের সময় চট্টগ্রামে কর্মরত ছিলেন। ব্যারাকপুর থেকে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ল সারা দেশে। যদিও সেই আগুনের রুদ্ররূপ প্রকট হয়েছিল উত্তর ভারতেই বেশী। ব্যারাকপুরের পূর্ব-দিকে খুব বেশী বিদ্রোহের দাপট ছিল না। কিন্তু চট্টগ্রামের ফৌজীশিবিরে বেশ কিছু ভারতীয় সেনা বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে আক্রমণ করে ইংরেজ রাজপুরুষদের। এই আক্রমণ থেকে ইংরেজ পরিবারের স্ত্রীপুত্রকন্যাও বাদ যায়নি। নিরপরাধ নারীশিশুর হত্যাকে অপূর্বলাল মন থেকে মেনে নিতে পারেননি। নিজের জীবন তুচ্ছ করে, জীবনের চরম ঝুঁকি নিয়ে তিনি বেশ কিছু ইংরেজ নারী ও শিশুকে রক্ষা করলেন। চট্টগ্রামের সিপাহী বিদ্রোহ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। জ্বলে উঠেই নিভে গিয়েছিল। কিন্তু দাশগুপ্ত মহাশয়ের সাহসী প্রচেষ্টা পরবর্তীকালে তাঁকে অনেক সুনামের অধিকারী করে। লোকমুখে এই সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিল নানা স্তরে, নানা মহলে।

যে পরিবারের এক পুরুষ একদা নিজের জীবন বিপন্ন করে ইংরেজ শিশুদের রক্ষা করেছিলেন, তাঁর তৃতীয় পুরুষে জন্মগ্রহণ করেন এমন একজন, যিনি নিজের

জীবন বাজি রেখে ভারত থেকে ইংরেজ বিতাড়ণের ব্রত গ্রহণ করেন। ইংরেজ শিশু ও নারীর জীবনরক্ষক অপূর্বলাল; অপূর্বলালের পুত্র মতিলাল; মতিলালের পুত্র প্রমোদ।

এক অসাধারণ অনন্য ব্যক্তিত্বের মানুষ ছিলেন অপূর্বলাল। ডাক্তারী পড়েছিলেন। কিন্তু ডাক্তারী কোন কালেই তাঁর পেশা হয়নি। পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন জনসেবাকে। চিকিৎসকের সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে জনসেবায় ব্রতী হয়েছিলেন। সেই সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে প্রথমেই ভাঙলেন জাতপাতের সংকীর্ণ গণ্ডি। সেই যুগে উঁচুজাত আর নিচুজাতের মধ্যে আসমান-জমিন ফারাক। নিচুজাতের মানুষের স্পর্শে উঁচুজাতের মানুষের জাত যায়। বাড়ির সীমানা দিয়ে হাঁটলে পবিত্রতা নষ্ট হয়। অপূর্বলাল তাঁর নিজের ক্ষেত্রে এই গণ্ডির দরজা উন্মুক্ত করে দিলেন। রূপকথার মতো ছড়িয়ে পড়ল তাঁর নাম। একজন মানুষ যিনি উঁচু-নিচুর ভেদ স্বীকার করেন না, জাতপাতের বেড়া মানেন না। ঠাকুর ঘরের পবিত্র মঞ্চে প্রতিষ্ঠিত শালগ্রামশিলা। নৈবেদ্য ভোজের লোভে এক কাক সেই ঠাকুরঘরে ঢুকে শালগ্রামশিলাকে ঠুকরে নীচে ফেলে দেয়। শিলা গড়িয়ে পড়ে মেঝেতে। অপূর্বলাল সেই শালগ্রামশিলাকে তুলে আর আসনে স্থাপন করেননি। যে ঠাকুর নিজেকে কাকের গ্রাস থেকে রক্ষা করতে পারে না, সে অন্যকে রক্ষা করবে কি করে? দাশগুপ্ত-বাড়ির সামনেই বড়, ব্যবহারযোগ্য পুকুর। সেই পুকুরের জলই ছিল সমগ্র গ্রামের মানুষের পানীয়। এই পুকুরটিকে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যাপারে অপূর্বলাল ছিলেন বিশেষ সতর্ক। পুকুরের ঘাটে আলাদা দুটো জলপাত্র থাকত—হিন্দু আর মুসলমানের। কেউ জল নিতে এলে আগে ঐ পাত্রের জলে পরিষ্কার করে হাত পা ধুয়ে নিতে হত। পানীয় জল তুলে নিয়ে আবার ঐ জলপাত্র ভরে রাখতে হত পরের মানুষের ব্যবহারের জন্য। ফলে, কুঁয়ারপুর গ্রাম ছিল প্রায় সম্পূর্ণ রোগমুক্ত। আশেপাশের গ্রামে কলেরা বা অন্য কোন সংক্রামক রোগ হলেও কুঁয়ারপুর গ্রাম ছিল নিরাপদ। নিজের বাড়ির পুকুরটিই শুধু নয়, বাড়ির প্রতিটি মানুষকেও পরিচ্ছন্ন থাকার শিক্ষা দিতেন তিনি। প্রমোদ দাশগুপ্ত সারাজীবন নিজের জামা কাপড় নিজে পরিষ্কার করে, নিজের জুতো নিজে পালিশ করে গিয়েছেন। একথা আজকের মানুষের কাছে গল্পের মতো। এই শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন তাঁর পিতামহ অপূর্বলালের কাছ থেকে। নিজের কাজ নিজে করো, নিজে পরিচ্ছন্ন থাকো—এই ছিল তাঁর শিক্ষা।

অপূর্বলালের চার পুত্র। জ্যেষ্ঠ মতিলালকে তিনি ডাক্তারী পড়ালেন। অপূর্বলালের আর এক পুত্র বিনোদলাল। বিনোদলালের পুত্র পান্নালাল। পরবর্তী জীবনে যিনি প্রখ্যাত বিপ্লবী ও গঠনকর্মী হিসাবে সারা দেশে পরিচিত। অপূর্বলালের পুত্রদের মধ্যে একমাত্র মতিলাল ছাড়া কেউ-ই দীর্ঘায়ু হননি। বিনোদলাল প্রকৃতপক্ষে অকালেই মারা যান। সে যুগের রেওয়াজ মতো অপূর্বলাল পুত্র মতিলাল ও বিনোদলালের কম বয়সেই বিয়ে দিয়েছিলেন। ডাক্তার-পুত্র মতিলালের বেশ ঘটা করেই বিয়ে দিয়েছিলেন তিনি ঢাকা জেলার এক প্রতিষ্ঠিত সেরেস্তাদারের কন্যা চারুবালার সঙ্গে। মতিলাল ডাক্তারী পাশ করার পরই ঢুকে পড়েন সরকারী চাকরীতে। তাঁর তিন পুত্র ও পাঁচ কন্যার মধ্যে একমাত্র প্রমোদেরই জন্ম হয় কুঁয়ারপুর গ্রামে। অন্যান্য পুত্রকন্যার জন্ম হয় মতিলালের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে, বিভিন্ন জেলায়। মতিলালের তিন পুত্র—প্রমোদ, সুবোধ, মানিক ; পাঁচ কন্যা—নীলিমা, সরমা, প্রতিমা, অনিমা, উমা।

অপূর্বলালের জীবিতকালেই প্রমোদ ও পান্নার জন্ম হয়। দুই নাতিকে কোলে তুলে নিয়ে দু'জনকেই বড় করে তোলেন নিজের আদর্শ ও চিন্তাধারায়। দুই শিশু দাদুর দুই কোলে। কোল থেকে মাটিতে পা রাখল তারা। দুই শিশুমনে দাদুর সাহস, সংস্কারমুক্ত মন ও অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার ছায়া। দাদুর হাত ধরেই তাদের পদচারণা শুরু। মাটির পথে। গ্রামের পথে। জীবনের পথে।

পাঁচ

কুঁয়ারপুর গ্রামের বিদ্যালয়েই ভর্তি করা হয় দুই ভাই প্রমোদ আর পান্নাকে। দাদুর হাত ধরেই দুই ভাই পাঠশালায় যায়। দাদুর হাত ধরেই ফিরে আসে। দাদুর কাছেই পাঠশালার পড়া শেখে। বাড়ি থেকে অনেক দূরে ভিন্ন জেলায় মতিলালের কর্মস্থল। অপূর্বলাল দুই নাতিকে নিয়ে বাড়িতেই থাকেন। দুই নাতিকে পড়াশুনায়, খেলাধূলায় তালিম দেন। তালিম দেন স্বদেশী গানের। পাশের জেলা বরিশালের মুকুন্দ দাসের রাজদ্রোহের অভিযোগে তিন বছর কারাদণ্ড হয়। তিনি কোন রাজনৈতিক নেতা ছিলেন না। গায়ক এবং যাত্রাদলের পালাকার ও অভিনেতা ছিলেন তিনি। স্বদেশী গান গেয়ে, বিলিতি বর্জনের গান গেয়ে, ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে গান গেয়ে দেশকে মাতিয়ে

তুলেছিলেন। অপূর্বলাল মুকুন্দদাসের সেই সব গান শেখাতেন দুই নাতিকে। তাদের হাত ধরে প্রতিবেশীদের কাছে গিয়ে, এমনকি আশেপাশের গ্রামের পরিচিতদের কাছে গিয়ে বলতেন: আমার নাতিদের গান শোন। দুই শিশুকণ্ঠ অবাক করে দিত সবাইকে। লেখাপড়া, খেলাধুলা, সাঁতার, গান, অভিনয়—সব বিষয়েই দুই নাতিকে চৌকশ করে তুলবার চেষ্টা করেছিলেন অপূর্বলাল। তাঁর এই শিক্ষা, এই তালিম পান্না-প্রমোদের সারা জীবনের পাথেয় হয়। পরবর্তীকালে ছাত্রজীবনে প্রমোদ ও পান্না খেলাধুলা, অভিনয়, গান—সব কিছুতেই পারদর্শী হয়ে ওঠেন। খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ থেকেই তাঁদের মনে সংঘ বা ক্লাব গড়ার প্রবণতা জন্ম নেয়, এবং, এই সংঘ-প্রবণতাই পান্না ও প্রমোদকে পরবর্তী জীবনে বিপ্লবী ও রাজনৈতিক আন্দোলনের শরিক করে তোলে।

সেই বিশের দশকে খেলাধুলা, ব্যায়াম, শরীরচর্চার আখড়ার মধ্য দিয়েই দীক্ষা হত স্বাদেশিকতার। এই সব আখড়া বা ক্লাব থেকেই উপযুক্ত ছেলেদের বাছাই করে নেওয়া হত বিপ্লবী দলে।

বিশের দশক। অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠার পর প্রায় বিশ বছর অতিক্রান্ত। বিপ্লবী পি মিত্র প্রতিষ্ঠিত সেই অনুশীলন সমিতি শাখা-প্রশাখায় সারা বাংলাদেশে এবং বিশেষ করে পূর্ববঙ্গে পরিব্যাপ্ত। পূর্ববঙ্গের প্রতিটি জেলায় পুলিন দাসের নেতৃত্বে অনুশীলন সমিতির শাখা প্রতিষ্ঠিত। খেলাধুলা ও শরীরচর্চার মধ্য দিয়েই সমিতির কর্মকাণ্ডের সুরু। প্রদেশের অন্যান্য জেলার তুলনায় ঢাকা, ফরিদপুর ও বরিশালে সমিতির শাখার সংখ্যা বেশী। ঢাকার পুলিন দাস এবং ফরিদপুরের পূর্ণ দাস সে সময়ে কিংবদন্তি পুরুষ। বিশের দশকে সারা ফরিদপুর জেলাটাই যুক্ত হয়ে যায় বিপ্লবী-আন্দোলনে। পালং থানার কুঁয়ারপুর গ্রামের কয়েকমাইল দূরে খালিয়া-সিদ্ধিয়া ঘাট। এই খালিয়ার চিত্তপ্রিয় রায় বুড়িবালামের তীরে ইংরেজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে বাঘা যতীনের তরুণতম সহযোদ্ধা হয়ে প্রাণ দিলেন। চিত্তপ্রিয়র প্রাণদান সারা বাংলাদেশের সঙ্গে সেদিনের মাদারীপুর মহকুমাকে পাগল করে তুলেছিল। অপূর্বলাল দুই নাতিকে স্বদেশী আন্দোলনের বীর যোদ্ধাদের কাহিনী শোনাতেন।

সেই বিশের দশকে পান্না এবং প্রমোদ খেলাধুলা, লেখাপড়া, গানবাজনায় দক্ষ হয়ে ওঠেন। খেলাধুলার মাধ্যমেই বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দেন। গানে ও অভিনয়ে নিপুণ এই দুই ভাই বরিশালের বিদ্যালয়ে তাঁদের শেষ বছরে একই সঙ্গে

শরৎচন্দ্রের নাটক অভিনয় করেছেন। পান্নালাল অভিনয় করতেন স্ত্রী-চরিত্রে। ফুটবল খেলায় মাঠে নামলে সকলের নজর কাড়তেন প্রমোদ। ছাত্র বয়সে বড় খেলোয়াড় হবার স্বপ্নও দেখেছেন। পরবর্তী জীবনে খেলার মাঠ ও খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ ছিল তাঁর অটুট।

ছয়

ভাল নাম প্রমোদ। বাবা-মা ডাকেন খোকা বলে। মামাবাড়ির সকলে ডাকেন মনি বলে। ভাইবোনদের সকলের বড়। বড় হবার দায়িত্বও এসে পড়ে তাঁর উপর। কম বয়স থেকেই সংসার আর ভাইবোনদের দেখাশোনার দায়িত্ব নিতে হয় তাঁকে। সরকারী চাকরী করেন বাবা মতিলাল। যখন তখন বদলী হতে হয় জেলা থেকে জেলায়। মা চারুবালা ছেলেমেয়েদের নিয়ে থাকেন। তাঁর শরীর খুব সুস্থ ছিল না। মাঝে মাঝেই অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী হতেন। তখন সংসারের পুরো বোঝা এসে পড়ত কিশোর প্রমোদের উপর। অনেক সময় নিজেকে রান্না করতে হত। রান্না করে ভাইবোনদের ও মাকে খাইয়ে ভাইবোনদের স্কুলে পৌঁছে দিয়ে নিজে স্কুলে যেতেন।

বহরমপুরে গোরাবাজারের বাড়িতে প্রমোদ দাশগুপ্তের বোন নীলিমা দাশগুপ্ত একদিন অতীত স্মৃতিচারণায় উল্লেখ করেন তাঁদের ছোটবেলার দিনগুলি। বলেন: "দাদা শুধু আমাদের রান্না করে খাওয়াতেনই না; স্নান করিয়ে, চুল আঁচড়ে মাথায় বিনুনি বেঁধে দিতেন। তারপর সঙ্গে নিয়ে স্কুলে পৌঁছে দিতেন। খুব ভাল রান্না করতেন দাদা। আমাদের গায়ে কখনও হাত তোলেননি। আমাদের দুষ্টুমি ও দোষ আড়াল করার জন্য নিজে মার খেয়েছেন। কখনও কোন ব্যাপারে তাঁকে অনুযোগ করতে শুনিনি। খাওয়াদাওয়া, পোষাক-আশাক যা পেতেন তাতেই খুশি থাকতেন।

"মাকে ভালবাসতেন প্রাণের চাইতেও বেশী। বগুড়ায় মার অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে মাকে দেখতে এসেই দাদা প্রথমবার পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। বহরমপুরে বাড়ি হলে সময় ও সুযোগ পেলেই দাদা এখানে মাকে দেখতে আসতেন। মার শরীর খারাপ হলেই নিজের অসুস্থ শরীর নিয়েও বহরমপুরে ছুটে এসেছেন। মার চিকিৎসার ব্যবস্থা সব সময়েই নিজে করেছেন। ডাক্তারী

চিকিৎসায় সুফল না পেয়ে কলকাতা থেকে নিজের কবিরাজী চিকিৎসককে বহরমপুরে নিয়ে এসে মার চিকিৎসা করিয়েছেন। সুফলও পেয়েছেন।

"দাদা চিরকালই কম কথার মানুষ। কথার চেয়ে কাজকেই তিনি বেশি গুরুত্ব দিতেন। কাজের সময় তিনি নিজেও কথা বলতেন না, অন্যের কথা বলাও পছন্দ করতেন না। সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম সেরে বাইরের অনেক কাজ করতেন দাদা। কি কাজ আমরা বুঝতাম না। মা মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করতেন—এত কাজ কিসের। দাদা জবাব দিতেন না। অন্য কথা বলে এড়িয়ে যেতেন।

"দাদা তখন বাইরের এক জেলে। অসুস্থ মা ছেলেকে দেখতে চাইলেন। পুলিশ জেল থেকে দাদাকে এনে বহরমপুর স্টেশনে সারারাত রেখে দিল। ইংরেজ পুলিশ অফিসার তাঁকে বাড়ি নিয়ে যেতে পারছেন না। কারণ, বিরাট এক সমস্যা! বহরমপুরে বন্দীর বাবার বাড়ি। মাকে দেখতে বন্দী বাবার বাড়িতে যেতে পারবে কিনা এবং সেখানে গিয়ে অন্য কাউকে দেখতে দেওয়া আইন সঙ্গত হবে কি না। সমস্যার জট খুলতে ইংরেজ পুলিশ অফিসারের সারা রাত কেটে গেল। পরদিন সকালে দাদাকে পুলিশ পাহারায় বাড়িতে নিয়ে আসা হল। দাদা যতক্ষণ মার কাছে ছিলেন বাড়িতে কাউকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি, বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে কাউকে যেতে দেওয়া হয়নি।

"মা মারা যাবার আগে দাদা এলেই মা দাদাকে বামফ্রন্ট সরকার চালানোর ব্যাপারে এ কথা সে কথা বলতেন। একটা কথা মা প্রায়ই বলতেন : কি রে! কেমন দেশ চালাচ্ছিস তোরা? এ দেখছি কেউ কারও কথা শোনেনা। মার কথায় দাদা হাসতেন। কিন্তু কোন জবাব দিতেন না। এক অসাধারণ দৃশ্যের অবতারণা হত দাদা বাড়িতে এলে! দাদা চৌকাঠ পেরোবার আগেই মা জড়িয়ে ধরতেন দাদাকে। আদর করতেন প্রায় শিশু ছেলের মতো। মা শয্যাশায়ী থাকলে দাদা কাছে গিয়ে দাঁড়ালেই তাঁর হাত দুখানি টেনে নিয়ে মা নিজের বুকে রাখতেন। কখনও দাদার মুখখানি টেনে নিতেন।

"দাদা রাজনীতি করেছেন। বহু নির্যাতন সহ্য করেছেন। কিন্তু সব সময়েই চেষ্টা করেছেন তাঁর রাজনীতির জন্য পরিবারের অন্য কেউ যেন বিব্রত না হয়। ছোটবেলা থেকেই দাদার মনোভাব ছিল, প্রয়োজনে নিজে সব কষ্ট সহ্য করব, কিন্তু অন্যে যেন কষ্ট না পায়।"

সাত

বলতে গেলে দশ বারো বছর বয়স থেকেই প্রমোদ দাশগুপ্তের গায়ে রাজনীতির হাওয়া লাগতে সুরু করে। ডুমসার গ্রামের স্কুল ছেড়ে প্রমোদ ফরিদপুর সহরে এল। মতিলাল তখন ফরিদপুর জেলা সদরে জেলের ডাক্তার।

বিশের দশক। রাজনীতির উত্তেজনায় বাংলা এবং সারা ভারতবর্ষ কম্পমান। একবছর আগে রাওলাট আইন পাশ হয়েছে। সন্দেহভাজন বিপ্লবীদের দমন করার ছলে ভারতবাসীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও আন্দোলনের অধিকার হরণ করা হয়েছে। এই আইনের বলে সন্দেহ হলেই গ্রেপ্তার-নির্বাসন এবং বিশেষ বিশেষ অঞ্চলকে আইনশৃঙ্খলাভঙ্গকারী অঞ্চল বলে ঘোষণা অবাধ হয়ে উঠল। ১৯১৯ সালের ১৮ই মার্চ ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে এই আইন পাশ করিয়ে নেওয়া হল। আইনের প্রতিবাদ জানিয়ে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, মহম্মদআলি জিন্নাহ্ ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যপদ ত্যাগ করলেন। বাইরে গর্জে উঠলেন গান্ধীজী। ১৯১৯ সালের ১লা মার্চ তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে প্রস্তাবিত আইন বিধিবদ্ধ হলে সত্যাগ্রহ সুরু করবেন। ৬ই এপ্রিল হরতালের ডাক দিলেন তিনি। তাঁর সেই ডাক প্রতিধ্বনিত হল সারা দেশে। আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে সাড়া দিল। আগুন জ্বলে উঠল পাঞ্জাবে। পাঞ্জাবের লাটসাহেব মাইকেল ও' ডায়ার চরম দমননীতির পথ নিল। গ্রেপ্তার করল ডাঃ সত্য পাল ও ডাঃ সইফুদ্দীন কিচলুকে। হরতালে হরতালে স্তব্ধ হয়ে গেল পাঞ্জাবের জনজীবন। ১৩ই এপ্রিল নেতৃদ্বয়ের মুক্তির দাবীতে দশহাজার হিন্দু-মুসলমান-শিখ সমবেত হলেন জালিয়ানওয়ালাবাগের এক সভায়। জেনারেল ও' ডায়ার কামান বন্দুক নিয়ে আক্রমণ চালালেন সেই নিরস্ত্র জনতার উপর। রক্তস্নাত হল জালিয়ান ওয়ালাবাগ। সৈন্যবাহিনীর গুলিতে প্রাণ হারাল একহাজার মানুষ।

একদিকে ইংরেজের প্রতি ঘৃণা এবং অপরদিকে স্বাধীনতার আকাঙ্খা তীব্রতর হয়ে উঠল ভারতবাসীর মনে। পাঞ্জাবের অত্যাচারে আন্দোলনের ঝড় উঠল সারা ভারতবর্ষে। রবীন্দ্রনাথ ভূয়া রাজসম্মানের নিদর্শন 'নাইট' উপাধি বর্জন করলেন। প্রবল গণআন্দোলনের চাপে কিছুটা নতিস্বীকার করে ইংরেজ 'ডায়ার্কি' শাসনের প্রবর্তন করল। কলকাতায় বসল কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন। ৪ঠা থেকে ৯ই সেপ্টেম্বরের এই অধিবেশনের মূল বিষয় ছিল ইংরেজের

বিরুদ্ধে গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি বাংলার চরমপন্থী নেতা ব্যোমকেশ চক্রবর্তী। মূল অধিবেশনের সভাপতি সভ্য আমেরিকা ফেরত লালা লাজপত রায়। মূল প্রস্তাব অহিংস অসহযোগ নিয়ে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিল। অসহযোগ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সব চাইতে জোরালো ভাবে এগিয়ে এলেন অ্যানি বেশান্ত। অহিংস অসহযোগ প্রস্তাবের উপর সংশোধনী প্রস্তাব আনলেন বিপিনচন্দ্র পাল ও চিত্তরঞ্জন দাস। চিত্তরঞ্জন দাসকে সমর্থন করলেন মদনমোহন মালব্য, মহম্মদআলি জিন্নাহ্, বিজয়রাঘব আচার্য। চারদিনব্যাপী তীব্র আলোচনা ও বিতর্কের পর গান্ধীজীর প্রস্তাবই গৃহীত হল ১৮৮৬ বনাম ৮৮৪ ভোটে। অসহযোগ প্রস্তাবে নির্দেশিত হল: উপাধি বর্জন, সরকারী আধা-সরকারী অনুষ্ঠান ও সরকারী বা সরকার অনুমোদিত স্কুল-কলেজ, আদালত বর্জন এবং ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যপদের নির্বাচনপত্র প্রত্যাহার। পরবর্তী কংগ্রেস হ'ল নাগপুরে। ইতিমধ্যে অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী চালু হয়ে গিয়েছে। দেশের সর্বস্তরের মানুষ সাড়া দিয়েছেন এই আন্দোলনে। বাংলার প্রবল অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃত্বে চিত্তরঞ্জন দাস, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, সুভাষচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, চাঁদমিঞা, মুজিবর রহমান, মৌলানা আক্রাম খাঁ, মৌলানা আবুলকালাম আজাদ। পরবর্তীকালে বেজওয়াদায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভায় তিন দফা প্রস্তাব গ্রহণ করে অসহযোগ আন্দোলনকে গ্রামে পৌঁছে দেবার কর্মসূচী গ্রহণ করা হ'ল। এই কর্মসূচীর অন্যতম হ'ল কুড়ি লক্ষ চরকার প্রবর্তন। সহরকেন্দ্রিক অসহযোগ আন্দোলনের নেতারা গ্রামে পৌঁছলেন। দীর্ঘদিনের অবজ্ঞাত পল্লী আন্দোলনের কেন্দ্র হয়ে সহরের মর্যাদা পেল। গ্রাম বাংলার উৎসাহ ও উদ্দীপনা-সীমাহীন হয়ে উঠল। নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ-যুবক, এমন কি কিশোররাও চরকার আন্দোলনের শরিক হ'ল। পল্লীজীবন মুখর হয়ে উঠল চরকার গুঞ্জনে। গান রচিত হ'ল: চরকা আমার সোয়ামী পুত চরকা আমার নাতি/চরকার দৌলতে মোর দুয়ারে বাঁধা হাতী। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কবিতা রচনা করলেন:

"চন্দ্রের চরকায় জ্যোৎস্নার সৃষ্টি,
সূর্যের কাটনায় কাঞ্চন বৃষ্টি।
ইন্দ্রের চরকায় মেঘজল থানথান।
হিন্দের চরকায় ইজ্জৎ সম্মান।

ঘর ঘর দৌলত! ইজ্জৎ ঘর ঘর।
ঘর ঘর হিম্মৎ—আপনার নির্ভর।
গুজরাট-পাঞ্জাব বাঙলায় সাড়া
দাঁড়া আপনার পায়ে দাঁড়া।"

প্রমোদ দাশগুপ্ত সেই বিশের দশকের বাল্যস্মৃতি স্মরণ করলেন একদিন:

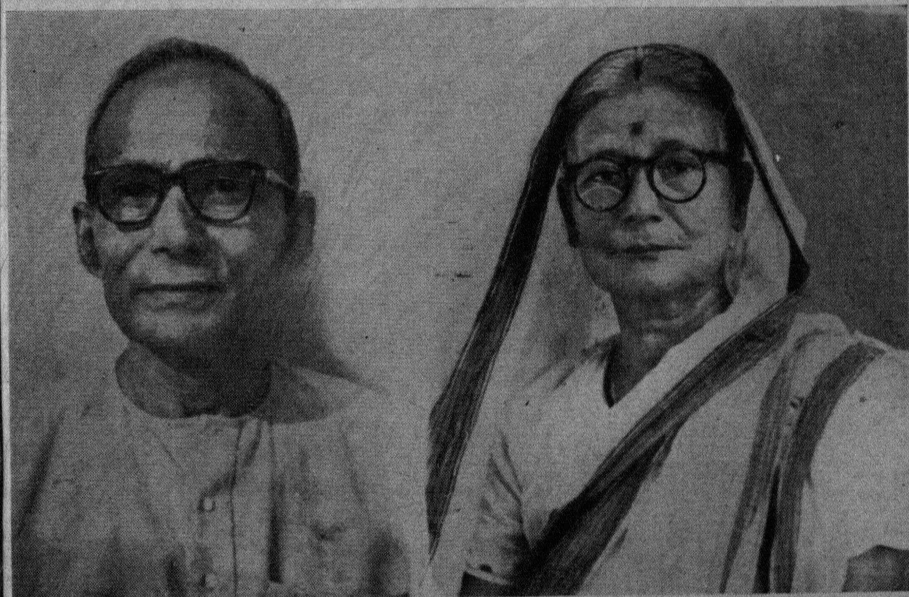
"চরকা কাটো, খদ্দর উৎপাদন করো, হাতে কাটা সুতোয় বস্ত্র সমস্যার সমাধান করো এবং এই কার্যক্রম এক বছর একটানা চালাতে পারলেই স্বরাজ এসে যাবে—গান্ধীজীর এই কথা নগণ্য পল্লীতেও পৌছে গিয়েছিল। আমার বাবা মতিলাল দাশগুপ্ত ছিলেন সরকারী চাকুরে। একজন সরকারী চাকুরের পক্ষে চরকা কাটা আর খদ্দর পরার মানেই ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সামিল, স্বদেশীতে নাম লেখানো। একজন রাজকর্মচারীর পক্ষে এমন কাজ দুঃসাহসিক, অকল্পনীয়। মতিলাল দাশগুপ্ত কিন্তু সেই কাজটিই করলেন।

"প্রিন্স অব ওয়েলস্‌-এর সফরকে কেন্দ্র করে সেই সময় সারা দেশে একটা বিক্ষোভ সুরু হ'ল। কিন্তু ঠিকমতো দানা বাঁধল না। অসহযোগ আন্দোলন চলছে। ছাত্রদের উপর তার প্রভাব প্রচুর। অনেকেই স্কুল-কলেজ ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। অনেকেই সরকারী চাকরী ছাড়লেন। আইন ব্যবসা ছাড়লেন। কিন্তু সেটাও দীর্ঘস্থায়ী হল না। তবে এই সবের মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মনোভাব গড়ে উঠল। পরবর্তীকালে আইন-অমান্য আন্দোলন সুরু হলে তার উপর প্রভাবও পড়ল।

"আমাদের পরিবারেও এই অসহযোগ ও আইন-অমান্য আন্দোলনের যথেষ্ট প্রভাব পড়েছিল। প্রতিদিন স্কুল থেকে ফিরে সামান্য জলযোগ করে চরকা নিয়ে বসতে হ'ত। সুতো কাটতে হ'ত। বৈকালিক খেলাধুলার ঝোঁক যে একেবারে ছিল না তা' নয়। খেলাধুলা করলেও সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে কিছু সময় চরকা কেটে তারপর পড়তে বসতে হ'ত। আমাদের ছোটদের চরকা কাটার তালিম দিতেন পান্নার (পান্নালাল দাশগুপ্ত) মা। পান্নার মা খুব ভাল সুতো কাটতে পারতেন।

"আমার পিতৃদেব সরকারী চাকুরিয়া ছিলেন। সরকারী চাকুরিয়ার বাড়িতে চরকা কাটা সেদিন ছিল অসম্ভব চিন্তা। তিনি কিন্তু সাহসের সঙ্গে খদ্দরের পোষাক পরতে সুরু করলেন। সেই পোষাক পরে অফিসেও যেতেন। তাঁর

মাতামহ ও মাতামহী



পিতা ডাঃ মতিলাল দাশগুপ্ত মাতা চারুবালা দেবী।



বাবা মা ও ভাইবোনদের সঙ্গে প্রমোদ দাশগুপ্ত। দাঁড়িয়ে (বাঁদিক থেকে) অনিমা, নীলিমা, প্রমোদ, প্রতিমা ও সরমা।
বসে : পিতা মতিলাল, মাতা চারুবালা। মাঝে ডলি। মাটিতে বসে ভাই মানিক ও সুবোধ।

এই খদ্দরের পোষাক দেখে এক ওপরওয়ালা সাহেব অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন : আপনি খদ্দর পরেন কেন ? মতিলাল জবাব দিলেন : এটা আমার পোষাক। সাহেব বললেন : আমরা যা পরি তা' পোষাক নয় ? মতিলালের জবাব : আপনি আপনার পোষাক পরেন, আমি আমার পোষাক পরি। কথার শেষ সেখানেই হয়নি। মতিলাল আরও বলেছিলেন : আপনি আমাদের দেশে এসে আপনার নিজের দেশের পোষাক পরতে পারেন, আর আর আমি আমার দেশে বসে আমার পোষাক পরবো না কেন ? মতিলালের দৃঢ়তায় ওপরওয়ালা সাহেব বেশী কথা বাড়ান নি। কিন্তু কলকাঠি নেড়েছিলেন। ফলে মতিলাল চাকরী জীবনে যতটা পদোন্নতির যোগ্য এবং অধিকারী ছিলেন তা' পাননি।"

সেই যুগে, সেই কালে ইংরেজের রক্তচক্ষু অগ্রাহ্য করে খদ্দরের পোষাক পরে সরকারী চাকরী করার সাহস এবং মানসিকতা প্রমোদ দাশগুপ্তের জীবনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। পান্নালালের জীবনেও। যে স্বাধীনতাবোধ এবং সাহস মতিলাল দাশগুপ্ত তাঁর দৈনন্দিন আচরণে দেখিয়েছিলেন, প্রমোদ দাশগুপ্ত শিশুকাল থেকেই তার উত্তরাধিকারী। প্রমোদ দাশগুপ্ত স্পষ্ট ভাষণের অনুপ্রেরণা পেয়েছেন পিতা মতিলাল দাশগুপ্তের কাছ থেকেই।

বাড়িতে চরকা কেটেছেন। সুতো তৈরি করেছেন। বাবাকে খদ্দর পরতে দেখেছেন। কিন্তু নিজে কখনও খদ্দর পরেন নি। চরকায় সুতো কাটার মধ্যে স্বদেশী ভাবনা আছে সত্যি, কিন্তু স্বদেশী করতে হ'লে খদ্দর পরতেই হ'বে, একথা প্রমোদের মন কখনও মানেনি। স্বাধীনতা সংগ্রাম, স্বদেশী ভাবনা এবং আবেগকে কোনদিন একই নজরে দেখতে চাননি তিনি। খদ্দরের পোষাকের অনাড়ম্বর দিকটি তিনি গ্রহণ করেছিলেন। জীবনের শুরু থেকেই পরিধেয় ছিল সাদা ধুতি ও সার্ট। ব্যতিক্রম কখনও লুঙ্গি। অবশ্য বিদেশে যাবার সময় কখনও কখনও ভিন্ন ধরনের কিছু পোষাক পরেছেন।

ফরিদপুর জেলা সহরে নিচু ক্লাশের ছাত্র তখন প্রমোদ। বিশের দশকের ভারত-ব্যাপী গণ-আন্দোলনের জোয়ার ফরিদপুর সহরকেও প্লাবিত করেছিল। ঢেউয়ের দাপট ঢাকা, বরিশাল, ফরিদপুরে একটু বেশীই ছিল। অসহযোগ আন্দোলন, বিলিতি-বর্জনকে উপলক্ষ করে প্রতিদিনই কিছু না কিছু সমাবেশ জেলাসদরে হোত। স্বদেশী গান আর যাত্রার ঢলও নেমেছিল বরিশাল-ফরিদপুরে। প্রধান কারণ, এই অঞ্চলের মানুষ মুকুন্দ দাসের প্রভাব। গেরুয়া পোষাক, মাথায় পাগড়ি

মুকুন্দদাস যাত্রা করে চলেছেন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। বজ্রকণ্ঠে গান গেয়ে চলেছেন, "ভেঙ্গে ফেলো রেশমিচুড়ি-বঙ্গনারী/কভু হাতে আর পরোনা।"

বাড়ির কাছে লালদীঘির মাঠ। সেখানে প্রমোদ দাশগুপ্ত ভীড়ের মধ্যে একজন হয়ে সভা দেখেন। বক্তৃতা শোনেন। মুগ্ধ হয়ে যেতেন শরৎ ঘোষ নামে একজন নেতাকে দেখে। পৌষে শীতের সন্ধ্যায় খালি গায়ে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করতেন শরৎ ঘোষ। দেশের মানুষের লজ্জা নিবারণে একখণ্ড বস্ত্রও জোটেনা। এক খণ্ড বস্ত্রের অতিরিক্ত পোষাক তিনিও পরতেন না। তিনি বলতেন: যেদিন সারা দেশের মানুষ পোষাকে স্বয়ম্ভর হবে সেই দিন পোষাক পরবো। শরৎ ঘোষের এই আচরণ, এই কথা কিশোর প্রমোদের জীবনে সুগভীর ছাপ ফেলে। প্রমোদ দাশগুপ্তের জীবনযাত্রায় পোষাকের অনাড়ম্বরতায় শরৎ ঘোষের প্রভাবকে লক্ষ্য করা যেতে পারে বৈকি।

মতিলাল দাশগুপ্ত বদলীর চাকরীতে আবার বদলী হলেন। এবার ফরিদপুর থেকে বরিশালে।

তৎকালীন জীবন প্রসঙ্গে প্রমোদ দাশগুপ্তের নিজের কথাই উল্লেখ করা যাক:

"১৯২২ সালের পর থেকেই পুরোপুরি না বুঝলেও বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি মন আকৃষ্ট হতে সুরু করে। ফরিদপুর থেকে বরিশালে আসবার ঠিক আগেই ফরিদপুরে এক বিরাট কৃষক সম্মেলন হ'ল। এই সম্মেলনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস আসবেন। সেই উত্তেজনায় সারা সহর কেঁপে উঠল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস তখন বাংলার নয়নমনি। মুকুটহীন সম্রাট। ত্যাগ, দুঃখবরণ ও ইংরেজের নির্যাতন ভোগ করে দেশবন্ধু দেশের মানুষের চিত্ত জয় করে নিয়েছেন। খবরের কাগজের তখন বেশী চল নেই। কিন্তু মানুষের মুখে মুখেই তাঁর কথা ছড়িয়ে পড়েছিল রূপকথার মতো। সেই রূপকথার মানুষ ফরিদপুরে আসছেন। তাঁকে সকলে দেখবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেশবন্ধু ফরিদপুরে আসতে পারেননি।

"আরও একজন মানুষকে খুব মন দিয়ে দেখতাম। তিনি হলেন তারা মিঞা। তারা মিঞা রাজনীতি করেন। আবার খেলাধুলাতেও অসাধারণ পটু। তারা মিঞার এই জীবন আমাকে খুব আকৃষ্ট করেছিল।"

আট

বরিশাল। শুধু বাংলা নয়, সমগ্র ভারতের রাজনীতির নব রূপায়ণের সূতিকাগার বরিশাল। ১৯০৬ সালে এই বরিশালেরই এক সম্মেলনে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিগ্রহে ভারতের রাজনীতি নতুন রূপ নিয়েছিল। বন্দেমাতরম্ ধ্বনিকে মন্ত্র হিসাবে গ্রহণ, বয়কট আন্দোলন, অনুশীলন সমিতির প্রসার, যুগান্তর পত্রিকার প্রতিষ্ঠা—সবই ঘটে বরিশাল সম্মেলনের পরে।

১৯০৬ সালের পর বরিশালে আরও অনেক ঘটনা ঘটে। অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা, ভারতের সশস্ত্র বিপ্লবের মূল প্রবক্তা ব্যারিষ্টার পি মিত্র বেশ কিছুদিন বরিশালে ছিলেন। কলকাতার জেলে বন্দী রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথকে জেল ভেঙে বের করে আনার উদ্দেশ্যে বরিশালে গ্রামের পর গ্রাম ঘুরে তিনি হাজার হাজার লাঠিয়াল সংগ্রহ করেছিলেন। সেদিনও বরিশাল উত্তেজনায় কেঁপে উঠেছিল। ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাস আইনব্যবসা ছেড়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিলেন, দেশবন্ধু হলেন। তারও ভিত্তিভূমি তৈরি হয়েছিল বরিশাল সহরেই।

বরিশালের রাজনৈতিক সম্মেলন। সভাপতি বিপিন চন্দ্র পাল। উপস্থিত সি আর দাস অখিল দত্ত প্রমুখ নেতারা। দেশের মানুষের কাছে গান্ধীজী ইতিমধ্যেই মহাত্মা হয়ে গিয়েছেন। বিপিন চন্দ্র পাল তাঁর ভাষণে গান্ধীজীকে মিষ্টার গান্ধী বলে উল্লেখ করলেন। চারিদিক থেকে আওয়াজ উঠল: মহাত্মা বলুন। বিপিন পালের বজ্র নির্ঘোষ: বলব না। সম্মেলন প্রায় ভেঙে যায়। বক্তৃতা দিতে উঠলেন বরিশালের জনপ্রিয় নেতা শরৎ ঘোষ। দু'ঘণ্টা ধরে গান্ধীজীর স্তুতি করলেন। বিপিন পাল সভা ছেড়ে চলে গেলেন। সভাপতিত্ব করলেন অখিল দত্ত। এই সম্মেলনেই আইনজীবীদের আদালত ত্যাগের সিদ্ধান্ত হল। চিত্তরঞ্জন দাস অবশ্য বলেছিলেন যে তিনমাসের জন্য আদালত ছাড়লেই কাজ হবে। কিন্তু সেদিন যাঁরা আদালত ছেড়েছিলেন তাঁদের অনেকেই আর আদালতে ফিরে যেতে পারেননি। চিত্তরঞ্জন দাস যখন আইনব্যবসা ত্যাগ করার কথা ঘোষণা করলেন, তখন তাঁর হাতে ছিল ডুমরাও রাজার মামলা। এই মামলার জন্য চল্লিশ হাজার টাকা আগাম নিয়েছিলেন। সেই টাকা ফেরত দিয়ে তিনি যখন আইনব্যবসা ছেড়ে দিলেন তখন শ্রদ্ধায় বিনত হ'ল সারা দেশ। এমন এক ভাবাবেগের সৃষ্টি হল যে অসংখ্য মানুষ আদালত, কলেজ ইত্যাদি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। সারা দেশে এক নতুন জোয়ার এল। বরিশাল থেকে ফিরেই

চিত্তরঞ্জন আইন-অমান্য আন্দোলনে নামলেন। সর্বত্র পুলিশের হাতে 'পিকেটিং'-কারীরা নিগৃহীত হচ্ছে। তাই দেশবন্ধু 'পিকেটিং'-এ পাঠালেন একমাত্র পুত্র চিররঞ্জন, স্ত্রী বাসন্তীদেবী এবং ভগিনী উর্মিলা দেবীকে। পরের ছেলেদের বিপদের মুখে পাঠাবার আগে নিজের স্ত্রী-পুত্রকে পথে বের করলেন। এই সময়েই সুভাষচন্দ্র আই সি-এস পদ ত্যাগ করে চিত্তরঞ্জনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন।

সব মিলিয়ে বাংলার রাজনীতিতে ভরা জোয়ার। নদীনালার দেশ বরিশালে কোটালের টানও প্রবল।

১৯২৫ সালে প্রমোদ দাশগুপ্ত বরিশাল জেলা স্কুলে ভর্তি হলেন। একই সঙ্গে ভর্তি করা হল পান্নালাল দাশগুপ্তকে। বরিশাল জেলা স্কুলে প্রমোদ ও পান্না যে পাঠ গ্রহণ করেছিলেন, উভয়েরই পরবর্তী জীবনে তার সুস্পষ্ট প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়।

বরিশাল জেলা স্কুলে প্রমোদ দাশগুপ্তের সতীর্থ ছিলেন হরিভূষণ নাথ। এই হরিভূষণ নাথের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, পরবর্তীকালে প্রমোদ-দাশগুপ্ত যখন বিপ্লবী আন্দোলনে যুক্ত হন এবং আত্মগোপন করেন, পার্টিকর্মীদের কাছে তাঁর 'কোড' নাম ছিল হরিনাথ। বরিশালের ছাত্রজীবনের স্মৃতিচারণে হরিভূষণ নাথ বলেছেন: "প্রমোদ যখন বরিশালে এল তখন তার বয়স চোদ্দ-পনেরো। যে সাদা জামা-কাপড় প্রমোদ সত্তর বছর বয়সেও পরে, কিশোর বয়সেও ছিল তার একই ধাঁচের পোষাক। কখনও কোন রঙীন, দামী, জমকালো পোষাক প্রমোদকে পরতে দেখিনি। নিয়ম মেনে চলাফেরার মধ্যে একটা ব্যক্তিত্ব, নিজের মতে অনড় থাকা, প্রমোদের বাল্য জীবন থেকেই বৈশিষ্ট্য ছিল। জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক দ্বিজেন সেনগুপ্ত। তিনি ছিলেন একজন আদর্শবাদী শিক্ষক। ছাত্রদের কাছে আরও দু'জন শিক্ষক খুবই প্রিয় ও সম্মানীয় ছিলেন। তাঁরা হলেন মন্মথ গুপ্ত ও রমেশ দে। এঁরা ছাত্রদের পড়াশুনায় যেমন সাহায্য করতেন, তেমনই সাহায্য করতেন তাদের মনে স্বদেশীভাবনা জাগিয়ে তুলতে। আমি, প্রমোদ, পান্না এবং আরও কয়েকজন রাজনীতিতে আকৃষ্ট হয়ে রাজনৈতিক কার্যকলাপে যুক্ত হয়ে পড়ি। এই যুক্ত হবার ব্যাপারটা প্রত্যেকেরই ছিল আলাদা এবং এত গোপন যে কেউ কাউকে জানতে দিতামনা। একই নেতার কাছে আমরা তিনজনই যাতায়াত করি, কিন্তু নিজেরা কখনও তাই নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতাম না। প্রমোদ পান্না দুই ভাই একই বাড়িতে থাকে, দু'জনেই রাজনীতিতে দীক্ষা নিয়েছে, কিন্তু কেউ কাউকে এ খবর জানতে দিতনা।"

পুরণো দিনের এই সব কথা আলোচনা করতে প্রমোদ দাশগুপ্ত কখনই বিশেষ আগ্রহী ছিলেন না। দীর্ঘ বছরের সাহচর্যে তাঁর ফেলে আসা দিনগুলির ব্যঞ্জনাময় কাহিনী টুকরো টুকরো ভাবে সংগ্রহ করতে হয়েছে। একদিন সেই ছাত্রজীবনের কথা বলতে গিয়ে বললেন: "বরিশালে এসে প্রথমেই খেলাধুলায় যুক্ত হয়ে পড়লাম। খেলাধুলায় একটু আগ্রহ ছিল। বরিশাল সহরে তখন দুটো নামকরা ক্লাব—নর্দার্ন এবং টাউন। খেলাধুলায় যারা ভাল তারা এই দুই ক্লাবের একটিতে ঠাঁই পেতো। বাছাই করে ছেলেদের নেওয়া হত। বাহ্যিকভাবে খেলাধুলার ক্লাব হলেও, এই দু'টি ক্লাব ছিল বিপ্লবী আন্দোলনের 'রিক্রুটিং সেণ্টার'। কিন্তু সমস্ত কাজটাই এত গোপন ও নিপুণ ছিল যে বাইরে থেকে কেউ তা বুঝতে পারতো না। ছেলেরা খেলাধূলা করছে, স্বাস্থ্যচর্চার তালিম নিচ্ছে—আবার তাদের মধ্যে থেকেই বাছাই করে ধীরে ধীরে রাজনীতির দিকে টেনে নেওয়া হচ্ছে, ছেলেরাও সেটা বুঝতে পারতোনা। নিরঞ্জন সেন, সুধীর আইচ, নলিনী দাস তখন বরিশালের বিপ্লবী আন্দোলনের যুবনায়ক। আমরা এঁদের নাম শুনতাম। এঁরা বেশীর ভাগই থাকতেন বাইরে অথবা জেলে। স্কুলের পড়া প্রায় শেষ করতে চলেছি, তখন জেল থেকে মুক্তি পেয়ে নিরঞ্জন সেন বরিশালে এলেন। আমরা কয়েকজন ধীরে ধীরে নিরঞ্জন সেনের সংস্পর্শে এলাম। কাছে, আরও কাছে টেনে নিলেন নিরঞ্জন সেন। তারপর সুরু হ'ল জীবনের নতুন পদচারণা।"

বরিশাল জেলা স্কুল থেকে প্রমোদ দাশগুপ্ত প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। বাবার ইচ্ছে ছেলে ডাক্তারী বা ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ুক। ইঞ্জিনীয়ারিং পড়াই শেষ পর্যন্ত ঠিক হল। ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে কলকাতায় থাকতে হবে। অন্য যে কোন পড়াশুনা হলে বরিশালে থেকেই হ'ত। কারণ, বরিশাল ব্রজমোহন কলেজের নামডাক কলকাতার যে কোন কলেজের চাইতে কম ছিল না। কিন্তু প্রমোদ দাশগুপ্তের কলকাতায় এসে পড়াশুনার ঝোঁকটা তখন বেশী।

নয়

প্রমোদ দাশগুপ্ত কলকাতায় এলেন ১৯২৮ সালে। সেবার কংগ্রেসের অধিবেশন হ'ল কলকাতায়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। মূল সভাপতি মতিলাল নেহরু। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রধান সুভাষ চন্দ্র বসু। পার্ক সার্কাস ময়দানে কংগ্রেসের অধিবেশনকে কেন্দ্র করে কলকাতা সারাভারতের

রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠল। অবিলম্বে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসে দুই ভাগ। একদিকে সুভাষচন্দ্র বসু, জহরলাল নেহরু প্রভৃতি তরুণ কংগ্রেসীরা। অন্যদিকে গান্ধীজী। এই সঙ্গে আওয়াজ উঠল শ্রমিক-কৃষকের দাবী তুলে ধরতে হবে কংগ্রেসের অধিবেশনে। হাজার হাজার শ্রমিকের মিছিল এগিয়ে গেল পার্ক সার্কাস ময়দানের দিকে। মিছিলের পুরোভাগে ভূপেন দত্ত, বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় প্রমুখ নেতারা—পরবর্তীকালে সাম্যবাদী নেতা রূপে যাঁরা চিহ্নিত হন। কলকাতা কংগ্রেসে একটি সর্বভারতীয় যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হ'ল। সভাপতিত্ব করলেন কে এফ নরীম্যান। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি সুভাষ চন্দ্র। পূর্ণ স্বাধীনতাকেই ভারতের রাষ্ট্রীয় আদর্শ বলে এই যুব সম্মেলনে ঘোষণা করা হয়।

১৯২৮ সালে কলকাতা কংগ্রেস শেষ হবার পর এক বছরের মধ্যেই ভারতের রাজনীতিকে প্রচণ্ডভাবে কাঁপিয়ে দিল মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা। এই ১৯২৮ সালেই ৭ই সেপ্টেম্বর লাহোরে পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সণ্ডার্স নিহত হয় বিপ্লবীর গুলিতে। সুরু হল লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা। গ্রেপ্তার হলেন ভগৎ সিং, বটুকেশ্বর দত্ত, শুকদেব, যতীন দাস। জেল হাজতে দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে, রাজবন্দীদের উপযুক্ত মর্যাদার দাবীতে অনশন সুরু করলেন যতীন দাস। দীর্ঘ ৬৪ দিন অনশনে মৃত্যু বরণ করলেন। যতীন দাসের মৃতদেহ লাহোর থেকে কলকাতায় আনা হ'ল। সেই মৃতদেহ জনসমুদ্রে বয়ে এল হাওড়া থেকে কেওড়াতলা শ্মশান-ঘাটে। ইংরেজের প্রতি ক্ষোভ ও ঘৃণায় ফেটে পড়ল ১৯২৮-এর কলকাতা।

ছাত্র প্রমোদ দাশগুপ্ত এই সব কিছুরই দর্শক। কলকাতায় তিনি প্রথমে ছিলেন বাগবাজারে। তারপর এলেন দুই নম্বর হুজুরীমল লেনে। তারপর ২৪৯ নম্বর বৌবাজার ষ্ট্রীটে। এই বাসাবদল ঘটেছে তাঁর বিপ্লবী আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায় বদলে।

বৌবাজার ষ্ট্রীটে বসুমতী পত্রিকার পাশে নরেন দাসের প্রেস। সেখানে প্রমোদ দাশগুপ্তের ডেরা। ১৯২৯ সালে বিপ্লবী আন্দোলনে সাড়া জাগালো মেছুয়াবাজার বোমার মামলা। জোড়াবাগান থানার মদন চ্যাটার্জী লেন, পার্বতীচরণ ঘোষ ষ্ট্রীট প্রভৃতি বিপ্লবীদের বিভিন্ন ঘাঁটিতে পুলিশ আসামীদের ধরবার জন্য হানা দিল। ধরা পড়লেন নিরঞ্জন সেন, সতীশ পাকড়াশী, পান্নালাল দাশগুপ্ত, সত্যব্রত সেন, শচীন করগুপ্ত, সুধাংশু দাশগুপ্ত, বিভূতি ঘোষ এবং আরও অনেকে।

প্রমোদ দাশগুপ্তকে পুলিশ ধরেনি। ধরবার তেমন কোন কারণও ছিলনা। তাঁর ভূমিকা তখন ছিল একান্তই সহযোগী ও সহকারীর। খবর এবং কাগজপত্র এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় পৌঁছে দেওয়াই ছিল তাঁর প্রধান কাজ।

নেতারা যখন ধরা পড়লেন, তখন বেশ কিছু কাজের দায়িত্ব নিতে হল প্রমোদ দাশগুপ্তকে। কোন্ বিপ্লবী নেতা কোন্ জেলে আছেন তার খোঁজ খবর রাখা এবং মামলার তদারকী-কাজে সহায়তা করাই তাঁর প্রধান কাজ হল। সুভাষচন্দ্র বসু তখন বাংলার কংগ্রেসের বড় নেতা এবং তরুণ ও যুবদের বিশিষ্ট নেতা। বোমার মামলা চালাতে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। প্রকাশ্যভাবে সেই অর্থ সংগ্রহ করা নিরাপদ ছিল না। শুধু অর্থ নয়, প্রয়োজন আরও অনেক কিছুরই। সুভাষ-চন্দ্র বসু যদি এই কাজে এগিয়ে আসেন তাহ'লে অনেকটাই সুরাহা হয়। এই সব বিপ্লবী আন্দোলন সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের মনোভাব খুব অনুকূল ছিলনা। তবুও তাঁকেই সব কিছু জানানো দরকার, বোঝানো দরকার, চেষ্টা করা দরকার যদি তাঁর সাহায্য পাওয়া যায়। কিন্তু এই কাজে চেনাজানা বড় কাউকেই পাওয়া গেলনা। দাদাস্থানীয় যে দু'একজনকে পাওয়া গেল, তাঁরাও কৌশলে এ কাজের দায়িত্ব এড়িয়ে গেলেন। প্রমোদ দাশগুপ্ত প্রকৃতপক্ষে আত্মগোপন করেই তখন কাজ করছেন। আত্মগোপন করেছেন আরও অনেকেই। সেই অবস্থাতেই প্রমোদ দাশগুপ্ত হাজির হলেন সুভাষচন্দ্রের কাছে। যতটা পারেন সুভাষচন্দ্রকে সমস্ত ঘটনা বুঝিয়ে বললেন। সাহায্যও চাইলেন। কিন্তু অনুকূল সাড়া পেলেন না।

মেছুয়াবাজার বোমার মামলা চলার সময় নিরঞ্জন সেন সহ অন্যান্য অভিযুক্তদের আদালতে নিয়ে আসা হত। প্রমোদ দাশগুপ্ত আদালতে গিয়ে ছলে কৌশলে কাঠগড়ার আসামী নিরঞ্জন সেনের কাছে গিয়ে পৌঁছতেন। নিরঞ্জন সেনও নিপুণ দক্ষতায় কাগজপত্র প্রমোদ দাশগুপ্তের হাতে পাচার করতেন। সেই কাগজে লেখা থাকত কাজের নির্দেশ—কি কাজ করতে হবে, কা'কে কি দিতে হ'বে। প্রতিটি নির্দেশ নিখুঁতভাবে পালন করতেন প্রমোদ দাশগুপ্ত। এই কাজের মধ্য দিয়ে প্রমোদ দাশগুপ্তের জীবনে এক নতুন অধ্যায় সুরু হয়।

প্রমোদ দাশগুপ্ত সংযোগরক্ষাকারী হিসাবে বন্দী নেতাদের খবর জেলের বাইরের নেতাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন। এ কাজ করতে হচ্ছে আত্মগোপন অবস্থায়। আরও কয়েকজন তাঁর এই কাজের সঙ্গী। কেউ কেউ ধরা পড়েন। প্রমাণাভাবে

ছাড়াও পান অনেকে। আত্মগোপনকারী পলাতকের কোথায়ও ঠাঁই মেলা ভার। আহার মেলাও কঠিন। প্রমোদ দাশগুপ্ত কখনও থাকেন রবি সেনের ডেরায়। কখনও বা কেদারেশ্বর সেনের তুলোর দোকানে। কেদারেশ্বরের তুলোর ব্যবসার টাকা বিপ্লবীদের ভরণপোষণেই ব্যয় হ'ত।

ত্রিশের কলকাতা। অনেক কর্মকাণ্ডে কলকাতা তখন উত্তপ্ত। রাজনীতিতে চলছে হরেকরকম হাওয়া। স্বরাজীরা মেতেছেন স্বরাজের চিন্তায়। প্রস্তাব আর প্রস্তাবের বয়ান নিয়ে কূটতর্কের শেষ নেই। বিপ্লবীরা যে যখন যেখানে পারেন ঝাঁপিয়ে পড়ছেন ইংরেজের উপর। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত আগেই ইউরোপ থেকে কলকাতায় ফিরে এসে সাম্যবাদের কথা বলছেন। বিশ্ব কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের নেতা মানবেন্দ্রনাথ রায় ভারতে এসে গা ঢাকা দিয়ে ঘুরছেন। চেষ্টা করছেন কম্যুনিষ্ট আন্দোলন আর কম্যুনিষ্ট সংগঠন গড়ে তুলতে। এই সময় প্রচণ্ড এক ঝাঁকুনিতে সমস্ত ভারত কেঁপে উঠল।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন! ১৯১৩-১৪ সালে রাসবিহারী বসু সারা ভারতবর্ষে সিপাহী বিদ্রোহের পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। ১৯১৪-১৫ সালে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন) বিদেশী অস্ত্রের সাহায্যে সারা দেশে বিপ্লবী অভ্যুত্থানের চেষ্টা করেছিলেন। আর, ১৯৩০ সালে মৃত্যুঞ্জয় বিপ্লবী তরুণরা সাময়িকভাবে হলেও সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসান ঘটিয়ে চট্টগ্রামে স্বাধীন সরকারের প্রতিষ্ঠা করলেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের নেতৃত্বের সংকল্প ছিল: মাতৃভূমির অতি ক্ষুদ্র একটি অংশকেও সাম্রাজ্যবাদের অশুভ নিয়ন্ত্রণ থেকে রক্ষা করতে হবে; স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠা ক'রে যতদিন সম্ভব সেই সরকারকে রক্ষা করতে হ'বে। বিপ্লবীরা মনে করেছিলেন, চট্টগামে যে বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ আত্মপ্রকাশ করবে, তা' একদিন নির্বাপিত হলেও অদূর ভবিষ্যতে দেশব্যাপী বিস্ফোরণের শক্তি জোগাবে। সশস্ত্র সংগ্রামের অভূতপুর্ব নজির সৃষ্টি হ'ল। চট্টগ্রামের জালালাবাদ পাহাড়ের যুদ্ধ বিশ্বের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে এক অনন্য রক্তাক্ষর অধ্যায়। মৃত্যুকে এমন বন্ধুর মতো আলিঙ্গন তুলনাহীন। সশস্ত্র সংগ্রামে আহত মুমূর্ষু এক বিপ্লবীকে ইংরেজ অফিসার প্রশ্ন করলেন: 'তুমি কি কিছু বলবে? তোমার কি কিছু চাই? জল খাবে?' অক্ষম অবরুদ্ধ কণ্ঠেও সে চীৎকার করে উঠেছিল: 'আমার রিভলভার?' উঠে বসবার চেষ্টা করল। পারল না। গড়িয়ে পড়ল। শেষ নিঃশ্বাস বেরিয়ে গেল! কালারকোম খণ্ডযুদ্ধে একে একে সব বিপ্লবীই প্রাণ দিয়েছেন। জীবিত শুধু একজন। মনোরঞ্জন। ইংরেজ ফৌজরা চীৎকার করে বলল: 'হাতের অস্ত্র ফেলে

দাও, তোমাকে আমরা মারবো না।' মনোরঞ্জনও চীৎকার করে উত্তর দিল: "মনোরঞ্জন আত্মসমর্পণ করতে জানে না।' মুখের ভেতর রিভলভারের নল ঢুকিয়ে দিল। প্রচণ্ড শব্দে মাথার ভেতর দিয়ে গুলি বেরিয়ে গেল। এমনই আত্মত্যাগের উজ্জ্বল কাহিনী প্রভাস, শশাঙ্ক, নির্মল, নরেশ, ত্রিপুরা, বিধুভূষণ, হরিগোপাল, মতিলাল, মধুসূদন, পুলিন ও টেগরার। ডালহৌসী স্কোয়ারে পুলিশের বড় কর্তা টেগার্ট-এর গাড়িতে বোমা ছুঁড়লেন দুই বিপ্লবী অনুজা সেনগুপ্ত ও দীনেশ মজুমদার। টেগার্ট প্রাণে বাঁচলেন কিন্তু ভয়ে পালিয়ে গেলেন বিলেতে। সারা কলকাতায় পুলিশের তল্লাসী সুরু হল। ডাক্তার নারায়ণ রায়ের ডাক্তারখানায় পাওয়া গেল টি-এন-টি তৈরীর ফরমূলা। গ্রেপ্তার হলেন নারায়ণ রায়, সিতাংশু সরকার, ব্রজদুলাল শ্রীমানী, ভূপাল দিহ্। টেগার্ট-এর এ দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাবার পর লক্ষ্য হ'ল লোম্যান। বিপ্লবী বিনয় বসুর রিভলভারের গুলিতে লোম্যান নিহত হলেন ঢাকায়। সেখান থেকে কলকাতায় পালিয়ে এসে অন্য দুই বিপ্লবী বাদল গুপ্ত ও দীনেশ গুপ্তকে নিয়ে ইংরেজ সরকারের প্রশাসন দুর্গ রাইটার্স বিল্ডিং অভিযান করেন। সেখানকার একটি ঘরে সিম্পসনকে হত্যা করে বিনয় বসু নিজের রিভলভারের গুলিতে আত্মহত্যা করলেন। বাদল গুপ্ত গলায় তীব্র পটাসিয়াম সায়ানাইড ঢেলে আত্মবলি দিলেন। আত্মহত্যায় ব্যর্থ, নিজের গুলিতে আহত দীনেশ ধরা পড়লেন। তাঁর ফাঁসি হল। এই হ'ল উনিশশো ত্রিশের বাংলা। উনিশশো ত্রিশের কলকাতা।

উনিশশো ত্রিশের এই অগ্নিগর্ভ কলকাতায় আত্মগোপন করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন প্রমোদ দাশগুপ্ত। ক্রমাগত ডেরা বদলাচ্ছেন। অবশেষে এণ্টালী মার্কেটের কাছে এক জায়গায় আশ্রয় নিলেন। আশা ছিল, ক'টা দিন নিশ্চিন্তে কাটবে। কিন্তু আশ্রয় পেলেই তো হয় না, আহারের সংস্থানে পথে বেরোতে হয়। আশেপাশের লোকেরা তাকিয়ে দেখে নতুন অচেনা মুখ। পিছু নেয় কেউ কেউ। দিনের পর দিন অনাহারে অর্ধাহারে থাকতেন। কিন্তু নিজের কোন আত্মীয় পরিজনের আশ্রয়ে যেতেন না। অথচ, কলকাতায় পিতৃকুল মাতৃকুল দু'কুলেরই অনেকে ছিলেন। তাঁদের কাছে গেলে খুবই আদর-যত্নে থাকতে পারতেন।

একান্ত নাচার হয়ে এক রাতে আশ্রয় নিয়েছিলেন ডক্টর লেনে সম্পর্কিত এক কাকার বাড়িতে। আত্মীয় পরিজনরা ইতিমধ্যেই জেনে গিয়েছেন তাঁদের প্রমোদ কোন্ ব্রতে দীক্ষা নিয়েছে। কাকা এবং কাকার ছেলেরা একটু সাবধান হয়েই তাঁর থাকার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু তিন রাত্রিও পার হল না। অন্ধকার

ঘরে একা বসে আছেন, এমন সময় এক খুড়তুতো ভাই চুপি চুপি এসে বলল : 'দাদা, পুলিশ!' অন্ধকার ঘর থেকে রাতের অন্ধকারে যে অবস্থায় ছিলেন সেই অবস্থাতেই ছুটলেন। ডক্টর লেন থেকে বেরিয়ে নানা গলি ঘুরে নেবুতলা পার্কের পাশ দিয়ে বৌবাজার ষ্ট্রীট। তারপর শিয়ালদহ ষ্টেশন। সেখানে একটু আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে উঠে বসলেন বগুড়াগামী ট্রেনে। ট্রেন ছাড়ল। রাতের ট্রেন। শিয়ালদহ থেকে নৈহাটি—রানাঘাট—কুষ্টিয়া—সারা ব্রীজ পার হয়ে পার্বতীপুর অভিমুখে।

তাঁর বোনের মুখে শুনেছি, প্রমোদ দাশগুপ্তের হঠাৎ বগুড়ায় রওনা দেবার কারণ, মায়ের অসুখের সংবাদ। মতিলাল দাশগুপ্ত এ সংবাদ লোক মারফত কলকাতায় পাঠিয়েছিলেন যাতে প্রমোদের কানে যায়। মতিলাল দাশগুপ্ত তখন বগুড়ায় থাকতেন। প্রমোদ দাশগুপ্ত অবশ্য ভেবেছিলেন, কলকাতায় পুলিশ তাঁর খোঁজ-তল্লাস করলেও বগুড়ায় অন্তত কিছুদিনের জন্য তিনি নিরাপদ থাকতে পারবেন। সান্তাহার স্টেশনে গাড়ি থেমেছে। গাড়িতে বসে আছেন প্রমোদ দাশগুপ্ত। নিজেকে বেশ নিরাপদ মনে হচ্ছে। হঠাৎ একজন লোক এসে কথাবার্তা বলতে শুরু করল। কিছুক্ষণ পরই তার কথার মধ্যে উদ্ধত সুর। আরও উদ্ধত সুরে তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে তিনি একজন রেল কর্মচারী। তাঁকে বিরক্ত করার স্পর্ধা দেখালে তিনি এখনই নেমে গিয়ে তাঁর উপরওয়ালা কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করবেন। ফাঁড়া কেটে গেল। সাদা পোষাকের পুলিশ বোকা বনে নেমে গেল। সান্তাহার থেকে গাড়ি ছাড়ল। বগুড়া স্টেশনে নেমে স্বস্তি পেলেন। নিজের এলাকা। এখানে আর ভয় কি? স্টেশনের গেট পেরিয়ে বাইরের চত্বর। যেখানে সব ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে সেখানে এসে লক্ষ্য করলেন একটা লোক। চোখের দৃষ্টি বাঁকা। বেশ কয়েকমাস আত্মগোপন করে পুলিশের চরদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে এখন আর তাদের চিনে নিতে কষ্ট হয় না। 'কুছ পরোয়া নেই' ভাব দেখিয়ে একটা গাড়িতে উঠে বসলেন। পাঁচজনকে শুনিয়ে বেশ জোরেই বললেন : 'জেলখানা চলো'। প্রমোদ দাশগুপ্তের বাবা তখন বগুড়ায় জেলের ডাক্তার। গাড়ি স্টেশন চত্বর ছাড়িয়ে কিছুটা এগুতেই তিনি বুঝতে পারলেন হঠাৎ গাড়ি থেমে গেল। গাড়ির চালক মুখ দিয়ে শব্দ করে ঘোড়াকে একেবারে থেমে যাবার নির্দেশ দিচ্ছে। গাড়ি থামতেই কেউ দু'দিক থেকে দরজা খুলে দিল। প্রমোদ দাশগুপ্ত দেখলেন পুলিশ গাড়ি ঘিরে ফেলেছে। এবার আর বোকা বানানো গেল না। পুলিশ কোন কথাই বলল না। গাড়ির মধ্যে

দু'জন উঠে বসল, গাড়ির পেছনে দাঁড়াল দু'জন, আর গাড়ির চালকের পাশে আর একজন। হুকুম দিল, 'গাড়ি ঘোরাও, থানায় নিয়ে চল।' পুলিশ পেয়ে গিয়েছে তাদের বহুদিনের আকাঙ্খিত প্রমোদ দাশগুপ্তকে। সোজা বগুড়া জেল। বগুড়া থেকে বহরমপুর জেল। সেখানেই ছিলেন বেশীদিন। বহরমপুর থেকে আবার বগুড়ায়। বগুড়া থেকে বক্সা ক্যাম্প। বক্সা থেকে দেউলী। জেলজীবন প্রমোদ দাশগুপ্তের নতুন জীবন।

দশ

জেলের মধ্যেও প্রমোদ দাশগুপ্ত প্রমোদ দাশগুপ্তই। তাঁর দীর্ঘ জেল ও অন্তরীণ জীবনে বহু ইংরেজ ও পদস্থ অফিসারকে তিনি নাকের জলে চোখের জলে করেছেন। বগুড়া জেলের একটি অভিজ্ঞতার কথা প্রায়ই তিনি বলতেন: "বহরমপুর জেল থেকে আমাদের অনেককেই বগুড়া জেলে নিয়ে গিয়েছে। জেলের মধ্যে জেলের অফিসাররা নানাভাবে বোঝাতে চাইত তারা কত দাপটের অফিসার। জেলার সাহেব যখন তখন আমাদের আস্তানায় ঢুকে আমাদের তল্লাসি করতো। তল্লাশির একমাত্র লক্ষ্য ছিল আমাদের উত্ত্যক্ত করা। একবার স্থির করলাম, জেলারকে আমাদের ব্যারাকে ঢুকতে দেবো না। ঠিক হল একজন পাগল সাজবে। জেলারসাহেব পুলিশ নিয়ে যখনই আসবে সে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকবে। কেউ কাছে এলেই তাকে কামড়ে দেবে। প্রথম দিনেই কাজ হল। উলঙ্গ হয়ে জেলার সাহেবকে কামড়াবার জন্য এগিয়ে যেতেই জেলার আঁৎকে উঠল: কি হ'ল? কি হ'ল? অ্যাঁ, ছ্যা, ছ্যা' বলে তিনি দৌড়ে পালিয়ে গেলেন। দ্রুত উপরতলায় খবর পাঠালেন: এক কয়েদী পাগল হয়ে গিয়েছে। খবর পেয়ে জেলা শাসক ক্যাডম্যান কোথাম জেল পরিদর্শনে এলেন। দুঁদে ইংরেজ জেল-পরিদর্শক এসেই ব্যাপারটা বুঝে ফেললেন এবং নাটের গুরুকে খুঁজে বের করলেন। কর্তৃপক্ষ যখন বুঝতে পারল আমিই নাটের গুরু, তখন আমাকে বক্সাতে পাঠিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু সেখানেও আমার বেশীদিন থাকা হ'ল না। সাহেবদের নানারকম উৎপাতে অতিষ্ঠ করতাম। এবার আমাকে চালান দেওয়া হ'ল বাংলার বাইরে সুদূর রাজস্থানে দেউলী ক্যাম্প-এ"।

দেউলী ক্যাম্প-এর জীবন এক নতুন জীবন। কিন্তু সে কাহিনী পরে। পুলিশ অফিসারদের উপর উৎপাতের কাহিনী আগে শেষ হোক।

দেউলী ক্যাম্প এ থাকাকালীন মতিলাল দাশগুপ্তের লেখালিখিতে প্রমোদ দাশগুপ্ত কিছু দিনের ছুটি পেলেন বাংলায় আসবার। বাবা মতিলাল দাশগুপ্ত বহরমপুরে বদলী হয়ে এসেছেন। মা অসুস্থ। তাই বাড়িতে থাকবার অনুমতি পেলেন। ডাকসাইটে নলিনী মজুমদার তখন বহরমপুর পুলিশের কর্তা। একদিন প্রমোদ দাশগুপ্তকে ডেকে পাঠালেন নলিনী মজুমদার। নলিনী মজুমদারের সামনে উপস্থিত হতেই প্রমোদ দাশগুপ্ত দেখলেন মজুমদার মশাই কেমন যেন সংকুচিত। ডেকে পাঠিয়েছেন অথচ কথা বলছেন কম। যা দু'একটা কথা বলছেন তা'ও মুখ নীচু করে। প্রমোদ দাশগুপ্ত তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভাষায় বললেন: "এ যে একেবারে লজ্জাবতী বধূ। চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলছেন না কেন?" কমবয়সী এবং নলিনী মজুমদারের তুলনায় বালক বললেই হয়, তার মুখ থেকে এই ধরনের কথা শুনে নলিনী মজুমদার ক্ষেপে উঠলেন। বললেন: "আপনাকে এখনই জেলে ফিরে যেতে হবে।" প্রমোদ দাশগুপ্তের সাফ জবাব: "আমি জেলে যাবোনা।" নলিনী মজুমদার আরও রেগে গেলেন। বললেন: "যাওয়া না-যাওয়া কি আপনার ইচ্ছেয় হবে?" প্রমোদ দাশগুপ্তের আবার সাফ জবাব: "হ্যাঁ, আমার ইচ্ছেতেই হবে। যখন বলেছি যাবোনা তখন নলিনী মজুমদার কেন, তাঁর বড় কর্তা হুকুম করলেও যাবোনা। নির্দেশ দিলে নির্দেশ ভাঙবো।" সত্যিই যাননি প্রমোদ দাশগুপ্ত। শেষ পর্যন্ত জেলে নয়, অন্তরীণ করে পাঠানো হল তালোরা থানার এক গ্রামে।

প্রমোদ দাশগুপ্ত থানার দারোগার সঙ্গে দেখা করলেন। দারোগাবাবু থাকবার জায়গা দেখিয়ে দিলেন। প্রথম দিন কাটলো। দ্বিতীয় দিন দারোগাবাবু প্রমোদ দাশগুপ্তকে বোঝাতে এলেন কি তাঁর করণীয় এবং কি নয়। আঙুল দিয়ে একটা সীমানা দেখিয়ে বললেন: "ওর বাইরে পা দেবেন না।" প্রমোদ দাশগুপ্ত উত্তর দিলেন: "আপনার সীমানা আমি মানিনা।" দারোগাবাবু হতবাক্। কি বলে এই ছোকরা রাজবন্দী? শুধু মুখের উপর কথা নয়। তাঁর নির্দেশ মানবোনা বলা। তিনি বললেন: "কি বলতে চান আপনি?" প্রমোদ দাশগুপ্ত বললেন: "খুব সহজ কথা। আপনার দেওয়া গণ্ডি বা সীমানা আমি মানবো না। মন যদি চায় হাঁটতে হাঁটতে এই সীমানার বাইরে চলে যাব।" দারোগাবাবু হুঙ্কার দিয়ে বললেন, "আমার কাছে এ সব চলবেনা।" প্রমোদ-

বাবুরও জবাব, "আমার কাছেও ওসব চলবেনা। আপনি জেনে রাখুন, আমার কোথায়ও যাবার ইচ্ছে নেই। প্রয়োজন নেই। তবে মন চাইলে নদীর পার ধরে একটু হাঁটাচলা করতে পারি। তবে আমার দ্বারা আপনার কোন ক্ষতি হবে না। যদি একটু এদিক ওদিক যাই, ঠিক সময়মতো ঘরে ফিরে আসবো।"

একটি ঘর সম্বল করে প্রমোদ দাশগুপ্তের অন্তরীণ জীবন সুরু হল। ঘরে কোন আসবাব পত্র নেই। মেঝেতেই সামান্য বিছানা পেতে শুয়ে থাকা। সন্ধ্যে হলে ঘর বন্ধ। সকাল হলে দরজা খোলে। ঘরের পাশ দিয়ে মানুষজনের যাতায়াত নেই। দূর থেকে ভেসে আসা কিছু শব্দ, কিছু আওয়াজ দিনরাতের সঙ্গী।

প্রমোদ দাশগুপ্ত একদিন ঘরের মেঝেতে কিছু গর্ত আবিষ্কার করলেন। দারোগা-বাবু এলে বললেন, এ ঘরে থাকা যাবে না। সাপ আছে। দারোগাবাবু গর্তগুলি মনোযোগ দিয়ে দেখে বললেন, সাপের গর্ত নয়। আগে যে বন্দী থাকতো সে নিশ্চয়ই টাকাপয়সা জমিয়ে ওই গর্তে লুকিয়ে রাখত। যাবার সময় টাকাপয়সা নিয়ে গিয়েছে। গর্তগুলি আছে।

দারোগাবাবু সতর্ক লোক। বন্দী একটু দেয়াড়া এবং একে নিয়ে ভবিষ্যতে ঝঞ্ঝাট হতে পারে—সে কথা আগেভাগেই তিনি উপরওয়ালাকে জানিয়ে রেখে দিলেন। পর পর এ রকম কয়েকটি রিপোর্টই জেলা পুলিশের উপরতলায় গেল। বেশ নাড়াচাড়াও পড়ল। সরেজমিনে তদন্তের জন্য জেলাপুলিশের সব চেয়ে বড়-কর্তাই একদিন এসে হাজির। প্রমোদ দাশগুপ্তকে দেখে তিনি অবাক। পুলিশের বড় কর্তা কানু রায় প্রমোদ দাশগুপ্তেরই গ্রামের লোক এবং বাল্যকাল থেকেই পরিচিত। কানু রায় অনেকক্ষণ বসে প্রমোদ দাশগুপ্তের সঙ্গে অনেক কথাবার্তা বললেন। তারপর যাবার সময় বললেন: 'প্রমোদ, একটি কথা আমাকে দাও। আমাকে না জানিয়ে তুমি কোথায়ও যাবেনা।' প্রমোদ দাশগুপ্ত উত্তর দিলেন: 'এ ভাবে আমার কাছ থেকে কথা আদায় করতে পারবেন না। তবে এইটুকু আপনাকে বলতে পারি, এখান থেকে বেরোলে কোন ভদ্রলোকের বাড়ি বা পাড়ায় যাবোনা। আশেপাশে কিছু কৃষক আছে। অশিক্ষিত কৃষক। তাদের কাছে একটু আধটু যেতে পারি। কিন্তু ফিরে আসবো সময়মতোই।'

এক সময় আরও দু'জন অন্তরীণ বন্দী এলে তিনজন হলেন। জীবনের একঘেয়েমি অনেকটা কেটে গেল। কিছু দূরেই নদীর তীরে থাকে এক গ্রাম্য ডাক্তার। বন্দীরা নানা কারণে নদীর তীরে যাতায়াত করেন। একদিন দুপুরবেলা ডাক্তারবাবু

হন্তদন্ত হয়ে বন্দীদের কাছে এলেন। চড়া মেজাজ। অভিযোগ করলেন, বন্দীদের মধ্যে একজন নদীর ঘাটে গিয়ে তাঁর মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। প্রমোদ দাশগুপ্ত জিজ্ঞাসা করলেন, কে তাকিয়ে থাকে, ডাক্তারবাবু কেমন করে সেটা জানলেন। ডাক্তারবাবু বললেন তাঁর মেয়েই তাকে বলেছে। কার কথা বলেছে সেটাও বললেন। তখন প্রমোদ দাশগুপ্তের প্রশ্ন, ডাক্তারবাবু কি মেয়েকে জিজ্ঞাসা করেছেন যে সে কি করে জানল যে ছেলেটি তার দিকে তাকাচ্ছে। এ নিয়ে আর কথা বাড়াননি তাঁরা। তাঁদের মধ্যে একজনের সত্যিই নদীর তীরে যাতায়াত একটু বেশীই ছিল। কিছুটা প্রশ্রয় পেয়েই। ছেলেটি বুঝতে পেরেছিল এই ঘটনার পর সে দুর্বল হয়ে পড়ছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সে অন্যত্র চলে যায়।

অন্তরীণ অবস্থায় বন্দীভাতা পেতেন মাসিক পঁচিশ টাকা। প্রথম মাসের টাকা পেয়েই তিনি সরকারের কাছে দরখাস্ত করলেন এত কম টাকায় তাঁর চলবেনা। অথচ এই পঁচিশ টাকা খরচেরই কোন উপায় ছিল না। প্রমোদ দাশগুপ্ত কলকাতায় টাকা পাঠিয়ে ডাকে খবরের কাগজের গ্রাহক হলেন। দরাজ হাতে খরচ করেও মাসে বারো টাকার বেশি খরচ করতে পারেননি। মাংসের সের চোদ্দ পয়সা। মাছ বলতে গেলে পয়সা দিয়ে কিনতেই হতনা। আগের বন্দীর মাটি খুঁড়ে টাকা রাখার কথা মোটেই মিথ্যে নয়।

সপ্তাহে একদিন হাট বসত। হাট বসার আগেই দারোগাবাবু এক দোকানদারের ঘরে গিয়ে বসতেন। বলতেন 'তামাক সাজ। স্বদেশী বাবুকে ডাক।' দারোগাবাবু হাটের পুরো সময়টা গল্পের অছিলায় প্রমোদ দাশগুপ্তকে পাশে বসিয়ে রাখতেন। যাতে তিনি হাটুরে লোকদের সঙ্গে কথা বলার বা মেলামেশার কোন সুযোগ না পান।

একদিন থানার সহকারী দারোগা প্রমোদ দাশগুপ্তের কাছে এলেন। বললেন, গোপন কথা আছে। প্রমোদ দাশগুপ্ত বললেন, 'কী ব্যাপার! আমার সঙ্গে আপনার গোপন কথা?' বিনীত দারোগা বিগলিত কণ্ঠে বললেন, 'আছে, আছে। আপনারা স্বদেশী করা লোক। পরের উপকার করাই তো আপনাদের কাজ। আমার একটা উপকার করতে হবে।' প্রমোদ দাশগুপ্ত বললেন, 'আমার কী কাজ তা আপনার চেয়ে ভাল জানি। কিন্তু আপনার কি উপকার করতে হবে বলুন?' ছোট দারোগা আরও একটু কাছে সরে এলেন। এদিক ওদিক চেয়ে বললেন, 'সামনের হাটবার। এখান দিয়ে যখন অনেক লোকজন যাতায়াত করবে তখন আমি আপনার কাছে আসব। আপনি আমাকে কষে

একটা চড় লাগাবেন।' প্রমোদ দাশগুপ্ত অবাক। 'খামাকা আপনাকে চড় লাগাতে যাব কোন দুঃখে?' ছোট দারোগা গলাটা আরও নামালেন: 'বুঝছেন না কেন? একটা চড় মারবেন। একটু হৈ-হল্লা হবে। পাঁচজন হাটুরে দেখবে। তারপরই আমার চাকরীতে প্রমোশন। স্বদেশীবাবু দারোগাকে মারলে প্রমোশন হবেই।' প্রমোদ দাশগুপ্ত বললেন, 'আমার দ্বারা এ সব হবে না। অন্য কোথায়ও চেষ্টা করে দেখুন।' ছোট দারোগা হতাশ হয়ে বললেন, 'দেশের এত কাজ করতে পারেন, দেশের মানুষের এত উপকার করতে পারেন, আর আমায় একটা চড় মেরে উপকার করতে পারেন না?' প্রমোদ দাশগুপ্ত উত্তর দিলেন, 'না, দেশের পুলিশের উপকার করতে পারি না।'

কিন্তু প্রমোদ দাশগুপ্ত কখনও কি দারোগা পুলিশের উপকার করেন নি? তখন তিনি অন্তরীণ অবস্থায়। সেই থানার দারোগাবাবুর উপর তাঁর উপরওয়ালা যে কারণেই হোক খুসি ছিলেন না। তাঁকে হয়রাণ করতে মাঝে মাঝেই উদ্ভট নির্দেশ আসতো। একবার নির্দেশ এল, তিন দিনের মধ্যে হিসাব দিতে হবে ওই থানায় মোট গরুর সংখ্যা কত। কত এঁড়ে কত বকনা। কত গরু কত বাছুর। তখন এক একটি থানার এলাকা ছিল আজকের অনেক মহকুমার সমান। আদেশ পেয়ে তো দারোগাবাবুর মাথায় হাত! প্রমোদ দাশগুপ্তের কাছে তাঁর দুঃখের কথা বললেন। কাজ করতে তাঁর আপত্তি নেই। থানার সব গরুবাছুর গুনতেও তিনি রাজী। কিন্তু তিনদিনে কোনক্রমেই সম্ভব নয়। অথচ নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে আদেশ পালন না করলে তাঁর উপর শাস্তির খড়্গ নেমে আসবে। প্রমোদ দাশগুপ্ত অভয় দিলেন 'কোন চিন্তা নেই, আমি হিসাব করে দেবো। সেই হিসাব আপনি পেশ করবেন; দেখবেন, উপরওয়ালা খুসি হয়েছেন।' ঠিক তাই হল। প্রমোদ দাশগুপ্ত এমন হিসাব করে দিলেন যা মিলিয়ে নেবার কোন চেষ্টাই উপর থেকে হলনা। আরও দু' একবার এই রকম হিসাব করে দারোগাবাবুকে বিপদ থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন তিনি।

এগারো

দেউলী ক্যাম্প-এ প্রমোদ দাশগুপ্তের প্রকৃতপক্ষে নবজন্ম হল। রাজনৈতিক নবজন্ম। জেলের বাইরে রাজনীতির যে তালিম নিয়েছিলেন, দেউলীতে তারই বনিয়াদ পাকা হল। মার্কসবাদের দীক্ষা ও শিক্ষা দেউলী ক্যাম্প থেকেই। সেখানে

প্রমোদ দাশগুপ্তের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন জীবন মাইতি, বীরেন দাশগুপ্ত, চুনী মুখার্জী, বীরেন দত্ত, ভবানী সেন, নিরঞ্জন সেন, মাখন পাল সহ আরও অনেকে। দেউলী ক্যাম্প-এ ভারতের রাজনীতির দলবদল বেশ ভালভাবেই ঘটেছে। দলভাগ নিয়ে নিজেদের মধ্যে মারামারি পর্যন্ত হ'ত। জেলকর্তৃপক্ষকে পাগলাঘন্টি বাজিয়ে থামাতে হত সেই মারামারি। ১৯৩১-৩২ সাল থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত দেউলী ও আন্দামানের বন্দীরা মুক্ত হয়ে ফিরে এসে ভারতের রাজনীতিতে বিভিন্ন দলের শীর্ষস্থান অধিকার করেছেন। ১৯৩৭ সালে দেউলী, আন্দামান ও বিভিন্ন জেল থেকে বন্দীরা মুক্তি পেয়ে বাংলায় ফিরে এলেন। তার একবছর আগেই ১৯৩৬ সালে ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির কাজের ধারার বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটে। ইতিমধ্যে কম্যুনিষ্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হবার পর বেশ কয়েক বছর কাজের মধ্য দিয়ে পার্টি কিছুটা সাবালক হয়েছে।

১৯২৮ সালে প্রমোদ দাশগুপ্ত যখন কলকাতায় প্রথম আসেন এবং ধীরে ধীরে রাজনীতির অঙ্গনে পা রাখেন তখন ভারতবর্ষ তথা বাংলায় কম্যুনিষ্ট পার্টির হাঁটি হাঁটি পা পা করে চলা সুরু হয়েছে। ১৯২০ সালে ১৭ই অক্টোবর তাসখন্দে ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির পত্তন হয়। বিপ্লবী বাবা যতীনের আমলে ১৯১৪ সালে নরেন ভট্টাচার্য ভারতবর্ষের বাইরে চলে যান। পরে মানবেন্দ্র নাথ রায় বা এম এন রায় নামে পরিচিত হন। তিনি প্রবাসে সাতজন ভারতীয় বিপ্লবীকে নিয়ে কম্যুনিষ্ট পার্টি গঠন করলেন। প্রথম সম্পাদক নির্বাচিত হন মহম্মদ শফীক সিদ্দিকি। এক বছরের মধ্যেই তাসখন্দ থেকে কাবুল কান্দাহার পেরিয়ে ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টি ভারতে উপস্থিত হল। পার্টি গড়ে উঠল কলকাতা, বোম্বাই, লাহোর, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে। কম্যুনিষ্ট ইন্টারন্যাশনালের সঙ্গে সংযোগ স্থাপিত হল। বোম্বাইয়ে এস এ ডাঙ্গে, লাহোরে গোলাম হোসেন মাদ্রাজে সি চেরিয়ার এবং বাংলায় মুজফ্ফর আহমেদ নিজেদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে সর্বভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি গঠন করেন। ১৯২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রথম সম্মেলন হল কানপুরে। এই সম্মেলনে জে বাগারহাট্টা এবং এস. ভি ঘাটে যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন। কম্যুনিষ্ট পার্টির কাজ সুরু হয় গোপনে এবং সেই সময়ে 'কম্যুনিষ্ট' নামও অনেক ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয় না। ওয়ার্কার্স এ্যাণ্ড পেজান্ট পার্টি নামেও পার্টির কাজ চলে।

১৯২৮ সালের ২১শে অক্টোবর কম্যুনিষ্ট পার্টির সর্বভারতীয় সম্মেলন হয় কলকাতার অ্যালবার্ট হলে। এই ১৯২৮ সালেই পার্টি প্রকৃতপক্ষে সুশৃঙ্খল রূপ পায় এবং

বিভিন্ন প্রদেশে পার্টির সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়। কলকাতা সম্মেলনে সর্বভারতীয় সম্পাদক হন এন নিম্বকর। বাংলা পার্টির সম্পাদক হন মুজফ্‌ফর আহমেদ, পাঞ্জাবের সোহন সিং যোশ, বোম্বাইয়ের এস এস মিরাজকর এবং যুক্ত প্রদেশের সম্পাদক হন পি সি যোশী। এই সমস্ত নেতাদের জড়িত করেই ১৯১৯ সালে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার সুরু। ভারতে কম্যুনিষ্ট পার্টি গড়ে ওঠার পক্ষে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা সাপে বর হয়। এই ষড়যন্ত্র মামলার মধ্য দিয়েই ভারতে কম্যুনিষ্ট পার্টি পরিচিতি লাভ করে এবং রাজনৈতিক দল হিসাবে জনমানসে স্বীকৃতি পায়।

১৯৩৩ সালে কলকাতায় কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতাদের এক গোপন বৈঠকে সারা ভারতে আরও বেশী ঐক্যবদ্ধভাবে কাজের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এই সময় থেকেই জেলা এবং বড় বড় সহরে পার্টির শাখা স্থাপিত হয়। কলকাতাতেও গঠিত হয় কলকাতা কম্যুনিষ্ট পার্টি। সম্পাদক হন আব্দুল হালিম। কলকাতা কম্যুনিষ্ট পার্টির একটি সম্মেলনও হয়। সর্বভারতীয় সম্মেলনও কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়! প্রথমদিন অধিবেশন বসে জ্যাকেরিয়া ষ্ট্রীটে আমজাদিয়া হোটেলের একটি ঘরে। দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন হয় কামেদন বাগানের একটি বাড়িতে। তৃতীয় দিন মানিকতলা হাসপাতালের ডাঃ রণেন সেনের বাড়িতে। চতুর্থ ও পঞ্চম দিনের অধিবেশন হয় হাওড়া ঠেলা শ্রমিকের ঘরে। এই অধিবেশনে গঙ্গাধর অধিকারী সাধারণ সম্পাদক হন। পরে অধিকারী গ্রেপ্তার হলে সম্পাদক হন এস এস মীরাজকর। তিনি গ্রেপ্তার হলে সম্পাদক হন সোমনাথ লাহিড়ী। ১৯৩৬ সালে পি সি যোশী জেল থেকে মুক্তিলাভ করলে তিনিই পার্টির সম্পাদক হন।

সর্বভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির সঙ্গে সঙ্গে বাংলা কম্যুনিষ্ট পার্টিও গড়ে উঠতে থাকে। বলতে গেলে বাংলার কম্যুনিষ্ট পার্টি ভারতীয় পার্টির চাইতে বেশী শক্তিশালী ছিল। ১৯২১ সাল থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত মুজফ্‌ফর আহমেদ বাংলাপার্টির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব বহন করেন। ১৯২৯ সালে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় তিনি গ্রেপ্তার হলে আব্দুল হালিম সম্পাদক হন। ১৯৩৫ সালে মেটিয়াবুরুজে পার্টির প্রথম গোপন অধিবেশনে সম্পাদক হন মনি চ্যাটার্জী। চন্দননগরে দ্বিতীয় গোপন অধিবেশনে নৃপেন চক্রবর্তী সম্পাদক হন। ১৯৩৯ সালে নৃপেন চক্রবর্তী গ্রেপ্তার হবার পর সম্পাদক হলেন পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী।

এরপর মুজফ্‌ফর আহমেদ জেল থেকে বেরিয়ে এলে তিনিই সম্পাদকের দায়িত্ব নেন। ভারতে কম্যুনিষ্ট পার্টি গড়ে ওঠার পরিপ্রেক্ষিতে একের পর এক ষড়যন্ত্র মামলা রুজু হয়। কম্যুনিষ্ট দমনে ইংরেজ সরকারের এই সব ষড়যন্ত্র মামলার আসামীদের প্রায় প্রত্যেকেই পরবর্তীকালে কম্যুনিষ্ট মতবাদে দীক্ষা নিয়েই জেল থেকে বেরিয়ে আসেন। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা, মেছুয়াবাজার বোমার মামলা, কলকাতা মেটিয়াবুরুজ কম্যুনিষ্ট ষড়যন্ত্র মামলা বা ভারতের অন্য প্রদেশের যে কোন ষড়যন্ত্র মামলা হোক, এই সব মামলার আটক বন্দীরা সাম্যবাদের দর্শনকে গ্রহণ করে কম্যুনিষ্ট কর্মীতে পরিণত হন। কম্যুনিষ্ট পার্টির গঠন ও তার প্রভাব জেলের মধ্যেই সব চেয়ে বেশি পড়েছিল। ১৯৩১-৩২ সালেই জেলের মধ্যে অনেক বিপ্লবী নেতা মার্ক্‌সবাদে দীক্ষিত হন। প্রথম দিকে জেলের মধ্যে মার্ক্‌সবাদের পড়াশুনা ও আলোচনা ইংরেজ সরকার খারাপ চোখে দেখত না। বন্দীদের মার্ক্‌সবাদী পত্র-পত্রিকা বা সাহিত্য পাঠে খুব বেশী বাধা দিত না। ইংরেজ অফিসারদের ধারণা ছিল, বন্দীরা মার্ক্‌সবাদ পড়লে সন্ত্রাসবাদের পথ ত্যাগ করবে। প্রকৃতপক্ষে এই ত্রিশের দশকে বাংলার সন্ত্রাসবাদী ও বিপ্লবী আন্দোলনে ইংরেজ শাসকরা চোখে প্রায় সরষে ফুল দেখত। প্রাণটাকে মুঠোর মধ্যে নিয়ে তাদের বাংলাদেশে ঘুরতে হ'ত। তিনি লাট সাহেবই হোন বা সাধারণ পুলিশ অফিসার হোন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মতো ঘটনা যেমন এই দশকে ঘটে গেছে, তেমনই অনেক ছোটখাট ঘটনা ঘটেছে যাতে অনেক লাটসাহেব, জেলা শাসক, পুলিশ সুপার আক্রান্ত হয়েছে। অনেকের প্রাণও গিয়েছে। দুর্ধর্ষ টেগার্টকে ইংলণ্ডে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে হয়েছে। তাই তারা ভাবত বোমা পিস্তল ছেড়ে বাংলার ছেলেরা মার্ক্‌সবাদ বা লেনিনের জীবনী পড়লে তাদের পরমায়ু হয়ত বাড়বে। সব জেলেই গঠিত হয়েছিল কম্যুনিষ্ট কনসলিডেশন। আন্দামানও এর ব্যতিক্রম ছিলনা। নিরঞ্জন সেন, ডাঃ নারায়ণ রায় প্রভৃতি অনেকেই মার্ক্‌সবাদে দীক্ষা নিয়েছেন।

১৯৩০-৩১ সালে বিভিন্ন মামলায় শাস্তিপ্রাপ্ত বিপ্লবীরা একের পর এক মুক্তি পেতে থাকেন। অবশ্য এই মুক্তি সহজে সম্ভব হয়নি। বন্দীমুক্তির জন্য জেলের ভেতরে ও বাইরে দুর্বার আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। আন্দামান বন্দীদের অনশন আন্দোলন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের এক উজ্জ্বল অধ্যায়। আন্দামান থেকে মুক্তিলাভ করে অনেকেই কম্যুনিষ্ট পার্টিতে যোগ দেন। পরবর্তীকালে অনেকেই পার্টির উঁচু আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য

হলেন ভবানী সেন, পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী, মণি সিং, সুধীর রায়, আলতাব আলি, নেপাল নাগ, রণধীর দাশগুপ্ত, সুরেন ধর চৌধুরী, বঙ্কেশ্বর রায় এবং আরও অনেকে। পরবর্তীকালে চল্লিশের দশকে যাঁরা আন্দামান ও অন্যান্য জেল থেকে মুক্তিলাভ করেন তাঁরাও কম্যুনিষ্ট পার্টিতে যোগ দেন।

বারো

সাত বছরের বন্দী-জীবনের শেষ দু'বছর প্রমোদ দাশগুপ্তের দেউলী ক্যাম্প-এ কাটে। সেখান থেকে ১৯৩৭ সালে মুক্তি পেয়ে তিনি কলকাতায় এলেন। সাঁইত্রিশের কলকাতায় প্রমোদ দাশগুপ্তের চিন্তাভাবনায় অন্য সুর। তাঁর নিজের কথায়: "কাজ করতে করতে একটা প্রশ্ন অনেক আগে থেকেই মনে আসছিল। প্রকৃতপক্ষে বোমা-পিস্তলের রাজনীতি সুরু করতেই, সারা দেশেই যখন এই বোমা-পিস্তলের রাজনীতি চলছিল তখন থেকেই, মনে প্রশ্ন জাগে এই পথে আমরা কোথায় যাব? আমরা কি ছেলেমানুষী করছি? সকলের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করি। পড়াশুনা করেও বুঝবার চেষ্টা করি। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে যাই। খুঁজে পেতে বই বের করি। সব বই পড়ে মানে বুঝতে পারি না। ডিক্‌সনারী দেখেও ঠিক ঠিক অর্থ বোধগম্য হয় না। একখানা বই হাতে এল। বইখানা অনেকেরই হাতে ঘুরছে। স্টালিনের লেখা বই। "ফাউণ্ডেশন অব লেনিনিজম্"। মনে তখন প্রশ্ন—অতঃপর কি? কোন পথে? হোয়াট নেক্সট্? জেলের মধ্যেও নেতাদের কাছে সে সব প্রশ্ন করেছি। কোন পথে ঘটবে মুক্তি? ইংরেজ চলে যাবে। দেশ স্বাধীন হবে। শোষণ-মুক্তি হবে কোন পথে? বালেশ্বর থেকে চট্টগ্রাম। অনেক লড়াই তো হল। এই পথ কোন পথে যাবে? জেল থেকে মুক্তি পেয়ে মুজফ্‌ফর আহমেদের সঙ্গে দেখা করলাম। নিয়মিতই দেখা করতাম। কথা বলতাম। তিনি আমার কথা শুনতেন। জবাব দিতেন। কিছু কিছু কাজ দিতেন।"

মুজফ্‌ফর আহমেদের বাসস্থানের কাছেই প্রমোদ দাশগুপ্ত থাকতেন। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে মুক্তবন্দীরা একের পর এক দেখা করেন মুজফ্‌ফর আহমেদের সঙ্গে। প্রমোদ দাশগুপ্ত আর শচী গাঙ্গুলী, দুজনে তাঁর কাছে এসে বসেন। আসেন আব্দুল হালিম এবং আরও অনেকে।

বিপ্লবী-আন্দোলন থেকে যাঁরা কম্যুনিষ্ট পার্টিতে এসেছেন তাঁদের প্রত্যেককেই কাজ করতে হত শ্রমিক বা কৃষক গণসংগঠনে। প্রমোদ দাশগুপ্ত খিদিরপুর ডক শ্রমিক ইউনিয়নে কাজ সুরু করেন। তখন পার্টি কর্মীদের ভাতা বলে কিছু ছিল না। নিজেদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা নিজেদেরই করতে হত। প্রমোদ দাশগুপ্ত ক্যালকাটা টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউট-এর ডিপ্লোমার দৌলতে একটি চাকরীর সংস্থান করে নিয়েছিলেন। আস্তানা ছিল চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউয়ে অ্যাভেনিউ ক্লাবের একটি ঘরে। এই সময় কম্যুনিষ্ট পার্টির কর্মীদের জাতীয় কংগ্রেসেও নিয়মিত কাজ করতে হ'ত। প্রমোদ দাশগুপ্ত ডক শ্রমিকদের মধ্যে আন্দোলন করতেন। অন্যদিকে আবার মধ্য-কলকাতার কংগ্রেসের অন্যতম কর্মকর্তা হিসাবেও কাজ করতেন।

তখন কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদক ছিলেন নৃপেন চক্রবর্তী। আর কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদক ছিলেন সরোজ মুখার্জী। সরোজ মুখার্জী তাঁর 'দীর্ঘ পথ পেরিয়ে' নিবন্ধে এই সময়কার বর্ণনায় লিখেছেন, "প্রায় চল্লিশজন কর্মী ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছেন কলকাতা, শহরতলী ও জেলায়। এই নিয়ে মীরাট-উত্তর কম্যুনিষ্ট পার্টির কলকাতা কেন্দ্র। এঁরা সবাই ট্রেড ইউনিয়ন করেন। কৃষক সমিতি করেন। কেউ কেউ কম্যুনিষ্ট ছাত্রলীগ গড়ে তুলেছেন। সকলে মিলে মীরাট মামলা ডিফেন্স কমিটি গড়লেন। ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে নৃত্যগীত অনুষ্ঠান করে টাকা তোলা হল। কাজী নজরুল, পঙ্কজ মল্লিক গান গাইলেন। অমলা নন্দী নাচ দেখালেন। টাকা মন্দ ওঠেনি। ট্রেড ইউনিয়ন দপ্তরগুলিতে টেবিল চেয়ার বেঞ্চ থাকে। তবে কেরোসিন কাঠের অর্থাৎ প্যাকিং বাক্সের টেবিল। আর পাতলা কাঠের চেয়ার। পার্টি অফিসে তখন টেবিল চেয়ার হয়নি। টাইপরাইটার, সাইক্লো যোগাড় হয়েছে। গোপনে সাইক্লো করার যে ব্যবস্থা ছিল তার মধ্যে একটি ছিল পার্টিদপ্তরের কাছাকাছি ডাঃ বিজয় বসুর মেসে (তিনি তখন মেডিক্যাল ছাত্র)। জ্যাকেরিয়া ষ্ট্রীটের কাছেই ইডেন হসপিটাল ও সেণ্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের মোড়ে "ডলি মেডিক্যালস্" নামে যে মেস ছিল তারই দোতলায় একটি ঘরের একটি খাট ও টেবিল চেয়ারে আমাদের পার্টির গোপন অফিস।

পার্টি বাড়ছে। আন্দোলন বাড়ছে। কিন্তু অফিসটা ঐ ভাবে জ্যাকেরিয়া ষ্ট্রীটে আছে। আরো একখানা ফালিঘর যুক্ত হল মাত্র। ঐ ঘরগুলো সিঙ্গেল সীটের রুম। ওখান থেকেই প্রকাশ্য ও গোপন সব কাজই হচ্ছে। পার্টি তখন

বেআইনী। বারে বারে সকলে গ্রেপ্তার ওখান থেকেই হচ্ছেন। একটার পর একটা মাসিক কাগজ ওখান থেকে বেরোচ্ছে। সাপ্তাহিক পত্রিকাও দু'একখানা ওখান থেকেই বেরিয়েছে। এখান থেকে বেরিয়েছে 'চাষীমজুর, 'মার্কসবাদী', 'মার্কসপন্থী' 'মজদুরোঁ কা ডঙ্কা' 'গণশক্তি' পত্রিকাগুলি। ঐ ঠিকানাতেই গণশক্তি পাবলিশিং হাউস নামে প্রকাশনার ব্যবস্থা করা হয়। কয়েকখানা বইও প্রকাশ হয়। পাঁচবছর এইভাবে কাটে। কারামুক্তির পর ১৯৩৬ সালের জুলাইয়ে মুজফ্‌ফর আহমেদ সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউতে থাকার ও পার্টি দপ্তরের ব্যবস্থা করেন। ইসলামিয়া হাসপাতালের পাশে বিরাট হোটেল—তার তেতলার একখানা ঘরে। সেখানে একখানা চৌকি—একটা টেবিল একটা চেয়ার নিয়ে পার্টিদপ্তর সুরু হল আবার। পাশে এই রকমই একটি ঘরে আব্দুল মোমিন থাকেন। হালিম ও আমরা সবাই তখন জেলে। ২৪৯ বৌবাজার স্ট্রীটে ট্রাম ইউনিয়ন, বি-পি-টি-ইউ-সি, কৃষকসভা, বিভিন্ন ইউনিয়নের অফিস চলছে। তখন লেবার পার্টির সঙ্গে কম্যুনিস্ট পার্টি একসঙ্গে কাজ করছে বলে তাদের দপ্তরগুলোও পার্টি ব্যবহার করছে। কিন্তু আসল পার্টির দপ্তর কাকাবাবুর ঐ ছোট্ট ঘরটিতে। ১৯৩৮ সালে যখন আরও অনেক কমরেড জেল থেকে মুক্তি পেয়ে এলেন তখন আরো কয়েকটি জায়গা হল। সেগুলোতেও পার্টির বিভিন্ন কাজ হত। সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউয়ের উপর মেডিক্যাল কলেজের উল্টোদিকে প্রমোদ দাশগুপ্ত, ভবানী সেন প্রমুখের অ্যাভেনিউ ক্লাবের ঘর। সাগর দত্ত লেনে রোজানা পাবলিশিং হাউসে সোমনাথ লাহিড়ীর ঘর। সাগর দত্ত লেনের আরো একটি বাড়িতে আব্দুল হালিমের ঘর। সবই পার্টির কাজে ব্যবহৃত হত।"

তেরো

সরোজ মুখার্জী তাঁর লেখায় লেবার পার্টির যে উল্লেখ করেছেন সে ব্যাপারে একটু পেছনে ফিরে যেতে হ'বে। ১৯৩৬ সালে কম্যুনিষ্ট পার্টির কাজের ধারায় কিছু পরিবর্তন করা হয়। পি সি যোশী জেল থেকে মুক্তি পেয়ে সব চেয়ে আগে প্রগতিশীল চিন্তা ও মার্কস্‌বাদে বিশ্বাসীদের কম্যুনিষ্ট পার্টির আওতায় আনার কাজ সুরু করেন। এ ব্যাপারে সব চাইতে আগে নজর দেওয়া হল লেবার পার্টির প্রতি। লেবার পার্টির নেতা নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার লণ্ডন

থাকা কালে মার্কসবাদী ছাত্রদের সংস্পর্শে আসেন। জেড-এ-আমেদ, কে-এম-আসরাফ, সাজ্জাদ জহীরের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল। নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার দেশে ফিরে লেবার পার্টিতে যোগদান করেন। কিন্তু পরে ডঃ জেড-এ-আমেদ তাঁকে কম্যুনিষ্ট পার্টিতে নিয়ে আসেন। ডঃ আমেদের চেষ্টায় নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারসহ অনেকেই কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্য হন।

সরোজ মুখার্জী "কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে" নামে গণশক্তিতে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে এই সময়ের একটি বর্ণনা তুলে ধরেছেন। সেই প্রবন্ধে তৎকালীন প্রমোদ দাশগুপ্তের চরিত্র এবং কম্যুনিষ্ট পার্টির সঙ্গে লেবার পার্টির বিচ্ছেদের উল্লেখ রয়েছে। সরোজ মুখার্জী লিখেছেন: "১৯৩৮ সালের আগস্ট মাস। আমি আর কমরেড হালিম বিনা বিচারে বন্দীদশা থেকে সব শেষে মুক্তি পাই। কাকাবাবু (কমরেড মুজফ্ফর আমেদ) তখন যেখানে থাকেন তার কাছাকাছি থাকতেন প্রমোদবাবুরা। প্রমোদবাবু আর শচী গাঙ্গুলী কাকাবাবুর কাছে বসেছিলেন। পরিচয় করিয়ে দিলেন ওঁদের সঙ্গে। আমরা বলি 'নাম শুনেছি'। জেলে জেলে চিঠিপত্র আদান-প্রদান হতো। তারই মাধ্যমে ওঁদের চিনেছি। ওঁদের তখন ডকমজদুর ইউনিয়নের কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে। রোজ বিকেলে প্রমোদবাবু কর্পোরেশনের চাকরী সেরে প্যান্ট-সার্ট খুলে লুঙ্গি পরে কাকাবাবুর কাছে হাজিরা দিতেন। তারপর কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর চলে যেতেন খিদিরপুরে। প্রমোদবাবু আর শচী গাঙ্গুলী। আমরা বলতাম এই যে মার্কস এঙ্গেলস্ যাচ্ছেন।

"আমরা বাইরে এসেই চন্দননগরে অনুষ্ঠেয় রাজ্য কমিটির দ্বিতীয় সম্মেলনের প্রস্তুতির মুখে পড়ে গেলাম। সম্মেলনের মাত্র দু'মাস বাকী। কাকাবাবু দুটো দলিল দিলেন আমাদের। গণশক্তি গ্রুপের একটা, আর একটা লেবার পার্টি গ্রুপের। দারুণ আলোচনা চলছে। এটা একটা রাজনৈতিকভাবে পার্টির গুরুত্বপূর্ণ সময় ছিল। মতপার্থক্য নিয়ে তদানীন্তন মাসিক গণশক্তি পত্রিকায় কমরেড আব্দুল হালিম ও সোমনাথ লাহিড়ীর একটি লেখা প্রকাশিত হয়। "টেনে নামাতে দেব না" শীর্ষক এই প্রবন্ধে গণশক্তি গ্রুপের বক্তব্য প্রকাশ্যে যেভাবে বলা যায় তাই লেখা হয়েছিল। রাজ্য সম্মেলনের পর লেবার পার্টির কমরেডরা সবাই কম্যুনিষ্ট পার্টি ছেড়ে চলে গেলেন বা তাঁদের চলে যেতে বলা হল। কাকাবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম 'আমাদের সবাই ঠিক থেকে গেল তো, না কমে গেল।' তিনি জবাবে বললেন, 'না, দু'একজন বেড়ে গেল।' 'কারা

তারা ?' 'প্রমোদ দাশগুপ্ত আরো দু'একজনকে ওদের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়নের কাজে পাঠিয়েছিলাম। মনে ভয় ছিল ওদের দিকে চলে না যায়। ছেলেটা বেশ রাজনৈতিক বুদ্ধি রাখে। ব্যাপারটা বুঝেই সে এদিকে এল।' প্রমোদ-বাবুর এই প্রথম রাজনৈতিক পরীক্ষা, অর্থাৎ পার্টির আভ্যন্তরীণ সংগ্রামে ঠিক পথ বেছে নেওয়ার কাজ তাঁর সুরু হল।"

এই সময়কার পরিস্থিতি বোঝাবার প্রয়োজনে আরও কিছু ঘটনা তুলে ধরা দরকার। কারণ, তার সঙ্গেও কম্যুনিষ্ট পার্টি ও কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ১৯৩৭ সালে ব্রিটিশ সরকারের নূতন শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভারতবর্ষে নির্বাচন হয়। সার্বজনীন ভোটাধিকার না থাকলেও বেশ কিছু লোকের ভোটাধিকারে নির্বাচন হয়। এই নির্বাচনে বাংলাদেশ ছাড়া প্রায় সব রাজ্যেই কংগ্রেসের জয়-জয়কার। কংগ্রেস বাংলাদেশেও ফজলুল হকের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে সরকার গঠন করতে পারত। কিন্তু প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব ভুলে অথবা নিখিল ভারত কংগ্রেসের চাপে কৃষক সমিতি বা হকসাহেবের সঙ্গে হাত মেলায় না। নাজিমুদ্দীন ও সুরাবর্দীর নেতৃত্বাধীন যে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে লড়াই করে হকসাহেব জয়ী হয়েছিলেন কংগ্রেসের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে সেই মুসলীম লীগের সঙ্গে তাঁকে হাত মেলাতে হয়। ১৯৩৭-এর নির্বাচনে কম্যুনিষ্ট পার্টির দুইজন নির্বাচিত হন, অবশ্য পার্টির টিকিটে নয়। তাঁরা হলেন বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় ও নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার।

১৯৩৭-৩৮ সালে বাংলার কম্যুনিষ্ট পার্টির কিছু অদল-বদল হয়। বাংলা-পার্টির সম্পাদক মনি চ্যাটার্জী রাজাবাগান ডক ইয়ার্ডের শ্রমিক। খুব প্রকাশ্যে কাজ করতে পারতেন না। তাই প্রকাশ্য ও গোপন কাজ ভাগাভাগি করে গোপেন চক্রবর্তীকে পার্টির প্রকাশ্য সম্পাদক করা হয়। পুলিশ মেটেবুরুজ ও চেতলায় কম্যুনিষ্ট পার্টির অফিসে তল্লাসী চালিয়ে বেশ কিছু কাগজপত্র আটক করে। মনি চ্যাটার্জী ধরা পড়েন। সুরু হয় কম্যুনিষ্ট ষড়যন্ত্র মামলা।

১৯৩৮ সালের গোড়ায় সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেসের সভাপতি হন। শ্রী বসু প্রকাশ্যেই কম্যুনিষ্ট পার্টি, সি-এস-পি এবং অন্যান্য বামপন্থীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতেন। হরিপুরা কংগ্রেসের অধিবেশনে বেশ কয়েকজন কম্যুনিষ্ট নেতা প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করেন। হরিপুরা কংগ্রেসে বাংলা কম্যুনিষ্ট পার্টির বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়, নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, মুজফ্‌ফর আহমেদ, সোমনাথ

লাহিড়ী 'এ-আই-সি-সি'-র সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৩৮ সালেই চীনে একটি মেডিক্যাল মিশন পাঠাবার উদ্যোগ নেন সুভাষচন্দ্র বসু। এই প্রতিনিধি দলে কম্যুনিষ্ট পার্টির ডাঃ রণেন সেনকে অন্যতম প্রতিনিধি করা হয়েছিল। কিন্তু ডাঃ সেন শেষ পর্যন্ত চীনে যেতে পারেননি। রণেন সেনের জায়গায় ডাঃ বিজয় বসু প্রতিনিধি হিসাবে চীনে যান।

চৌদ্দ

১৯৩৯ সালের মাঝামাঝি সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে কংগ্রেসের মধ্যে বামশক্তিগুলির একটা ফ্রন্ট গঠিত হয়। নাম দেওয়া হয় 'লেফ্‌ট্ কনসলিডেশন কমিটি।' এই কমিটির মুখ্য ধ্বনি ছিল আপোষহীন সংগ্রাম। ইংরেজ রাজের বিরুদ্ধে। ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীতে। এই কমিটিতে সুভাষচন্দ্র বসু ছাড়াও ছিলেন জয়প্রকাশ নারায়ণ, কম্যুনিষ্ট পার্টির বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়, সলি বাটলিওয়ালা, নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, সোমনাথ লাহিড়ী। ইংরেজের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম না সমঝোতা—কংগ্রেসের মধ্যে এই সময়ে এই প্রশ্ন নিয়ে প্রবল বিতর্কের সৃষ্টি হয়। সুভাষচন্দ্র ঘোষণা করলেন 'কংগ্রেসের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব থেকে এক পা পিছু হটব না।' কংগ্রেসের মধ্যে এই আপোষমুখী চেষ্টা ব্যর্থ করার জন্য সুভাষচন্দ্র লড়াইয়ে নামলেন। এই বিতর্ক চলাকালেই তিনি গান্ধীজীর মনোনীত প্রার্থী পট্টভি সীতারামাইয়াকে পরাজিত করে দ্বিতীয়বার কংগ্রেস সভাপতি হলেন। ত্রিপুরা কংগ্রেস অধিবেশনে সুভাষচন্দ্রের কার্যকলাপের নিন্দা করে একটি প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ত্রিপুরীতে উপস্থিত বামপন্থীরা দৃঢ়ভাবে সুভাষচন্দ্রের পেছনে দাঁড়াতে পারেননি। জয়প্রকাশ নারায়ণ ছিলেন দোদুল্যমান। ত্রিপুরী কংগ্রেস চলাকালেই কম্যুনিষ্ট পার্টি নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করে নিরপেক্ষ থাকার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু দলের মধ্যে চাপ সৃষ্টি হওয়ায় কম্যুনিষ্ট প্রতিনিধিরা সুভাষচন্দ্রকে সমর্থন করেন।

১৯৩৯ সালে কংগ্রেসের দলাদলি চরম আকার নিল। গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের দক্ষিণ পন্থীরা এক জোট হয়ে সুভাষচন্দ্রের উপর আক্রমণ সুরু করল। পরিণতিতে কলকাতার ওয়েংলিংটন স্কোয়ারে 'এ-আই-সি-সি'-র অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস সভাপতির পদ ত্যাগ করলেন। কংগেসও ত্যাগ করলেন।

গঠন করলেন ফরওয়ার্ড ব্লক। সঙ্গে পেলেন অনুশীলন সমিতি, শ্রীসংঘ, বি-ভি প্রভৃতিকে। সি-এস-পি এবং সি-পি-আই কংগ্রেসে রয়ে গেল। সি-পি-আই থেকে একমাত্র নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে ফরওয়ার্ড ব্লক-এ যোগ দিলেন। নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারকে কম্যুনিষ্ট পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হল।

১৯৩৮ সালে শুধু বাংলার কম্যুনিষ্ট পার্টি নয়, বাংলাকে কেন্দ্র করে বিহার, উড়িষ্যা ও আসামে কম্যুনিষ্ট পার্টি সম্প্রসারিত হয়। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সুনীল মুখার্জী কয়েকজনকে নিয়ে কলকাতায় বৈঠক করে বিহার পার্টির পত্তন করেন। এরই কিছু পরে বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় ও প্রশান্ত সান্যাল গৌহাটি গিয়ে আসামে পার্টি গঠনে সাহায্য করেন। উড়িষ্যায় পার্টি গঠিত হয় নৃপেন চক্রবর্তীর প্রচেষ্টায়। উড়িষ্যায় কমুনিষ্ট পার্টি গঠনে বিশ্বনাথ মুখার্জীর অবদান যথেষ্ট ছিল।

ইতিমধ্যে বিশ্বযুদ্ধ সুরু হয়ে গিয়েছে। ১৯৩৯ সালের আগস্ট মাসে হিটলারের পোলাণ্ড আক্রমণের মধ্য দিয়েই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা। এই যুদ্ধকে কেন্দ্র করে সব রাজনৈতিক দলের মধ্যেই তীব্র মতাদর্শগত সংঘাত সুরু হয়। এই বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে কংগ্রেসের ভূমিকা কি হবে সেই প্রশ্ন সামনে রেখে রামগড়ে কংগ্রেসের অধিবেশন বসে। একই সময়ে রামগড়েই সুভাষচন্দ্র বসু আপোষ বিরোধী সম্মেলন করেন। রামগড় সম্মেলনে বেশ কয়েকজন কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রতিনিধি যোগদান করেছিলেন।

যুদ্ধ সুরু হতেই অনেক নেতা গ্রেপ্তার হন। অনেকে আত্মগোপন করেন। আত্মগোপন অবস্থায় কয়েকজন নেতা রামগড় কংগ্রেসে আসেন। এঁদের মধ্যে ডঃ অধিকারী ও ভরদ্বাজ অন্যতম। অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন ই-এম-এস নামবুদিরিপাদ ও পি রামমূর্তি। এঁরা দু'জনে ছিলেন কংগ্রেসের প্রতিনিধি। বাংলা থেকে উপস্থিত কমরেডদের মধ্যে ছিলেন আব্দুল হালিম, রণেন সেন, লতিকা দাস, কমলা মুখার্জী, চিন্মোহন সেহানবীশ, নিখিল চক্রবর্তী, সুনীল বসু, মনি বিশ্বাস ও জ্যোতি বসু।

পনেরো

জেল এবং অন্তরীণ অবস্থা থেকে মুক্তি পেয়ে প্রমোদ দাশগুপ্ত বাড়িতে গেলেন। বাড়িতে থাকলেনও বেশ কিছুদিন। তারপর আবার রওনা হলেন কলকাতামুখো। এই সময়ের কথা প্রমোদ দাশগুপ্তের নিজের জবানীতেই হুবহু তুলে দিচ্ছি :

"আসবার সময় মা বললেন, 'খোকা, কলকাতায় গিয়ে এখানে ওখানে না থেকে দাদুর কাছে গিয়ে থাকিস। আর নিতান্তই যদি দাদুর কাছে থাকতে না চাস, মাঝে মধ্যে দাদুর সঙ্গে একটু দেখা করিস। হাজার হোক তুই তাঁর বড় নাতি।' দাদু থাকতেন টালিগঞ্জে। দাদুর সাথে দেখা করলাম। তিনি বললেন, 'কলকাতায় থাকিস, কিন্তু আমার কাছে থাকিস না কেন? আমার কাছে থাক।' আমি বললাম, 'দাদু তাতে কিছু অসুবিধা আছে।' দাদু বললেন, 'কিসের অসুবিধা? আমার এত বড় বাড়ি, এত ঘর রয়েছে। অসুবিধা কিসের?' আমি বললাম, 'অসুবিধা আমার। দাদু জোর দিয়ে বললেন, 'না, তোর কোন অসুবিধা হবে না। তুই আমার কাছে থাকবি।' দাদু বেশ নাছোড়বান্দা। আমি বললাম, 'থাকতে পারি। কিন্তু আমার বাড়ি ফেরা বা কোথায়ও যাওয়া নিয়ে কিছু বলা চলবে না। সকালে বেরিয়ে যাব, রাতে ফিরব। সেটা সন্ধ্যারাতও হতে পারে, মাঝরাতও হতে পারে।' দাদু বললেন, 'তাই হবে।' আমার উপর দাদুর একটা বিশেষ টান বা স্নেহ ছিল। বেশ কিছুদিন আছি। এর মধ্যে দাদু অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বেশ বড় ধরনের অসুখ। চব্বিশ ঘণ্টাই কাছে লোক থাকা দরকার। সেবা-শুশ্রূষা দরকার। আমি মামাদের বললাম, 'তোমরা দিনেরবেলা দাদুকে দেখবে। সেবা-শুশ্রূষা করবে। রাতের দায়িত্ব আমার। রাতে আমি দাদুর ঘরে থাকব। যা প্রয়োজন তাই করব। তোমাদের কাউকে রাত জাগতে হবে না।' আমার কথায় মামারা সকলেই বেশ খুসি। দিনরাত ভাগ করে দাদুর সেবা চলতে লাগল। আমি সারারাত দাদুর কাছে থাকতাম। সেবা-শুশ্রূষা করতাম। ধীরে ধীরে দাদু সুস্থ হয়ে উঠলেন। কিন্তু তখনই ঘটল এক বিপত্তি। সুস্থ হয়ে উঠে দাদু বলতে সুরু করলেন, রাত জেগে সেবা করে দাদুকে নাকি আমিই সুস্থ করে তুলেছি। এমনভাবে কথাটা বলতে শুরু করলেন যে আমার পক্ষে তা খুব অস্বস্তিকর হয়ে দাঁড়াল। দাদুর কথায় ভাবখানা ছিল যে অসময়ে দাদুকে নাকি একমাত্র আমিই দেখবো। পরিস্থিতি এমন দাঁড়াল, ভবিষ্যতে

দাদুর অসুস্থতায় তাঁকে যাতে আমি ঠিক মতো দেখি তার জন্য তিনি তাঁর কলকাতার সম্পত্তির একটা অংশ আমাকে আগাম দিয়ে রাখতে চাইলেন। দাদু এই কথা এমনভাবে বলতেন যাতে অন্যেরা মনে করতে পারত যে আমি বুঝি দাদুর সম্পত্তির লোভে দাদুকে রাত জেগে সেবা করেছি। এই কথাবার্তা ও আলোচনা যখন বেশ দানা বেঁধে উঠেছে, তখন একদিন ঠিক করলাম যে, আর নয়। একদিন সোজা দাদুকে বললাম ঃ দাদু আমি কালকেই চলে যাব। তবে তোমার খবর ঠিকই রাখব। দাদু বেশ অবাক হলেন। হয়ত কিছুটা রুষ্টও হলেন। কিন্তু আমি চলে এলাম। দাদুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে আশ্রয় নিলাম কোলে মার্কেটে। সেখানে নেপাল নাগ থাকতেন। তাঁর কাছেই থাকতে সুরু করলাম।"

"অনেকদিন চাকরীও করেছি। তিনবছর ছিলাম এণ্টালী ওয়ার্কশপে। এতদিন চাকরী করলে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে রিটায়ার করতাম। মল্লিকঘাট পাম্পিং স্টেশনেও কিছুদিন চাকরী করেছি। মল্লিকঘাট পাম্পিং স্টেশনের কর্তার সঙ্গে আমার একটা অভিনব সমঝোতা হয়েছিল। তিনি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। তাঁকে বললাম 'আমি সকাল ছ'টায় গিয়ে দু'টো পাম্প চালু করে দশটার মধ্যে চলে যাব।' সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বললেন, 'সে কি করে হবে? তুমি চলে যাবে। তোমার জায়গায় কাউকে তো থাকতে হবে।' শেষ পর্যন্ত কথা হল আমি চলে যাবার পর অবশিষ্ট সময়ের জন্য একজন আসবে। তাকে আমার মাইনে থেকে মাসে চল্লিশ টাকা দিতে হবে। পরে অবশ্য তার আর কোন প্রয়োজন হয়নি। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বললেন, 'তুমি চলে গেলে তোমার চাদর থাকবে চেয়ারে। আর ঐ চল্লিশ টাকা আমাকে দিতে হবে।' প্রকৃতপক্ষে তখন আর আমার চাকরী করার অবস্থা ছিলনা। পার্টির কাজ করতে সুরু করেছি। কাকাবাবু নিত্য নতুন কাজের দায়িত্ব দেন। তখন আমি ডক শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করছি। এই কাজের মধ্যে দিয়েই ১৯৩৮ সালের ১লা মে আমি পার্টির সদস্যপদ পেলাম। ইতিমধ্যে বাসস্থানও বদল করেছি। কোলে মার্কেট থেকে এসে আশ্রয় নিয়েছি অ্যাভেনিউ ক্লাবের ঘরে। ভবানী সেন আমার সঙ্গী। ১৯৩৯ সালে পার্টির কাজে আরও বেশী দায়িত্ব পাই। যুদ্ধ সুরু হতেই কম্যুনিষ্ট পার্টি যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রচারে নামে। ভারত সরকার যুদ্ধ বিরোধী কাজ বন্ধ করতে ভারতরক্ষা অর্ডিনান্স জারি করল ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ সালে। সারা দেশের কম্যুনিষ্ট কর্মীদের গ্রেপ্তার সুরু হল।"

সারা দেশের কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতা ও কর্মীরা ১৯৩৭ সালে যখন জেলে, তখন

জেলের ভেতরে ও বাইরে সব নেতাই একটা যুদ্ধের আঁচ পেয়েছিলেন। দেউলী জেলের মধ্যেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় কম্যুনিষ্ট পার্টির পক্ষ থেকে একটা দলিল প্রণয়ন করা হয়। এই দলিলের প্রণেতা বি টি রনদিভে ও এস এ ডাঙ্গে। দলিলটি জেলের মধ্য থেকে বাইরে চলে আসে। পি সি যোশী ও গঙ্গাধর অধিকারী জেলের বাইরে থেকে পার্টির কাজ পরিচালনা করছিলেন। পরবর্তীকালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যখন হিটলার সোভিয়েট দেশ আক্রমণ করল তখন ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি জনযুদ্ধের নীতি গ্রহণ করে। এই সময়ে ফ্রেণ্ডস্ অব সোভিয়েট ইউনিয়ন বা সোভিয়েট সুহৃদ সমিতি নামে একটি সংস্থা গঠিত হয়। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে এবং জনযুদ্ধের পক্ষে প্রগ্রেসিভ রাইটার্স এসোসিয়েশন বা প্রগতি লেখক সংঘ প্রচার অভিযানে নামে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভকালের একটি ছবি তুলে ধরেছেন সরোজ মুখোপাধ্যায় এবং তার পাশাপাশি সুধাংশু দাশগুপ্ত। এই ছবিতে চিত্রিত হয়েছে কী ভাবে সদ্য পার্টিসদস্যপ্রাপ্ত প্রমোদ দাশগুপ্ত পার্টির কাজের দায়িত্বে অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। সরোজ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন : "দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সুরু হয়েছে। আমি, কাকাবাবু, লাহিড়ী ও আরো অনেকে গোপন কেন্দ্রে আছি। কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদক হিসাবে আমি আণ্ডারগ্রাউণ্ডে। জেলা কমিটির সভ্য হিসাবে প্রমোদ দাশগুপ্ত বাইরে ছিলেন। তাঁকে প্রকাশ্য দায়িত্ব দেওয়া হয়। কিছুদিন পরেই তিনি ও আরো অনেকে গ্রেপ্তার হয়ে যান। ১৯৪১-৪২ সালে তাঁরা হিজলী বন্দীনিবাসে ছিলেন। ১৯৪৩ সালে রাজ্য পার্টির তৃতীয় সম্মেলনে নির্বাচিত প্রাদেশিক কমিটি খুবই ছোট ছিল। তার সম্পাদক ছিলেন কমরেড ভবানী সেন। তাঁর সঙ্গে আমি আর সুধীন (খোকা) রায় মিলে তিনজনের সম্পাদক মণ্ডলী। ঠিক হল : সংগঠন বেড়ে যাচ্ছে দ্রুত। ২৮টি জেলায় বিস্তৃত পার্টি। বেশ কয়েকজনকে পি পি ও (প্রাদেশিক কমিটির অর্গানাইজার) করতে হল। পত্র পত্রিকার (স্বাধীনতা) ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব প্রমোদবাবুর। সম্পাদনার দায়িত্ব সোমনাথ লাহিড়ী, নৃপেন চক্রবর্তী প্রমুখের। পুস্তক-পুস্তিকার দায়িত্বে কাকাবাবু। এই সময় সংগঠন মজবুত করতে হলে পুস্তক-পুস্তিকা ও সংবাদপত্র ব্যাপকভাবে প্রচার করতে হবে। পার্টি সংগঠনের কাজে আমি, আর পুস্তক-পুস্তিকার কাজে প্রমোদবাবু ২৮টি জেলা চষে বেড়িয়েছি। অনেকবার একসঙ্গেই গেছি—ঘনিষ্ঠতা তখনই বাড়লো। কৃষক, শ্রমিক, মহিলা, ছাত্র, লেখক, শিল্পী সাংস্কৃতিক প্রভৃতি ফ্রন্টের কাজে যাঁরা জেলায় জেলায় ঘুরতেন তার কাহিনী যথাসময়ে বলব। এই কয়বছরে তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতা উপলব্ধি

করলাম আমরা সবাই। পি সি যোশীর নির্দেশে সারা ভারতের পার্টিনেতা ও কর্মীদের বইকাগজ নিয়মিত বিক্রয় করতে হত। আমরা আমাদের প্রদেশে এই কাজের জন্য প্রতিযোগিতা সুরু করলাম। একবার পুরস্কার দেওয়া হয় লালপতাকা, বই প্রভৃতি। প্রমোদবাবু ও খোকা রায় প্রদেশভিত্তিতে প্রথম ও দ্বিতীয় হলেন। মেয়েদের মধ্যে প্রথম হলেন জলপাইগুড়ির লায়লা আহমদ। কলকাতায় প্রাইজ পেলেন সুধাংশু দাশগুপ্ত ও শচীন সেন। সারা প্রদেশে সংগঠন গড়ে তোলার গুরুত্বপূর্ণ সময়ে প্রমোদ দাশগুপ্তের এই দ্বিতীয় পরীক্ষা। তাতে তিনি দক্ষতার সঙ্গে উত্তীর্ণ হলেন।"

এই সময়ের বর্ণনা দিয়েছেন সুধাংশু দাশগুপ্ত: "১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে সুরু হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। বৃটিশ শাসকরা ঘোষণা করল ভারতরক্ষা আইন। ১৯৪০-এর গোড়ার দিকে নৃপেন চক্রবর্তী, সরোজ মুখার্জী আত্মগোপন করলেন। পার্টির গোপন কেন্দ্র থেকে কলকাতা জেলা কমিটির সেক্রেটারী হিসেবে সরোজ মুখার্জী পার্টির কাজ পরিচালনা করতেন। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে প্রকাশ্যে পার্টি-পরিচালনার কাজের দায়িত্ব এসে পড়ল প্রমোদ দাশগুপ্তের উপর। ১৯৪০-এর মধ্যভাগে ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার হন। এবার তাঁর বন্দীজীবন কাটে পার্টির অন্যান্য রাজবন্দীদের সঙ্গে হিজলী বন্দী শিবিরে।

১৯৪০ সালে অর্থাৎ রামগড়ে কংগ্রেস অধিবেশন শেষ হতেই কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্যদের ধরপাকড় সুরু হয়। অনেকের উপরই নিষেধাজ্ঞা। সেই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার অপরাধে জেল। জেল থেকে বেরোতেই আবার নিষেধাজ্ঞা। এদের মধ্যে মুজফ্‌ফর আহমেদ, সোমনাথ লাহিড়ী অন্যতম। তখন এঁরা দুজন কলকাতা ত্যাগ করে নবদ্বীপ গিয়ে পার্টির কাজ সুরু করেন। কলকাতায় প্রকাশ্যভাবে তখন কাজ করছিলেন ডাঃ রণেন সেন ও বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়। রণেন সেনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী হয়। তিনিও কলকাতা ত্যাগ করে নবদ্বীপে চলে যান। সেখানে মুজফ্‌ফর আহমেদ ও সোমনাথ লাহিড়ীর সঙ্গে মিলিত হন। মে মাসের শেষে যশোহর জেলার পাজিয়াতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষকসভার সম্মেলন হয়। মুজফ্‌ফর আহমেদ, সোমনাথ লাহিড়ী রণেন সেন পাজিয়া যান। কলকাতা থেকে যোগ দেন বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়, আব্দুল্লা রসুল, আব্দুল মোমিন ও নীহারেন্দু দত্তমজুমদার। ময়মনসিং থেকে এলেন মনি সিং। প্রখ্যাত সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারও পাজিয়া সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলন শেষে কম্যুনিষ্ট নেতারা বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে পড়েন। বেশ কিছুদিন বিভিন্ন জেলায় ঘুরে একে একে

সকলেই কলকাতায় ফিরে আবার আত্মগোপন করেন। একটি বাড়িতে আত্মগোপন করে থাকেন মুজফ্‌ফর আহমেদ, সোমনাথ লাহিড়ী, ভবানী সেন ও শচী গাঙ্গুলী। সেইটিই কম্যুনিষ্ট পার্টির কাজের প্রধান কেন্দ্র হিসাবে গড়ে ওঠে। রণেন সেন, পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী সহ অন্য আরও যাঁরা আত্মগোপন করে ছিলেন সকলেই এই কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলতেন। কিন্তু বেশীদিন নয়। একে একে সকলেই ধরা পড়ে গেলেন। আটক বন্দীদের সকলকেই হিজলী জেলে পাঠানো হল। প্রমোদ দাশগুপ্ত আগেই হিজলী জেলে ছিলেন। সেখানে বন্দীদের মধ্যে ছিলেন সলি বাটলিওয়ালা, নৃপেন চক্রবর্ত্তী, ধরণী গোস্বামী, প্রভাত মিত্র, জিতেন চক্রবর্ত্তী। প্রখ্যাত সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারও হিজলী বন্দীশালায় ছিলেন। সত্তর এবং আশির দশকে যিনি ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী এবং ষাটের দশকে যাকে চেয়ারে শুইয়ে বিধানসভায় আনা হত সেই নৃপেন চক্রবর্তী এবং পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী হিজলী জেলের প্রাচীর টপকে পালিয়েছিলেন। হিজলী জেলের ভয়ঙ্কর কঠোর নিরাপত্তা ভেঙ্গে জেল পালানোর সে এক অসাধারণ ইতিহাস। চার সারি কাঁটা-তার কেটে সশস্ত্র শান্ত্রীদের ফাঁকি দিয়ে নৃপেন চক্রবর্তী ও পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী জেল থেকে পালিয়ে যান। এই দুজনেই যুদ্ধ শেষ এবং কম্যুনিষ্ট পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার না হওয়া পর্যন্ত আর ধরা পড়েননি।

ষোল

১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বোম্বাইয়ে কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত সভা হয়। কম্যুনিষ্ট পার্টির যুদ্ধনীতি ঘোষণা এবং আরও অনেকগুলি কারণে কম্যুনিষ্ট পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয়। ১৯৪২ সালের ২৩শে জুলাই এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ঘোষিত হয়। পরে সেপ্টেম্বর মাসের বোম্বাই বৈঠকে ঘোষণা করা হল : এই যুদ্ধ জনযুদ্ধ। শুধু ঘোষণা নয়। বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়কে সম্পাদক এবং প্রমোদ দাশগুপ্তকে কর্মাধ্যক্ষ করে 'জনযুদ্ধ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হল প্রমোদ দাশগুপ্ত 'জনযুদ্ধ' পত্রিকার কর্মাধ্যক্ষ হয়ে পার্টি পরিচালন কর্তৃত্বের আরও এক ধাপ উঁচুতে পা রাখলেন।

সাম্রাজ্যবাদী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে জনযুদ্ধ রূপে ঘোষণা করা সম্পর্কে কম্যুনিষ্ট পার্টির বক্তব্য : হিটলারের জার্মানীর ফ্যাসিস্ট বর্বরতার দ্বারা বিশ্বের একমাত্র সমাজ

তান্ত্রিক দুর্গ সোভিয়েট রাশিয়া আক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই যুদ্ধ জনযুদ্ধে পরিণত। বিশ্বের শোষিত মানুষের প্রতিভূ সোভিয়েট রাশিয়ার জয়লাভে সাম্রাজ্যবাদের নিকৃষ্ট রূপ ফ্যাসিস্ট শক্তিই শুধু পরাভূত হবে না, অন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলিও দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। চার্চিলের মতো সাম্রাজ্যবাদীদের মাতব্বরীরও অবসান হবে। এই যুদ্ধ সমর্থনের অর্থ সাম্রাজ্যবাদী সরকারের গোলামী নয়, পরন্তু গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জন এবং জাতীয় সরকারের লক্ষ্যে প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম। যদিও কম্যুনিষ্ট পার্টির এই বক্তব্যের সঙ্গে অনেকেই সেদিন একমত হননি, তবুও কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতারা তাঁদের মত ও পথে অবিচল ছিলেন।

১৯৪২ সালে পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠে যাবার পর ১লা আগস্ট কলকাতা টাউন হলে কম্যুনিষ্টপার্টির ডাকে এক জনসভা হয়। মিছিল জমায়েত হল ওয়েলিংটন স্কোয়ারে। রাহুল সংকৃত্যায়ণ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বক্তৃতা করেন বঙ্কিম মুখার্জী, রণেন সেন, সরোজ মুখোপাধ্যায়। অনেকেই তখন আত্মগোপন করে আছেন। গোপন কেন্দ্র থেকেই ১৯৪২ সালের ১লা এপ্রিল থেকে জনযুদ্ধ পত্রিকা বের হচ্ছে। ২৪৯ বউবাজার ষ্ট্রীটে কম্যুনিস্ট পার্টির দপ্তর স্থাপিত হয়েছে। এই সর্বপ্রথম কম্যুনিস্ট পার্টির নাম উৎকীর্ণ সাইন-বোর্ড টাঙ্গানো হল।

১৯৪২ সাল থেকে পার্টি প্রমোদ দাশগুপ্তকে একটি বিশেষ দায়িত্ব দেয়। গেরিলা যুদ্ধের ট্রেনার। বর্মার একজন কম্যুনিস্ট নেতার কাছে প্রমোদ দাশগুপ্ত নিজে এই ট্রেনিং নিয়েছেন। শুধু হাতে অথবা হাতে সামান্য একটা গেলাস থাকলেও কীভাবে শত্রুর মোকাবিলা বা শত্রুকে ঘায়েল করা সম্ভব সেই শিক্ষা প্রমোদ দাশগুপ্ত পার্টির বাছাই কর্মীদের দিতেন। ১৯৪৩ সালে বাংলার পার্টির কাজ প্রচণ্ড বেড়ে যায়। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ আর জাতীয়তাবাদী দলগুলির কম্যুনিষ্ট পার্টির উপর হামলা—সব মিলিয়ে পার্টির তৎপরতা তখন তুঙ্গে। পি সি যোশী তখন দলের সাধারণ সম্পাদক। দল বড় হচ্ছে। সেই সঙ্গে কর্মক্ষেত্র সম্প্রসারিত হচ্ছে। যোশীর মতে প্রাদেশিক কমিটির সদস্যরা এই চাপ সামলাতে পারছেন না। সুতরাং নতুন কাউকে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হোক। প্রমোদ দাশগুপ্ত প্রাদেশিক কমিটির অর্গানাইজার (পিসিও) হলেন। ১৯৪৩ সালে প্রমোদ দাশগুপ্ত যখন পিসিও হলেন সেই বছরই ভারত সভা হলে কম্যুনিস্ট পার্টির প্রথম

রাজ্য সমেলন হল। অবশ্য মাঝের দুটি গোপন সম্মেলন হিসাব করলে এটি তৃতীয় সম্মেলন। ১৯৪৩ সালে ১২১ লোয়ার সার্কুলার রোডে কম্যুনিষ্ট পার্টির সদর দপ্তর স্থাপিত হল। জনযুদ্ধের দপ্তরও এখানেই ছিল। প্রমোদ দাশগুপ্ত পার্টি পরিচালনায় প্রায় প্রথম সারিতে এসে গেছেন।

১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরের আকালের দিনে 'জনযুদ্ধ' পত্রিকা রাজ্যের ক্ষুধার্ত মানুষের বুকের কান্না ও মুখের ভাষাকে তুলে ধরে। স্নেহাংশু আচার্য ও ভূপেশ গুপ্তের নেতৃত্বে এই সময় জনরক্ষা সমিতি নামে একটি সংগঠন হয়। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতিও এই সময় গঠিত হয়। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির পুরোভাগে ছিলেন মনিকুন্তলা সেন, কমলা চ্যাটার্জী, রেণু চক্রবর্ত্তী, বেলা লাহিড়ী। ১৯৪৩ সালেই পার্টির কমিউনগুলি গঠিত ও সম্প্রসারিত হয়। কলকাতা ও মফঃস্বলের জেলাগুলিতে সারাক্ষণের কর্মীরা কমিউনে থাকতেন এবং পঁচিশ টাকা করে ভাতা পেতেন।

১৯৪৩ সালের মে মাসে বোম্বাইয়ে ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেস হয়। পার্টি কংগ্রেসের প্রতিনিধি হয়ে বাংলাদেশ থেকে যে প্রতিনিধিরা গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন মুজফ্ফর আহমেদ, বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়, কনক মুখোপাধ্যায়, আব্দুল্লা রসুল, কৃষ্ণবিনোদ রায়, ডাক্তার সমর রায়চৌধুরী, সরোজ মুখোপাধ্যায়, ধীরেন মজুমদার, খোকা রায়, মনি সিং, ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত, নেপাল নাগ, কমলা মুখোপাধ্যায় এবং প্রমোদ দাশগুপ্ত। বোম্বাই পার্টি কংগ্রেসে গঠিত নতুন কমিটিতে বাংলা থেকে অন্তর্ভুক্ত হলেন সোমনাথ লাহিড়ী, ভবানী সেন, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় ও রণেন সেন। পুরনো সভ্য আব্দুল হালিম এই কমিটি থেকে বাদ পড়েন।

১৯৪৩ সালেই নাগপুরে নিখিল ভারত ট্রেডইউনিয়ন কংগ্রেসের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ডাঃ চারু বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন এই কংগ্রেসের সভাপতি। কম্যুনিষ্ট পার্টি এই কংগ্রেসে প্রথম সংগঠিত ভাবে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে যোগদান করে। মুসলীম লীগের পাকিস্তান দাবীর প্রস্তাব নিয়ে এই সময়ে দেশে জোর বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। সেই বিতর্কের ঢেউ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসেও আছড়ে পড়ে। পাকিস্তান দাবীর যথার্থতা নিয়ে সভায় জোর বিতর্ক হয়। বাংলার দুই প্রতিনিধি রণেন সেন ও চতুরআলি পাকিস্তান দাবীর প্রতি জোরালো সমর্থন জানান। আর এক প্রতিনিধি মৃনালকান্তি বসু তীব্র বিরোধিতা করেন। এস এ ডাঙ্গে সম্মেলনে

সভাপতি হন। প্রকৃতপক্ষে এ-আই-টি-ইউ-সি দখলে কম্যুনিষ্ট পার্টি নাগপুর সম্মেলনে সাফল্য লাভ করে।

১৯৪৪ সালে বাংলার লেবার পার্টির মধ্যে একটা ভাঙাগড়া হয়। ১৯৩৮ সালে নীহারেন্দু দত্তমজুমদার যখন কম্যুনিষ্ট পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হন তখন দত্তমজুমদারের সঙ্গে মনোরঞ্জন রায় ও কমল সরকার কম্যুনিষ্ট পার্টি ত্যাগ করে লেবার পার্টিতে যোগ দেন। ১৯৪৪ সালে লেবার পার্টির মধ্যে মতাদর্শের দ্বন্দ্বে মনোরঞ্জন রায়, কমল সরকার, কেষ্ট ঘোষ (বর্তমানে বামফ্রন্ট সরকারের শ্রমমন্ত্রী), নির্মল সেনগুপ্ত, নরেশ দাশগুপ্ত ও অন্যান্য অনেকে কম্যুনিষ্ট পার্টিতে যোগদান করেন। ১৯৪৪ সালে কম্যুনিষ্ট পার্টি মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবীর যৌক্তিকতা প্রকাশ্য ভাবেই করে। অগণিত মুসলিম জনগণের সমর্থনপুষ্ট এই দাবীকে ন্যায্য বলে মনে করে। কম্যুনিষ্ট পার্টির পলিট-ব্যুরোর সদস্য ডঃ গঙ্গাধর অধিকারী লিখিত 'পাকিস্তান ও জাতীয় ঐক্য' নামে বইয়ে পাকিস্তান দাবীর একটা মার্কস্‌বাদী ব্যাখ্যা দেওয়া হয়।

সতেরো

১৯৪৫ সালের ২৫শে ডিসেম্বর কম্যুনিষ্ট পার্টির মুখপত্র 'স্বাধীনতা' প্রকাশিত হল। সম্পাদক সোমনাথ লাহিড়ী। কর্মাধ্যক্ষ প্রমোদ দাশগুপ্ত। ২২১ লোয়ার সার্কুলার রোডের মণ্ডল প্রেসে পত্রিকা ছাপা হত। ১৯৪৬ সালে ৮ নম্বর ডেকার্স লেনের বিরাট বাড়িতে কম্যুনিষ্ট পার্টি ও স্বাধীনতার দপ্তর স্থানান্তরিত হল। নীচের তলায় স্বাধীনতা পত্রিকার প্রেস, দোতলায় পত্রিকার দপ্তর, তিনতলায় পার্টির রাজ্য কমিটির দপ্তর। ডেকার্স লেনের বাড়ির সব কিছু দেখাশোনা ও পরিচালনায় এক নম্বর ব্যক্তি হয়ে উঠলেন প্রমোদ দাশগুপ্ত।

ক্রমবর্ধমান কম্যুনিষ্ট পার্টি জাতীয় রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্যভাবে ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করতে শুরু করেছে। ১৯৪৬ সালের আইনসভার নির্বাচনে কম্যুনিষ্ট পার্টি প্রথম প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করে পরিষদীয় রাজনীতিতে যুক্ত হল। এই নির্বাচনে পার্টির প্রার্থীদের মধ্যে ছিলেন যশোহর জেলায় কৃষ্ণবিনোদ রায়, দিনাজপুর তপশিলী কেন্দ্র থেকে রূপনারায়ণ রায়, দার্জিলিং কেন্দ্র থেকে রতনলাল ব্রাহ্মণ, চট্টগ্রাম থেকে কল্পনা দত্ত, কলকাতা শ্রমিক আসনে সোমনাথ

লাহিড়ী, ময়মনসিংহের হাজং এলাকা থেকে মনি সিং, হাওড়া থেকে বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়, আসানসোল থেকে ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত, শ্রীরামপুর থেকে মহম্মদ ইসমাইল, বারাকপুর শ্রমিক এলাকা থেকে চতুরআলি এবং রেলকেন্দ্র থেকে জ্যোতি বসু। প্রতিটি ক্ষেত্রেই নামী প্রভাবশালী কংগ্রেস প্রার্থীদের বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছিল। যেমন, কল্পনা দত্তের বিরুদ্ধে নেলী সেনগুপ্তা, চতুরআলির বিরুদ্ধে নীহারেন্দু দত্তমজুমদার, জ্যোতি বসুর বিরুদ্ধে হুমায়ুন কবীর। কম্যুনিষ্ট পার্টিকে নির্বাচন লড়তে হয়েছিল খুবই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে। ১৯৪২ সালের পর থেকেই কম্যুনিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক শক্তির নানা অভিযোগ পুঞ্জীভূত হতে থাকে। পার্টির জনযুদ্ধ নীতি ও যুদ্ধ সমর্থন, সুভাষচন্দ্র ও আজাদ হিন্দ্ ফৌজ সম্পর্কে তার মূল্যায়ন ও বক্তব্যে বিরুদ্ধ রাজনৈতিক নেতা ও সমর্থকরা তাকে বিশ্বাসঘাতক অপবাদে অভিযুক্ত করেছিল। কম্যুনিষ্টদের উপর হামলা করা, পার্টির অফিসে আগুন লাগানো বা স্বাধীনতা পোড়ানো একটা হুজুগে পরিণত হয়েছিল। কম্যুনিষ্ট পার্টিকে তখন এই অপবাদের মোকাবিলা করতে হয় এবং এই অবস্থায় নির্বাচনের সম্মুখীন হতে হয়। ১৯৪৬ সালে কলকাতায় দেশপ্রিয় পার্কে এই সমস্ত চলতি অপবাদের উল্লেখ করে জওহরলাল নেহরু কম্যুনিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধে এক উত্তেজনাকর বক্তৃতা দেন। ফলে, সারা রাজ্যে কম্যুনিষ্ট পার্টির উপর আক্রমণ তীব্রতর হয়।

১৯৪৬ সালে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের মুক্তির দাবীতে সারা রাজ্যে, বিশেষ করে কলকাতায় আন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠে। কলকাতায় ধর্মতলা ষ্ট্রীটে ছাত্র রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও আবদুস সালাম নিহত হন। ডাঃ রণেন সেন তাঁর লিখিত বইয়ে এই সময়কার উল্লেখ করে লিখেছেন, "এই আন্দোলনে কম্যুনিষ্ট পার্টি কী করবে এই নিয়ে একটা সমস্যা সৃষ্টি হল। প্রাদেশিক কমিটির নেতারা এক জরুরী সভায় মিলিত হয়ে সিদ্ধান্ত নিলেন যে এই আন্দোলনে কম্যুনিষ্ট পার্টি সর্বতোভাবে যোগদান করবে। কম্যুনিষ্ট পার্টি এই আন্দোলনে যোগ দিল। প্রকৃতপক্ষে ১৯৪২ সালের পর থেকে কম্যুনিষ্ট পার্টির ভূমিকা অনেক মানুষের কাছে দেশপ্রেমিকসুলভ ছিল না। কিন্তু এই আন্দোলনে কম্যুনিষ্ট পার্টি যোগদান করায় কম্যুনিষ্ট পার্টি দেশপ্রেমিকের সঙ্গে হারানো ভ্রাতৃত্ববোধের যোগসূত্রতা ফিরে পেল। এই সময়ের আন্দোলনে অনেকে শহীদ হন। তার মধ্যে কম্যুনিষ্ট পার্টির অরুণ দত্ত পুলিশের গুলিতে নিহত হন।"

১৯৪৬ সালের নির্বাচনে কম্যুনিষ্ট পার্টির তিনজন প্রার্থী নির্বাচিত হলেন। রেল-

শ্রমিক কর্মীদের নির্বাচন কেন্দ্র থেকে জ্যোতি বসু। দার্জিলিং থেকে রতনলাল ব্রাহ্মণ। দিনাজপুর থেকে রূপনারায়ণ রায়।

১৯৪৬-এর কলকাতা অজস্র উত্তেজনা ও কর্মকাণ্ডে চঞ্চল। এই '৪৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে রশিদ আলি দিবস পালনের মধ্য দিয়ে কলকাতা যেমন ভ্রাতৃত্ববন্ধনের নজির স্থাপন করেছিল, তেমনই এই '৪৬-এর আগষ্ট মাসে এই সহর থেকেই সারারাজ্যে ছড়িয়ে পড়া হিন্দু মুসলমানের সর্বনাশা দাঙ্গার ঘৃণিত সাম্প্রদায়িকতা কলকাতাকে কলঙ্কিত করেছিল। এই দাঙ্গাই ভারত বিভাগকে ত্বরান্বিত করেছিল। বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করেছিল। আবার এই ১৯৪৬ সালেই সংঘটিত হয়েছিল নৌবিদ্রোহ। পুলিশ বিদ্রোহ। যে বিদ্রোহের অশনি-সংকেত ইংরেজের ভারত ত্যাগ নিশ্চিত করে তুলেছিল।

'৪৬-এর দাঙ্গায় জাতীয়তাবাদী দলগুলি সাম্প্রদায়িক দলগুলির সঙ্গে প্রায় পাল্লা দিয়ে ভ্রাতৃহত্যায় নেমেছিল। মুসলমানের পবিত্র ধ্বনি 'আল্লা হো আকবর' হুংকার তুলে ভ্রাতৃহত্যায় মেতেছিল এক শ্রেণীর মুসলমান। আবার যে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি স্বাধীনতা আন্দোলনে মন্ত্রের মতো উচ্চারিত হয়েছে, যে ধ্বনি কণ্ঠে নিয়ে শত শত শহীদ স্বদেশের মুক্তির জন্য আত্মোৎসর্গ করেছে সেই ধ্বনিই উচ্চারণ করে ভ্রাতৃহত্যায় নামল এক শ্রেণীর হিন্দু। গান্ধীজী কলকাতায় এলেন। শহীদ সুরাবর্দীকে সঙ্গে নিয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরলেন। পদযাত্রা করলেন হত্যালীলার তাণ্ডব ক্ষেত্র নোয়াখালির গ্রামে গ্রামে। সে এক অমানিশার ঘনকৃষ্ণ কাল।

এই দাঙ্গায় জড়িয়ে পড়েছিল সব সাম্প্রদায়িক দল এবং জাতীয়তাবাদী দলগুলির কিছু অংশ। ব্যতিক্রম শুধু বামপন্থী দলগুলি, যার মধ্যে কম্যুনিষ্ট পার্টি উজ্জ্বলতম। দাঙ্গা প্রতিরোধে অনেক রাজনৈতিক কর্মী প্রাণ দিয়েছিলেন। স্মৃতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজা দাশগুপ্ত এমনই অনেকে। অনেক কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতার জীবন সাংঘাতিকভাবে বিপন্ন হয়েছিল। একটি উদাহরণ। বৌবাজার-চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউয়ের সংযোগস্থলে যে বাড়িতে তখন মুজফ্ফর আহমেদ, প্রমোদ দাশগুপ্ত এবং অন্য নেতারা থাকতেন, সেই বাড়িতে তাঁরা সকলেই আটকে পড়লেন। এই আশীর দশকের গোড়ায় রাজ্যের যিনি এডভোকেট জেনারেল সেই স্নেহাংশুকান্ত আচার্য এবং রাজ্যের বর্তমান আইনমন্ত্রী মনসুর হবিবুল্লা কী ভাবে প্রমোদ দাশগুপ্ত সহ সব নেতাদের উদ্ধার করেছিলেন তার

কাহিনী স্নেহাংশুকান্ত আচার্যের লেখা থেকেই উদ্ধৃত করা হচ্ছে : "১৯৪৬ সালে আমাদের এখানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ হয় ১৫ই আগস্ট এবং আমার উপর ভার ছিল যে হিন্দু এলাকা থেকে মুসলমানদের রক্ষা করা এবং মুসলমান এলাকা থেকে হিন্দুদের রক্ষা করা। এই সময় আমি অক্টোরলনী মনুমেন্টের তলায় সরকারী সাহায্য-কেন্দ্রের একটি বিশেষ ব্রিগেডের দায়িত্বে ছিলাম। তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী সহিদ সুরাবর্দী আমাকে বিশেষ কর্তব্যের ভার দিয়ে ওখানে দায়িত্ব দিয়েছিলেন। সেদিন ১৭ই আগস্ট, বেলা প্রায় দুপুর। এমন সময় দেখলাম মহম্মদ ইসমাইল আমার কাছে দৌড়ে এসেছেন। আমি তখন একটা লরি এবং একজন ইংরেজ সৈনিক নিয়ে কোথাও যাবার জন্য ব্যবস্থা করছি। সেই সময় ইসমাইল বললেন, মোমিনের ফ্ল্যাটে এক্ষুনি যান, তা না হলে কমরেড বঙ্কিম মুখার্জী, কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্ত, প্রমুখ কমরেডরা, এমন কি মোমিন ও তাঁর স্ত্রী এক্ষুনি প্রাণ হারাবেন, কারণ ওদের আর রক্ষা করা যাচ্ছে না। আমি তখনই সেই লরিটার অন্য জায়গায় যাওয়া বন্ধ করে ওখানে নিয়ে গেলাম। আমি যখন ওখানে গিয়ে পৌছলাম (এটা হল ইসলামিয়া হাসপাতালের প্রায় পাশেই) তখন দেখি যে নীচে একটা খাবারের দোকান যার মালিক ছিলেন মুসলমান, তিনি অনেক করে যারা উপরে উঠবার চেষ্টা করছিল তাদের বারবার বলছিলেন যে, মোমিনের ফ্ল্যাটে কোন হিন্দু নেই। কিন্তু যে ক্রুদ্ধ জনতা ওখানে এসেছিল, তারা তা' গ্রাহ্য না করে শাবল, কাটারি, বল্লম, ছোরা নিয়ে তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে উপরে উঠছে। আমার তখন পরণে একটা পুরানো খাকী এ-আর-পি পোষাক ছিল এবং মাথায় ভুল করবার মত একটা সৈনিক অফিসারের পীক ক্যাপ ছিল এবং কোমরে রিভলভার ছিল। সাধারণতঃ লোকে ভাবে আমি হয়ত কোন সৈনিক অফিসার এবং সেইদিন আমি আমার রিভলভারটা বের করে একটা ফাঁকা আওয়াজ করলাম। তখন সেই জনতা সরে যেতে আমি ওপরে গেলাম। গিয়ে দেখি কমরেড বঙ্কিম মুখার্জী কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্ত সহ প্রায় চোদ্দজন ওখানে আটকা পড়ে আছেন। তাঁদের নিয়ে আমি তখন লরিতে ওঠালাম। যখন লরিতে ওঠাচ্ছি তখন সামনে একটা পেট্রল পাম্প ছিল সেখানে প্রয়াত কমরেড হালিম চীৎকার করছেন, শীঘ্র আসুন, আমার ফ্ল্যাটে কিছু কমরেড আটকা পড়ে আছেন। সেখান থেকে কমরেডদের আমার লরিতে তুলে নিলাম এবং যতদূর মনে পড়ে গীতা মুখার্জীও তখন কমরেড হালিমের ফ্ল্যাট থেকে এসে আমার গাড়িতে ওঠেন। এই সময়কার একটা কথোপকথন আমি আজও

ভুলিনি। সেটা হল প্রয়াত কমরেড বঙ্কিম মুখার্জী এবং প্রমোদবাবুর মধ্যে। বঙ্কিমদা আমাকে বলছেন যে প্রমোদের কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই কারণ আমরা দুদিন ধরে আটকা পড়ে আছি এবং আমরা ভয়ে সন্ত্রস্ত, এই অবস্থায় প্রমোদ প্রায় সব সময় ঘুমিয়েছে। প্রমোদবাবু বললেন, 'আমাদের করণীয় কিছু ছিলনা, কাজে কাজেই শুধু আতঙ্কে পড়ে থাকার কোন মানে হয়না বলে আমি ঘুমোচ্ছিলাম। এই হল প্রমোদবাবুর জীবনদর্শনের একটা দিক। তারপর থেকেই আমি আরো প্রমোদবাবুর কাছে ঘনিষ্ঠ হয়েছিলাম। তবে তিনি নেতা, আমি একজন সাধারণ কর্মী।"

আঠারো

১৯৪৭ সাল। দেশভাগের মধ্য দিয়ে স্বাধীন হল দেশ। কম্যুনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক তখন পি সি যোশী। যোশী নির্দেশ দিলেন ১৫ই আগস্টের উৎসবে পার্টিকে সামিল হতে হবে। সর্বত্র পার্টিদপ্তরে কম্যুনিষ্ট পার্টির ঝাণ্ডার সঙ্গে কংগ্রেসের ঝাণ্ডা ওড়াতে হবে। সেই সময় ফরওয়ার্ড ব্লক দেশভাগ ও আপোষের উপর প্রতিষ্ঠিত স্বাধীনতাকে মেনে নেয়নি। ফরওয়ার্ড ব্লক দেশভাগ মানেনি। আজও তাদের দলীয় কাগজপত্রে কখনও পশ্চিম বাংলা লেখা হয়না। লেখা হয় বাংলা কমিটি। কম্যুনিষ্ট পার্টি স্বাধীনতা-উৎসব পালন করলেও পরবর্তীকালে ধ্বনি তোলে—ইয়ে আজাদী ঝুটা হায়।

দেশভাগের পর পশ্চিম বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হলেন ডঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ। মন্ত্রিসভা গঠিত হল ডাক্তার সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, নিকুঞ্জ মাইতি, যাদবেন্দ্র পাঁজা, কমলকৃষ্ণ রায়, হেম নস্কর, রাধানাথ দাস ও মোহিনী মোহন বর্মণকে নিয়ে। ১৯৪৭ সালের ২১শে নভেম্বর বিধানসভার প্রথম অধিবেশন বসলো। অধিবেশনের প্রথম দিনেই কয়েক হাজার কৃষকের এক মিছিল বিধানসভা অভিযান করল। একই সময়ে ছাত্রদের একটা মিছিলও বিধানসভা অভিমুখে এগিয়ে এসেছিল। পুলিশ দুই মিছিলের গতিরোধ করল। ভূপেশ গুপ্ত সহ কয়েকজন বিধানসভা ভবনে এসে মুখ্যমন্ত্রী ডঃ ঘোষকে অনুরোধ করলেন মিছিলকে বিধানসভার গেট পর্যন্ত আসতে দেওয়া হোক। মিছিল শান্তিপূর্ণ আছে এবং শান্তিপূর্ণই থাকবে। ডঃ ঘোষ উত্তর দিলেন, শান্তিপূর্ণ হোক আর যাই হোক, মিছিলকে বিধানসভার

আসতে দেওয়া হবে না। ছাত্র মিছিলের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হল। কয়েকজন ছাত্র আহত হলেন। পরদিন পুলিশের কাজের নিন্দা করে জ্যোতি বসু একটা প্রস্তাব আনতে চাইলেন। বিধানসভায় সেই প্রস্তাব আনতে দেওয়া হল না। পরন্তু ডঃ ঘোষ বিধানসভায় বললেন যে তিনি খবর পেয়েছেন সন্ত্রাস সৃষ্টি করে কিছু রাজনৈতিক কর্মী ক্ষমতা দখল করতে চাইছে। "সেটা হবে না। আমি সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করব।"

ডঃ ঘোষ বিধানসভায় এক জরুরী বিল এনে তাঁর চিন্তা মতো ক্ষমতা দখল প্রতিরোধে নামলেন। প্রথমে বিলটির নাম ছিল "ওয়েস্ট বেঙ্গল স্পেশাল পাওয়ার বিল।" পরে বিলটির নাম পালটে রাখলেন "ওয়েস্ট বেঙ্গল সিকিউরিটি বিল।" এই বিলটি যেদিন বিধান সভায় পেশ করা হলো সেইদিন হাজার হাজার ছাত্র বিধানসভা অভিযান করল। ১৪৪ ধারা অমান্য করল। পুলিশ কমিশনার এস এন চ্যাটার্জীর নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী ঝাপিয়ে পড়ল বিক্ষোভকারী ছাত্রদের উপর। শিশির মণ্ডল নিহত হলেন। তিনি ছিলেন 'রিলিফ এ্যাণ্ড ওয়েলফেয়ার এ্যামবুলেন্স কোর'-এর লোক। এই মিছিল যাঁরা পরিচালনা করেছিলেন তাঁদের একজন ছিলেন সেদিনের ছাত্র আন্দোলনের নেতা অমর প্রসাদ চক্রবর্তী। বিধান সভায় এই ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে ডঃ ঘোষ বললেন : বিরাট ষড়যন্ত্র চলছে। এ মিছিলও একটি ষড়যন্ত্র। ১৯৪৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারী এই বিল বিধানসভায় পাশ হয়ে গেল। পক্ষে ছিলেন ৪৭ জন এবং বিপক্ষে ১২ জন। বিপক্ষের ১২ জনের নেতৃত্ব করেন জ্যোতি বসু।

এই সমস্ত ঘটনা যখন চলছে, তখন ভিতরে ভিতরে অন্য নাটকও শেষ অঙ্কে পৌঁছে গেছে। কংগ্রেস দলের মধ্যে প্রবল বিদ্রোহে ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষকে পদত্যাগ করতে হল। ১৫ই জানুয়ারী কংগ্রেস অ্যাসেমব্লী পার্টির সভায় ডঃ ঘোষ পদত্যাগ করলেন। তাঁর জায়গায় বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হলেন ডঃ বিধানচন্দ্র রায়।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হলেন ১৯৪৮ সালের ২৩শে জানুয়ারী। ডাঃ রায়ের নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করল। ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়কে মন্ত্রিসভায় আনতে ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষও চেষ্টা করেছিলেন। ডাঃ রায়কে উত্তর প্রদেশের রাজ্যপালের পদও দেওয়া হয়েছিল। তিনি সে পদও গ্রহণ করেননি। ডাঃ রায় নিজে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। অর্থ দপ্তরের মন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন নলিনীরঞ্জন সরকারকে। ডাঃ রায়ের মন্ত্রিসভায়

অন্য যাঁরা এলেন তাঁরা হলেন হরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, বিমলচন্দ্র সিংহ, ভূপতি মজুমদার, মোহিনীমোহন বর্মন, কালিপদ মুখোপাধ্যায়, যাদবেন্দ্র পাঁজা এবং হেম নস্কর। ডাঃ রায় বুঝেছিলেন যে পশ্চিম বাংলার উন্নয়নমূলক কাজ এবং কম্যুনিষ্ট দমন—এই দুটো কাজ তাঁর পক্ষে একসঙ্গে করা সম্ভব হবে না। এ ছাড়াও দেশ বিভাগজনিত কারণে রাজ্যে হাজারো সমস্যা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। উদ্বাস্তু সমস্যা ক্রমেই প্রকট হয়ে উঠছে। বিরোধী রাজনৈতিক শক্তিও ক্রমশ শক্তি সঞ্চয় করছে। ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ নতুন দল গড়ছেন ডাঃ সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও দেবেন সেনকে নিয়ে। এই পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য একজন জবরদস্ত পুলিশ মন্ত্রী অর্থাৎ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর প্রয়োজন। তাঁর নজর পড়ল কিরণশঙ্কর রায়ের প্রতি। সরোজ চক্রবর্তী লিখিত "মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে" গ্রন্থ থেকে একটি বর্ণনা এখানে প্রাসঙ্গিক বোধে তুলে ধরা হচ্ছে: "পূর্বপাকিস্তানের কংগ্রেস অ্যাসেম্বলী পার্টির নেতা কিরণশঙ্কর রায়কে মুখ্যমন্ত্রী (ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়) ডেকে পাঠিয়েছেন। একদিন বিকেলে কিরণশঙ্কর বাবু ডাঃ রায়ের বাড়িতে এসে উপস্থিত। আর তারপরে তাঁদের দুজনের মধ্যে কথাবার্তা চলতে লাগল একঘণ্টা ধরে। কম্যুনিষ্ট পার্টি তখন খুব দ্রুত শক্তি সঞ্চয় করছিল। তাদের সহিংস কাজকর্মের জন্য রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ে আর কি। সেজন্য ডাঃ রায় চাইছিলেন এমন এক লোক যিনি দক্ষ রাজনীতিবিদ্ এবং শক্ত হাতে হাল ধরতে পারবেন। ডাঃ রায়ের চোখ সহজেই গিয়ে পড়ল তাঁর আজীবন বন্ধু কিরণশঙ্কর রায়ের উপর। তাঁকে এনে হাতে দিলেন স্বরাষ্ট্র (পুলিশ) ও পরিবহন বিভাগের ভার।......কিরণশঙ্করবাবু দক্ষ মানুষ, মন্ত্রিসভায় তিনি একটি স্তম্ভ বিশেষ ছিলেন।......এই কিরণ বাবুই কমুনিষ্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন।

"প্রাদেশিক বিধানসভার প্রথম বাজেট অধিবেশন বসল ১৯৪৮ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী। ট্রেজারি বেঞ্চের প্রথম সারিতে বসলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দুই পাশে নলিনীরঞ্জন সরকার ও কিরণশঙ্কর রায়। বিরোধীপক্ষে আসন নিলেন জ্যোতি বসু, খুদাবক্স্ এবং আরও কয়েকজন মুসলমান সদস্য। বিরোধীপক্ষ আকারে ছোট হলেও তাঁদের মধ্যে কয়েকজন বক্তা ছিলেন খুব ভালো।...... সেদিন বিধানসভা বসেছিল গান্ধীজীর মৃত্যুর পরেই। সেজন্য তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ছাড়া আর কোন কাজ ছিল না। সভায় সব পক্ষ থেকেই শ্রদ্ধা জানানো হল। এবং বিরোধী পক্ষ থেকে সবার আগে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছিলেন জ্যোতি বসু।

"......আমরা আগে কম্যুনিষ্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করার কথা বলেছি। কেন এটা

করা হল বিধানসভায় সে কথা বলতে গিয়ে কিরণশঙ্কর রায় বললেন : ওরা সব বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চাইছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে হিংসাত্মক কাজের মধ্য দিয়ে ক্ষমতা দখল করা। গ্রামের লোকদের বলছে আইন-শৃঙ্খলা ভাঙো, শ্রমিকদের বলছে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক আক্রমণ চালাও আর উৎপাদন ব্যাহত করে দাও। আর তারপরে তারা বেআইনী অস্ত্রশস্ত্র জোগাড় করে তাদের কাজের জন্য পশ্চিমবঙ্গকেই প্রথম তাদের কার্যকলাপের কেন্দ্র করে তুলবে।"

কম্যুনিষ্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করার প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রী ডাঃ রায়কে কী লিখেছিলেন তা' এই সুযোগে উল্লেখ করা যেতে পারে। ঐ পার্টি স্যাবোটাজ ও সন্ত্রাসবাদের যে কর্মসূচী নিয়েছিল তা তিনি তাঁর চিঠিতে উল্লেখ করেছিলেন। এই বিষয়টি নিয়ে অবশ্য আলোচনা হয়েছিল দিল্লীতে, ১৯৪৯ সালের এপ্রিলে, মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলনে। পার্টিটিকে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হবে কি না এ বিষয়ে তাঁর মতামত দেশের সব মুখ্যমন্ত্রীদেরই তিনি লিখে জানিয়েছিলেন : "বিষয়টি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা বিবেচনা করে দেখেছে এবং তাঁদের সামনে মুখ্যমন্ত্রীদের মতামত পেশ করেছেন আমাদের উপ-প্রধানমন্ত্রী। মন্ত্রিসভা এই মত প্রকাশ করেছেন যে ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করে দেওয়ার মতো কোন পদক্ষেপ এই মুহূর্তে পরিহার করাই উচিত। সন্দেহ নেই যে, কম্যুনিষ্ট পার্টি খুবই ক্ষতিকর কাজকর্ম করে বেড়াচ্ছে। এই সব কাজকর্ম খোলাখুলি বিদ্রোহের দিকে যাচ্ছে, স্যাবোটাজ ও সন্ত্রাসবাদ ক্রমশই বাড়ছে। সেইজন্যই কী কেন্দ্রীয় সরকার কী প্রাদেশিক সরকার ঐ পার্টির সদস্যদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয়েছে। পরিস্থিতি মোতাবেক এই ব্যবস্থা চলতেও থাকবে।

"সাধারণভাবে বলা যায়, নিষিদ্ধকরণ দিয়ে সেই সংগঠনকে কাবু করা যায় না যে সংগঠন অন্তরাল থেকে কাজ করে। নিষিদ্ধকরণের ফলে স্যাবোটেজকারী ও সন্ত্রাসবাদীদের আদর্শবাদী দেশপ্রেমিকের মতো দেখাতে পারে।"

ভারতের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন একজন মিশনারী চীনদেশ ভালো করে দেখে ঘুরে এসে নেহরুজীকে একটি উপভোগ্য চিঠি লেখেন ১৫ই মে তারিখে : "বহু বুদ্ধিজীবির মনে প্রশ্ন জাগছিলো—যে সব কারণে কুওমিণ্টাং-এর বর্তমান অবস্থা হয়েছে, তার মতো অনেকগুলো কারণে কংগ্রেসেরও কি সেই অবস্থা হবে? আর সঙ্গে সঙ্গে কম্যুনিষ্টরা এসে পড়ে ভারতে বিপ্লব পুরোপুরি শেষ করার চেষ্টা করবে? ক্ষমতার লিপ্সা যখন আছে, তখন বিপ্লব আন্দোলন কি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলবে?

জনগণকে জমি ফিরিয়ে দেবার ব্যাপারে এই আন্দোলন কি গড়িমসি করবে? সর্ত নিয়ে টানাপোড়েনে খুব বেশী সময় কাটিয়ে দিয়ে? প্রত্যেক মুহূর্তেরই এখন দাম আছে। নিচুতলার কর্মচারীদের মধ্যে যে ঘুষ আর দুর্নীতি চলছে, কংগ্রেস কি তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে সব কিছু সহ্য করে যাবে? না কি চীনের কম্যুনিষ্টদের মতো নির্মমভাবে দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ করবে? এ ছাড়াও আরও কথা আছে। শিল্পক্ষেত্রে মুনাফা ভাগ করে দেওয়ার নীতির উপর কংগ্রেস কি জোর দেবে? এই সব প্রশ্নের উত্তর কংগ্রেস যদি দৃঢ়তার সঙ্গে দিতে পারে ঠিক পথে গিয়ে, তাহলেই দেশকে বাঁচাতে পারবে কম্যুনিষ্টদের হাত থেকে।"

উনিশ

১৯৪৮ সালের ২৬শে মার্চ কম্যুনিষ্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করা হল।

কোন্ পটভূমিতে পার্টি নিষিদ্ধ হয়েছিল তা উপলব্ধি করতে হলে আমাদের অনেক এগিয়ে পিছিয়ে তৎকালীন ঘটনাসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন হবে। দেশ স্বাধীন হবার পর দেশের মানুষের মনে আশা জেগেছিল, স্বাধীনতার অর্থ বুঝি দুঃখ-দারিদ্র, অভাব-বৈষম্য, নিপীড়ন-নির্যাতন থেকে মানুষের মুক্তি। পরাধীন থাকা কালে দেশের মানুষ যে দুবিসহ জীবন যন্ত্রণা ভোগ করেছে তার অবসান। কিন্তু দেশ স্বাধীন হবার পর দেশের শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত, মেহনতী মানুষ দেখল স্বাধীনতার স্বাদ তেতো। কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণী তাদের অভাব ও নিপীড়ন থেকে মুক্তির জন্য আন্দোলনের মধ্য দিয়ে দুর্বার সংগ্রাম সুরু করল। কৃষকরা সংগ্রাম সুরু করে তেভাগা আন্দোলনের। শ্রমিকদের আন্দোলন রূপায়িত হয় হরতাল-ধর্মঘটে। ১৯৪৭ সালে হরতাল-ধর্মঘট-লকআউট-এ এক লক্ষ ষাট হাজার কাজের দিন নষ্ট হয়েছিল। অর্থনৈতিক দাবী নয়, রাজনৈতিক দাবীতে ধর্মঘট হয়েছিল ২১৬টি। ১৯৪৮ সালে এই হরতাল-ধর্মঘটের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পায়। এই বছরের প্রথম দিকেই রাজনৈতিক দাবীতে ধর্মঘট হয় ৪১৪টি। সরকার দমননীতির ষ্টিম-রোলার চালিয়ে যেমন কৃষক আন্দোলন ভাঙতে তৎপর হয়, তেমনই শ্রমিক আন্দোলন দমনে নানা পথ গ্রহণ করে, যার একটি হল নিরাপত্তা আইন।

স্বাধীনতার আগে থেকেই রাজ্যব্যাপী যে কৃষক এবং শ্রমিক আন্দোলন সুরু হয়

এবং দেশ স্বাধীন হবার পরও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় তার চালিকাশক্তি ছিল কম্যুনিষ্ট পার্টি ও তার রাজনীতি।

কম্যুনিষ্ট পার্টির দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় কলকাতায় ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের ২৮ তারিখ থেকে মার্চের ৬ তারিখ। দু'বছর আগে থাকতেই তার রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক প্রস্তুতি সুরু হয়। পার্টি কংগ্রেসের আগে রাজ্য কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রাদেশিক সম্মেলন বসল ডেকার্স লেনে কম্যুনিষ্ট পার্টির দপ্তরের ছাদে। আগেই দেশভাগ হয়ে গেলেও পুরো বাংলার সমস্ত জেলার প্রতিনিধিরাই এই সম্মেলনে যোগদান করেন। সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন ডাঃ রণেন সেন। সম্পাদক নির্বাচিত হলেন সরোজ মুখোপাধ্যায়, নিরঞ্জন সেন, সোমনাথ লাহিড়ী, নৃপেন চক্রবর্তী, ভবানী সেন, পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী। ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের আগে বোম্বাইতে কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক বসে। সেই বৈঠকে বাংলার প্রতিনিধিরা পার্টির নীতি পরিবর্তনের জন্য জোরদার দাবী তোলেন। বি টি রণদিভে বাংলার প্রতিনিধিদের দাবীর প্রতি সমর্থন জানান। কিন্তু পি সি যোশী ও পি সুন্দরাইয়া পার্টির নীতি পরিবর্তনে অস্বীকার করেন। কম্যুনিষ্ট পার্টির মধ্যে দুই বিপরীত লাইনের লড়াই সুরু হয়। কলকাতায় মহম্মদ আলি পার্কে দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেস যখন অনুষ্ঠিত হয়, তখন পরিস্থিতি এমন ছিল যে, পার্টি কংগ্রেস ব্যবস্থাপনায় 'রেডগার্ড'-এর পত্তন করতে হয়। এই রেডগার্ড-এর প্রধান ছিলেন গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিং এবং ডাঃ নারায়ণ রায়। পার্টি কংগ্রেসে বি টি রণদিভে একটি দলিল পেশ করলেন। সেই দলিলে শোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ডাক দেওয়া হল এবং বর্তমান পার্টি লাইন শোধনবাদী লাইনে পরিচালিত হচ্ছে—এই তথ্য তুলে ধরা হল। দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসে পি সি যোশীকে সরিয়ে বি টি রণদিভে দলের সাধারণ সম্পাদক হলেন। এস এ ডাঙ্গে পলিটব্যুরোতে নির্বাচিতই হতে পারলেন না। মুজফ্ফর আহমেদ কেন্দ্রীয় কমিটিতে নির্বাচিত হলেন। কম্যুনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হবার পর রণদিভে যে লাইনে পার্টিকে পরিচালিত করলেন তার পরিণতিতে রাজ্যব্যাপী কৃষক শ্রমিক আন্দোলন মারমুখী হয়ে উঠল। সরকার এই জঙ্গী এবং মারমুখী নীতিকেই সশস্ত্র সংগ্রামের দ্বারা ক্ষমতা দখলের চক্রান্ত বলে কম্যুনিষ্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করল।

পি সি যোশীর নীতির বিরুদ্ধে রণদিভে নীতির জয় এবং তার পরিণতিতে

কম্যুনিষ্ট পার্টির পথের লড়াইয়ে নামার মূলে ছিল পি সি যোশীর নীতির প্রতি অনাস্থা। কম্যুনিষ্ট পার্টি কর্তৃক যোশী-নীতির মূল্যায়ন হল—যোশীর সদ্যপ্রাপ্ত স্বাধীনতাকে সমর্থন, নেহরুর মধ্যে তাঁর প্রগতিশীলতার আবিষ্কার এবং নেহরু-স্তুতি দলকে সংস্কারবাদী পথে নিয়ে গিয়েছে। মার্কসবাদ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। রণদিভের দলিল পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত হবার পর ওলট-পালট শুধু পার্টি লাইনেরই হল না, নেতৃত্বেরও হল। সরকারের প্রচণ্ড দমননীতি এবং অনেক কম্যুনিষ্ট নেতার গ্রেপ্তার পার্টি নেতৃত্বের ওলট-পালটে সহায়ক হল।

১৯৪৮ সালের ২৬শে মার্চ রেডিও-র প্রভাতী ঘোষণায় বলা হল কম্যুনিষ্ট পার্টি, পার্টির কমিউন, স্বাধীনতা পত্রিকা, রেডগার্ড অন্তর্ঘাতমূলক কাজে লিপ্ত। তাই এই সব সংগঠনগুলিকে বে-আইনী ঘোষণা করা হল। পুলিশ গ্রেপ্তার করল মুজফ্ফর আহমেদ, আব্দুল মোমিন, জ্যোতি বসু, বিশ্বনাথ মুখার্জী, অম্বিকা চক্রবর্তী প্রমুখকে। পুলিশের বেড়াজাল এড়িয়ে আত্মগোপন করলেন রণেন সেন, ভবানী সেন, সোমনাথ লাহিড়ী, ভূপেশ গুপ্ত, গণেশ ঘোষ, মহম্মদ ইসমাইল, মনোরঞ্জন রায়, সরোজ মুখোপাধ্যায় এবং প্রমোদ দাশগুপ্ত।

পুলিশ ৮নং ডেকার্স লেনে মাঝরাত্রিতে হানা দিল এবং সকলকেই গ্রেপ্তার করল। প্রমোদ দাশগুপ্ত ডেকার্স লেনের বাড়িতেই থাকতেন। তাঁর বিরুদ্ধেও গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ছিল। ডেকার্স লেনে পুলিশী হানার সময় প্রমোদ দাশগুপ্ত লুঙ্গি পরে গেঞ্জি গায়ে প্রেসের কর্মীদের সঙ্গে তাঁদের কাজ তদারক করছিলেন। তল্লাশী শেষে পুলিশ হাঁক দিল: 'প্রমোদ দাশগুপ্ত কে?' পুলিশের ধারণা ছিল মাঝরাত্রিতে হানা দিয়ে তারা সকলকেই ধরে ফেলেছে এবং ধৃতদের মধ্যে প্রমোদ দাশগুপ্তও আছেন। শেষ পর্যন্ত পুলিশ দেখল, তাদের তালিকা মতো ৪৯ জনকে তারা পেয়েছে। একজনকে পায়নি। প্রমোদ দাশগুপ্তকে না পেয়ে পুলিশ অফিসাররা বেশ হতাশ হয়ে পড়ে এবং কিছুটা ক্ষিপ্তও হয়। সকলকে হলঘরে লাইন করে দাঁড় করিয়ে রেখে পুলিশ বাড়ির একতলা, দোতলা, তিনতলা সব আঁতিপাতি করে খুঁজলো। কোথায়ও পাওয়া গেল না প্রমোদ দাশগুপ্তকে। পুলিশ এক সময় আবিষ্কার করল পায়খানার দরজা ভেজানো। দরজা খুলল। ভেতরে কেউ নেই। শুধু গরাদবিহীন হয়ে জানলাটি খোলা রয়েছে। লুঙ্গি পরে বিড়ি মুখে প্রমোদ দাশগুপ্ত উধাও হয়ে গেছেন। পুলিশ ঘণ্টা দেড়েক ধরে বাড়িটা তল্লাসী করেছে। ততক্ষণে তিনি হয়ত কলকাতার আর এক প্রান্তে পৌঁছে গেছেন।

আত্মগোপন করলেন প্রমোদ দাশগুপ্ত। আর তিনি প্রমোদ দাশগুপ্ত নন। তিনি হলেন হরিনাথ। আরম্ভ হল প্রমোদ দাশগুপ্তের আর এক জীবন। এ জীবন হরিনাথের জীবন।

এই সময়ের কথা বলতে গিয়ে সরোজ মুখোপাধ্যায় বলেছেন, "চরম বামপন্থী হটকারিতার যুগে নির্বাচিত প্রাদেশিক কমিটি ভেঙ্গে দিয়ে নৃপেন চক্রবর্তী, ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত, মহম্মদ ইসমাইল্ প্রমুখ সাতজনকে নিয়ে মনোনীত প্রাদেশিক কমিটি হল। আমরা সবাই গোপন কেন্দ্রে চলে গেছি। কাকাবাবুসহ সাত-শতাধিক কর্মী বিভিন্ন জেলে বিনা বিচারে বন্দী। প্রমোদবাবু হরিনাথ নামে কমরেড আব্দুল হালিমের সঙ্গে কিয়ার্স লেনের এক গোপন কেন্দ্রে। গোলামকে (অরুণ রায়) নিয়ে আমরা (জ্যোতি বসু, নিরঞ্জন সেন) এঁদের সঙ্গে প্রায়ই দেখা করতাম। আলোচনার সময় রণেন সেনও থাকতেন।"

সরোজ মুখোপাধ্যায়, জ্যোতি বসু থাকতেন মহাজাতি সদনের পেছনে একটা জায়গায়। সেখান থেকে একদিন যখন কিয়ার্স লেনের দিকে যাচ্ছিলেন তখন পুলিশের হাতে জ্যোতিবাবু, নিরঞ্জন সেন ধরা পড়ে যান। কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে এসে বি টি রণদিভে শুধু যে পশ্চিমবাংলার প্রাদেশিক কমিটি ভেঙে দিয়ে অ্যাডহক কমিটি গঠন করলেন তাই নয়, পার্টিকে পরিচালিত করলেন নতুন পথে, যে পথকে সরোজ মুখোপাধ্যায় হটকারী পথ বলেছেন। পার্টির মধ্যে মতাদর্শগত বিরোধ অনেক আগে থেকেই সুরু হয়েছিল। সেই বিরোধের মূল প্রশ্ন ছিল পার্টি চলবে কোন পথে? 'রাশিয়ান ওয়ে' না 'চায়না ওয়ে'? একদলের বক্তব্য হ'ল: 'বুর্জোয়াবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব আমাদের পথ'; অপর দলের বক্তব্য হল: 'বুর্জোয়াবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অবস্থা এখনও আসেনি; আমাদের লড়তে হবে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে এবং প্রয়োজনে জাতীয় বুর্জোয়াদের সাহায্য ও সহযোগিতা গ্রহণ করতে হ'বে।' যদিও দলেব মধ্যে দুই মতের লড়াইয়ের এটাই একমাত্র কথা নয়, আরও অনেক তাৎক্ষণিক কারণ ছিল। কিন্তু এই লড়াইয়ে সাময়িকভাবে হলেও 'চায়না ওয়ে'-র পথিকরাই জয়ী হলেন এবং 'চায়না ওয়ে'তেই সংগ্রামের ডাক দিলেন। অর্থাৎ এই সংগ্রামের মূলশক্তি হল কৃষক এবং মূলকেন্দ্র হল গ্রাম। এই আদলেই সংগ্রাম সুরু হল। যে সংগ্রামে সৃষ্টি হল কাকদ্বীপ-তেলেঙ্গনার। যে সংগ্রামের শিবির গড়ে উঠেছিল গ্রামে গ্রামে। যে সংগ্রামে সরকার আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল ক্ষমতা দখলের লড়াই শুরু হয়েছে বলে। সেই লড়াই প্রতিরোধে

কম্যুনিষ্ট পার্টিকে এবং তার শাখা সংগঠনগুলিকে বে-আইনী ঘোষণা করল। পার্টি বে-আইনী ঘোষিত হবার পর ধরা পড়লেন দুই মত ও পথের নেতারাই। 'রাশিয়ান ওয়ে'-র সমর্থকরা আত্মগোপন করে দলের হটকারী লাইনের বিরুদ্ধে লড়াই সুরু করলেন। দ্বিমুখী লড়াই। যেমন সরকারের বিরুদ্ধে, তেমনই দলের আভ্যন্তরীণ লড়াইয়ে হটকারী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে। আরও বেশী তৎপর ছিলেন 'চায়না ওয়ে'-র নেতারা। তাঁরা শহরে এবং গ্রামে ছড়িয়ে পড়লেন। শহরে এই নেতাদের উদ্যোগ ছিল ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে শ্রমিক শ্রেণীকে লড়াইতে নামানো। গ্রামে ছিল ফসলভাগের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কৃষকদের সংঘর্ষের পথে নিয়ে আসা। এই ফসল ভাগের আন্দোলনই 'তেভাগা আন্দোলন' নামে খ্যাত। 'চায়না ওয়ে'-র নেতারা তাঁদের দলের ভিন্নপথের নেতাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়েও যে পিছু পা ছিলেন না সে কথা উল্লেখ করলে সত্যের অপলাপ হবে। হটকারী লাইনের নেতা ও তাদের অনুগামীদের কাছে বিরুদ্ধ লাইনের নেতা ও কর্মীরা নিগৃহীত হয়েছেন।

ভারতবর্ষে পরশাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সুরু হয়েছিল প্রায় সমান্তরালে। পর-শাসন অর্থাৎ বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ধাপে ধাপে পরিবর্তিত হয়েছে এবং একই পরিবর্তন ঘটেছে শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে। পরশাসনের বিরুদ্ধে অর্থাৎ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে চিহ্নিত শত্রু ছিল ইংরেজ, ডাচ, দিনেমার, পর্তুগীজ আর দেশীয় রাজামহারাজারা। শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে চিহ্নিত শত্রু ছিল জমিদার, জোতদার আর মহাজন। বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে অগ্রণী ভূমিকা নেন দেশের আলোকপ্রাপ্ত শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরা। তাঁদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র যুবরা। শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেতৃত্ব দেন গ্রামের কৃষক, আধিয়ার, ক্ষেতমজুর। এই সংগ্রাম যখন গতিবেগ পেয়েছে তখন বুদ্ধিজীবী এবং যুব-ছাত্ররা কৃষকদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

কৃষিপ্রধান দেশ ভারতবর্ষ। শতকরা ৮০ জন মানুষই গ্রামে বাস করে। বিদেশী শাসনের প্রতিভূ হিসাবে গ্রামের শোষকরা ছিল ইংরেজেরই অনুগ্রহপুষ্ট এবং কৃপাধন্য। ক্ষেত্র বিশেষে বিদেশী শাসকদের অত্যাচারকেও গ্রামীন শোষকদের অত্যাচার হার মানিয়েছিল। বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে বুদ্ধিজীবীদের পাশে যেমন কৃষক, শ্রমিক এসে কাঁধ মেলায় স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য, গ্রামীন শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধেও কৃষক সংগ্রামের পাশে এসে দাঁড়ায় রাজনীতি-সচেতন বুদ্ধিজীবীরা। বাংলার চল্লিশের দশক ছিল এমনই এক মেলবন্ধনের কাল।

কুড়ি

১৯৪২ থেকে ১৯৪৭ সাল ছিল ইংরেজশাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে উত্তাল। বিয়াল্লিশ-এ 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন ভারতের অভ্যন্তরে যে গণজাগরণের সৃষ্টি করে, ভারতের বাইরে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর আজাদ হিন্দ্ ফৌজ সেই জাগরণে নতুন গতিবেগ এনে দেয়। আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ভারতে প্রবেশ করে মুক্তি আন্দোলনের এক নতুন কালপর্বে। ১৯৪৬ সালে ভারত যেন এক বারুদের স্তূপ। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের মুক্তি আন্দোলন, রসিদ আলি দিবস, নৌ-বিদ্রোহ, হরতাল, ধর্মঘট—সব মিলিয়ে ভারতবর্ষ উত্তাল। ১৯শে জুলাই তারিখে ডাক ও তার বিভাগের ধর্মঘট ভারতের গণ আন্দোলনের ক্ষেত্রে নতুন গতির সঞ্চার করল। এই সময় এই ধর্মঘটকে উপলক্ষ করে ইংরেজ সরকারের অতি বিশ্বস্ত এক মুখপাত্র লিখেছিল "ধর্মঘটের ঢেউ বহুদূর ছড়িয়ে গেছে। তাঁর মধ্যে এসেছে কলকারখানা, ওয়ার্কসপ, প্রেস, অফিস, ব্যাঙ্ক, স্কুল, ওয়াটার ওয়ার্কস, পাওয়ার হাউস, রেলওয়ে, বাস, এমন কি সরকারী বিভাগগুলি পর্যন্ত। এর চাইতেও বড় কথা এই যে, এটা গ্রামাঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়তে সুরু করেছে। জীবিত বর্তমান প্রজন্মের স্মৃতিতে এই সর্বপ্রথম শোনা যাচ্ছে যে কৃষি মজুররা তাদের দাবী না মেনে নিলে জমিদারদের জন্য কাজ করতে অস্বীকার করছে।" (ইস্টার্ণ ইকনমিস্ট, ২৬শে জুলাই)।

হ্যাঁ। সঠিকভাবেই সংবাদপত্রের রিপোর্ট-এ ধরা পড়েছিল, কৃষিমজুররা তাদের দাবী মেনে না নিলে জমিদারের জন্য কাজ করতে অস্বীকার করছে। পশ্চিম বাংলার কৃষকদের সঙ্গে শহরের আন্দোলনের যোগসূত্র হিসাবে কলকাতায় বেশ কয়েকটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যদিও এই সম্মেলনগুলি ছিল মূলত দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরের পরবর্তী অবস্থায় কৃষকদের পুনর্বাসনের প্রশ্নে। বাংলায় কৃষকদের আন্দোলন ও সংগঠনের পুরোভাগে ছিল কৃষক সভা। অবশ্য কৃষক সভা এই পরিস্থিতি সম্পর্কে খুব সচেতন ছিল বলে মনে হয় না। এই সম্পর্কে আবদুল্লা রসুল তার 'কৃষক সভার ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন :

"এই সকল ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতার 'আই-এন-এ' দিবস (নভেম্বর ১৯৪৫) ও রসিদ আলি দিবস (ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৬) উপলক্ষে বিপুল কেন্দ্রীভূত গণতান্ত্রিক শক্তি উত্তাল অভিযানের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল। তার

পরই বোম্বাইয়ে নৌ-বিদ্রোহ ও তার পেছনের ব্যাপক জনসমর্থন একেবারে বৃটিশ শক্তিকে মূল ধরে টান দিয়েছিল। এমন কি কংগ্রেস ও লীগের নেতৃত্বকে পর্যন্ত হতভম্ব ও আতঙ্কিত করে তুলেছিল।

"কিন্তু পরিস্থিতির যখন এই বিস্ফোরণের অবস্থা তখন প্রাদেশিক কৃষক সভার নেতৃত্ব বুঝতে ভুল করেছিলেন। তাঁরা ঠিক মতো ধরতে পারেন নি, এর সংগ্রামী গুরুত্ব কতখানি। এই ব্যর্থতা প্রকাশ পেয়েছিল ২১শে থেকে ২৪শে মে খুলনা জেলার মৌভোগে তার নবম সম্মেলনের অধিবেশনে। এই সম্মেলন কৃষকদের নিকট কোনরকম সংগ্রামের আহ্বান ঘোষণা করেনি।"

কিন্তু আগেই নালিতাবাড়ী সম্মেলন (১৯৪৩) ভাগচাষী আন্দোলনের কর্মসূচীতে বলেছিল, উৎপন্ন ফসলের তিনভাগের একভাগ মাত্র মালিককে দেওয়া হবে। ১৯৪০ সালে ভূমিরাজস্ব কমিশন সুপারিশ করেছিল, বর্গাদারদের প্রজা হিসাবে গণ্য করা হোক এবং জোতদার ফসলের অর্ধেকের পরিবর্তে এক-তৃতীয়াংশ পাবে। কিন্তু নালিতাবাড়ী সম্মেলন চলাকালেই দেশ দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে। এই দুর্ভিক্ষে রাজ্যের প্রায় ৫০ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারায়। এদের বেশীর ভাগই হল কৃষক ও ক্ষেতমজুর। দুর্ভিক্ষ কবলিত অঞ্চলে কৃষকরা প্রায় দশ কোটি টাকা মূল্যের চাষের জমি জোতদারদের কাছে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়। রাজ্যের কৃষক জনসমষ্টির পাঁচ শতাংশ তাদের পুরো জমি বিক্রি করে ভূমিহীন কৃষকে পরিণত হয়। এগারো শতাংশ কৃষক তাদের জমি আংশিক বিক্রি করে দেয়। বাংলার মন্বন্তরের পরে একদিকে লক্ষ লক্ষ চাষী জমিহারা হয়, অপর দিকে, ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৬ সালের মধ্যে রাজ্যের জোতদার এবং মজুতদাররা আরও বেশী জমির মালিক, আরও বেশী ধনীতে পরিণত হয়।

১৯৪৬ সালে রাজ্যের জোতদার এবং জমিদাররা ব্যাপকভাবে কৃষকদের জমি থেকে উচ্ছেদ সুরু করে। কৃষক সভাও প্রতিরোধ আন্দোলনে নামে। এই বছর নভেম্বর মাসে কৃষকসভা তেভাগা আন্দোলনের ডাক দেয়। মৌভোগ ও পাঁজিয়া সম্মেলনের আহ্বান দীর্ঘদিন পরে রূপায়িত হয়। কমবেশী ১৯টি জেলায় এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশও ব্যাপকভাবে আন্দোলন দমনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। জেলায় জেলায় গুলি চলে। নির্বিচারে সংঘটিত হয় লুঠ, গৃহদাহ, নারীধর্ষণ ও গ্রেপ্তার। গুলি চলল জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর জেলার চিরিরবন্দর, ঠুমোনিয়া, হাপুরে। রংপুর মৈমনসিংহ সহ অনেক জেলায় অনেক স্থানে। দিনাজপুর জেলার

পুলিশের গুলিতে নিহত হল সত্তর জন কৃষক। গ্রেপ্তার হল দেড়হাজার। বাংলার প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দী সাহেব ১৯৪৭ সালে ২৮শে ফেব্রুয়ারী বিধানসভায় প্রদত্ত এক বিবৃতিতে স্বীকার করলেন যে একমাত্র খাঁপুর গ্রামেই একশো রাউণ্ড গুলি চালিয়ে কুড়িজনকে হত্যা করা হয়েছে। খাঁপুর গুলি চালনার ঘটনা সারাদেশে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। তেভাগা আন্দোলন তীব্র গতিবেগ সঞ্চারিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে জেলায় জেলায়। সংঘর্ষ সুরু হয় কৃষকের সঙ্গে জোতদারের, কৃষকের সঙ্গে পুলিশের।

১৯৪৬ সাল। সাম্প্রদায়িকতার হলাহলে জর্জরিত বাংলা। কিন্তু তেভাগা আন্দোলনের প্রভাব যে সব জেলাতে পড়েছিল সেখানে কোন দাঙ্গা হয়নি। দাঙ্গা হয়েছে সেই সব জেলাতে যেখানে কৃষক আন্দোলনের কোন প্রভাব ছিল না। এক অসাধারণ ধর্মনিরপেক্ষ আন্দোলন হল তেভাগার লড়াই। তেভাগার আন্দোলনই একমাত্র আন্দোলন যে আন্দোলনে শ্রেণীভিত্তিক দাবীতে বিভিন্ন সম্প্রদায় ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। দিনাজপুর, রংপুর, জলপাইগুড়ি, ময়মনসিংহ এবং যশোহরে আন্দোলনের নেতৃত্ব দিলেন মুসলমান, নমশূদ্র, রাজবংশী, হাজং ও সাঁওতাল কৃষকরা। এই আন্দোলনে ক্ষেতমজুরদের প্রত্যক্ষভাবে কিছু পাওয়ার ছিল না। কিন্তু তারাও এসে দাঁড়ালো বর্গাদারদের পাশে। ছাত্র ও যুব আন্দোলনের নেতারাও শহর থেকে গ্রামের কৃষকদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। কৃষক মহিলাদের অংশগ্রহণ এই তেভাগা আন্দোলনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ভারতের কোন আন্দোলনে এত মহিলা শহীদ হয়নি।

কৃষকদের মধ্যে এই তেভাগার আন্দোলন এমন উন্মাদনার সৃষ্টি করেছিল যে তেভাগা ছাড়া তাদের জীবনে আর কোন কিছুই কাম্য ছিল না। খাঁপুরে পুলিশের গুলিতে আহত কৃষকদের বালুরঘাট হাসপাতালে নিয়ে আসা হল। একজন মুমূর্ষু কৃষক মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছিল। সেই অবস্থায় ডাক্তারবাবু সেই মৃত্যুপথযাত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন: বাড়ির লোকদের দেখতে চায় কি না; একটু জল খেতে চায় কি না। মৃত্যুপথযাত্রী আধিয়ার কৃষক সেই মুহূর্তে কোন কিছুই চায়নি। ডাক্তারবাবুর সব প্রশ্নের উত্তরে ক্ষীণ কণ্ঠে জীবনের শেষ কথা সে উচ্চারণ করে গেল: 'তেভাগা চাই।'

এই তেভাগা আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন এবং কম্যুনিষ্ট পার্টির গড়ে ওঠার আন্দোলন বাংলাদেশে অভিন্ন। কম্যুনিষ্ট পার্টির রাজনীতি তেভাগার

আন্দোলনকে সংগ্রামী রূপ দিয়ে স্বাধীনতা-পূর্ব এবং স্বাধীনতা-উত্তর রাজ্য সরকারের বুকে কাঁপুনি ধরিয়ে দিয়েছিল। চরকার রাজনীতি শেষ হয়ে যখন ব্যালটের রাজনীতি প্রসারিত হচ্ছে, তখন তেভাগা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে চমক দিল বুলেটের রাজনীতি।

এবার গ্রামে গ্রামে তেভাগা আন্দোলনের কিছু কিছু ছবি তুলে ধরা হ'ল।

একুশ

আগুনের অক্ষরে লেখা কাকদ্বীপ। সারা বাংলায় পাঁচ বছর ধরে যে তেভাগা আন্দোলন চলেছিল, চাষী ও ক্ষেতমজুরদের সেই অভূতপূর্ব সংগ্রামে জেগে উঠেছিল পূর্ববঙ্গের মৈমনসিংহ জেলার হাজং এলাকা থেকে দক্ষিণ বাংলার কাকদ্বীপ। মৈমনসিংহ, যশোহর, খুলনা, দিনাজপুর, রংপুর, হুগলী, জলপাইগুড়ি, মালদহ এবং ২৪ পরগণার কৃষকদের রক্তস্নাত সংগ্রাম বিশ্বের যে কোন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে তুলনীয়। বিশ্বের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় অধ্যায় হিসাবে যুক্ত থাকার যোগ্য। বাংলার কৃষকরা দেশী বিদেশী বুর্জোয়া জমিদার গোষ্ঠীর ঠ্যাঙ্গারে বাহিনী এবং সরকারের পূর্ণ সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে যে ভাবে সংগ্রাম করে প্রাণ দিয়েছে, সেই সাহস, বীরত্ব এবং আত্মত্যাগে উজ্জ্বল এই মৃত্যুহীন মানুষেরা পৃথিবীর যে কোন দেশের গণসংগ্রামের মহান বীরদের সমমর্যাদা লাভের যোগ্য। এই সংগ্রামের শিক্ষা ভবিষ্যত সংগ্রামের পথনির্দেশ হবে।

এই সংগ্রামে স্ত্রী-মা-বোনেরাও কেউ পিছিয়ে থাকেনি। তারাও তাদের বীর স্বামী, সন্তান ও ভাইদের পাশে দাঁড়িয়ে অকাতরে প্রাণ দিয়েছে।

তেভাগা আন্দোলনের মাধ্যমে কাকদ্বীপ তথা দক্ষিণ বাংলার কৃষক সংগ্রাম সুরু হয় ১৯৪৬ সালে। পাঁচবছর এই সংগ্রাম চলেছিল। কাকদ্বীপের লয়ালগড় বা লালগড় হয়ে উঠেছিল প্রধান রণক্ষেত্র। চন্দনপিঁড়ির চাষী-মা অহল্যা, চাষীবীর অশ্বিনী দাস, গণেশ ভূঁইয়া, নীলকণ্ঠ, সুধীর, সুরেন, নগেন দলুই, মনি ধাড়া এবং চাষী-বোন সরোজিনী, বাতাসী, উত্তমী প্রভৃতির নির্ভীক আত্মদান অমর করে রেখেছে কাকদ্বীপের কৃষক সংগ্রামের ইতিহাস। অমর হয়েছে বুধাখালি,

চন্দনপিঁড়ি, ভাণ্ডর, সোনারপুর। বঙ্গোপসাগরের মুখে কয়েকটি দ্বীপের সমষ্টি কাকদ্বীপ। তখন যোগাযোগের একমাত্র বাহন ছিল নৌকা। এখানকার বিস্তৃত একটি অঞ্চল এখনও সংরক্ষিত বনভূমি। বন্য শুয়োর, বাঘ, হরিণ আর নানাধরনের পাখিদের বাসভূমি। কলকাতা থেকে দূরত্ব যদিও পঞ্চাশ-ষাট মাইলের বেশী নয়। কিন্তু সরাসরি যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকায় ত্রিশের দশকেও এখানে মধ্যযুগীয় সমাজ-ব্যবস্থা চালু ছিল।

কলকাতা থেকে ডায়মণ্ড হারবার বা লক্ষ্মীকান্তপুর। সেখান থেকে নৌকায় বা পায়ে হেঁটে পঁচিশ-ত্রিশ মাইল পথ অতিক্রম করে কাকদ্বীপ। কাকদ্বীপের শেষ প্রান্তে, দক্ষিণে ফ্রেজারগঞ্জ ও পুর্বে বুড়োবুড়িতট বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। এই পঁচিশ-ত্রিশ মাইল পথ অতিক্রম করতে কয়েকবারই কর্দমাক্ত নদী পার হতে হত। ভাঁটার সময় পায়ে হেঁটে নদী পার হতে গিয়ে অনেকেই কুমীরের খোরাক হয়েছে। খুনে ও ডাকাতরা এখানে এসে নিরাপদে গা ঢাকা দিত। একমাত্র সহায়-সম্বলহীন লোক ছাড়া বসবাসের জন্য এই এলাকায় আসতে কেউ রাজী হত না।

জনবসতি করার উদ্দেশ্যে ইংরেজ সরকার এখানকার লাটদারদের মধ্যে নামমাত্র খাজনায় বড় বড় খণ্ডে ভাগ করে জমি বণ্টন করে দেয়। লাটদার নাম নিয়ে বৃটিশ সরকারের সহায়তায় ক্রমশ জেঁকে বসল এক শোষক গোষ্ঠী। মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণার হাজার হাজার নিঃসহায় নিঃসম্বল চাষী-ক্ষেতমজুরকে জমিদাররা ইংরেজ সরকারের প্ররোচনায় জমি থেকে উচ্ছেদ করল। লাটদারদের দ্বারা প্রলুব্ধ হয়ে তারা ছুটে এল সুন্দরবনে। লাটদারদের কাছ থেকে চড়া সুদে ঋণ নিয়ে বন্য, হিংস্র জন্তুর সঙ্গে লড়াই করে শত শত প্রাণের বিনিময়ে তারা সুন্দরবনের মাটিকে করে তুলল চাষোপযোগী, শস্যশ্যামল। সুন্দর জমিতে ফলল সোনার ফসল। কিন্তু সেই ফসল পুরোপুরি চাষীর ঘরে উঠলনা। লাটদাররা তাদের স্বরূপ ধারণ করল। সমস্ত প্রতিশ্রুতি জলাঞ্জলি দিয়ে চাষীকে জমির স্বত্ব তো দিলই না, তাদের বাস্তু-ভিটেকেও লাটের খাস বলে ঘোষণা করল। মিথ্যা মামলায় ফাঁসল নিরপরাধ চাষী। অন্যের জমিতে দিন-মজুরী করে জীবিকা নির্বাহ করতে লাগল। ক্ষেতমজুর হয়ে গেল তারা।

এই লাটদার বা জোতদাররা এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা ছিলনা। তারা স্বল্প বেতনে নায়েব, গোমস্তা নিয়োগ করত। এই নায়েব গোমস্তারা আবার ভাগচাষী

নিয়োগ করে ধান বা খাজনা আদায়ের জালে আটকে কৃষকদের সর্বস্ব শোষণ করত। এরাই ছিল এই অঞ্চলের শোষক। গ্রামের ঝগড়া, রাহাজানি, খুন ইত্যাদি যে কোন ব্যাপারে এদের রায়ই ছিল শেষ কথা। ভাগচাষীরা তা মানতে বাধ্য থাকত। শোষণ ও নির্যাতনে এদের জুড়ি ছিলনা। নারীর সতীত্ব নিয়ে ছিনিমিনি খেলা এদের নিত্যদিনের ব্যাপার ছিল। মেনে না নিলে গৃহস্থকে লাট ত্যাগ করতে হত। ভাগে এক বিঘা জমি পেতে হলে ভাগচাষীকে সেলামী দিতে হত ১০ থেকে ৫০ টাকা। এমন কি স্ত্রী ও যুবতী মেয়ের ইজ্জৎ পর্যন্ত। ক্রমে ক্রমে সুন্দরবনের তথা কাকদ্বীপের অধিকাংশ মানুষই হারালো তাদের জমি, ভিটেমাটি। বিক্রি করল স্ত্রী কন্যাকে। হারালো সংসার। হারালো মনুষ্যত্ব। নিজেদের সম্মান বাঁচাতে অনেক মা বোন হল আত্মঘাতিনী।

কাকদ্বীপের বিরাট বনাঞ্চল চাষোপযোগী হবার পর সস্তায় জমির আশায় দলে দলে লোক আসতে সুরু করল। এদের শতকরা ৮০ জনই মেদিনীপুর থেকে আগত। কাকদ্বীপের অধিবাসীদের জমির চাষবাসের জন্য বিভিন্ন স্থান থেকে জোগাড় করা হয়েছিল। সামাজিক বন্ধন যে টুকু গড়ে উঠেছিল তা এই ভাবেই। বংশানুক্রমিক কোন যোগসূত্র ছিল না। শ্রেণী সংগ্রামের সময় শোষিত শ্রেণীর বন্ধনই তাদের একত্রিত করতে বিশেষ সাহায্য করেছিল।

জোতদার লাটদার তথা ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর এই ধরনের অমানুষিক অত্যাচার কোন সুস্থ মানুষের পক্ষেই বেশীদিন সহ্য করার কথা নয়। কাকদ্বীপের মানুষও সহ্য করলনা। তারাও অবশেষে মরিয়া হয়ে উঠল। বহু লাটদার, জোতদার, নায়েব, ম্যানেজার আর বকশীকে খুন করে অত্যাচারের প্রতিশোধ নিল। নিজেদের লোককে চাষীদের হাতে বেপরোয়া খুন হতে দেখে জোতদাররা ভোল পালটালো। কিছু চাষীকে জমি ও সুযোগ-সুবিধা দেওয়া সুরু করল। এই ভাবেই জন্ম নিল আর একটা পরগাছা দালালের দল। চকদার, গাঁতিদার, জোতদার, মহাজন আর ধনী চাষী। লাটদারদের বিশ্বস্ত ভৃত্য। এদের সাহায্যে লাটদাররা কাকদ্বীপের হাজার হাজার মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে তাদের দুর্বল করে রাখল।

১৯৪৬ সালে তেভাগা আন্দোলনের কয়েক বছর আগে কাকদ্বীপ ও সাগরের উপর দিয়ে এক প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় বয়ে যায়। সেই সঙ্গে সুরু হয় ভয়ঙ্কর বন্যা। ভেসে যায় চন্দনপিঁড়ি, নামখানগঞ্জ, বুধাখালি প্রভৃতি অঞ্চল। বাড়ি ঘর, গরু-বাছুর

ধ্বংস হয়। বহুলোকের প্রাণহানি ঘটে। ১৯৪৩ সালের মন্বন্তরের পর এই বন্যা। চাষীরা সর্বস্বান্ত। বন্যার পর কাকদ্বীপের মাটিতে আবার দেখা দিল দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া। বাঁচতে হলে টাকা চাই। শকুনের মতো মহাজনরা এগিয়ে এল কাকদ্বীপে চাষীদের ঋণ দেবার জন্য। টিপসই দিয়ে যে চাষী একবার তাদের কাছ থেকে ঋণ নিল, মহাজনের কাছ থেকে কোনদিনও তারা অব্যাহতি পায়নি। এক মন খেসারীর বদলে পাঁচ মন ধানের দলিল লিখে দিতে হল। শুধু মাত্র তিনখানা কাপড়ের বিনিময়ে পাঁচ থেকে সাত বিঘা জমির কবালা। শেষ পর্যন্ত এই কবালারও কোন মূল্য রইল না। দু এক মন ধানের আশায় অনেক চাষী এক বা দেড় বছরের জন্য ক্রীতদাস হল। এক মন ধানের বিনিময়ে অনেক দুর্ভাগিনী মা রাত্রির পর রাত্রি দেহের বিনিময়ে সন্তানদের জীবন রক্ষার চেষ্টা করল। শত শত বিঘা জমির মালিক লাটদার শয়তানরা কাকদ্বীপের চাষীর রক্ত নিংড়ে গড়ে তুলল তাদের জন্য এক রামরাজ্য।

এই সময়েই স্থানীয় বুধাখালির যতীন মাইতির সাহায্যে রিলিফ বণ্টন ও কৃষক সমিতি গঠন করা হয় এবং সেই সঙ্গে কাকদ্বীপে তেভাগা আন্দোলনের প্রথম বীজ উপ্ত হয়।

১৯৪৬ সাল। দুর্ভিক্ষের সময়ে কাকদ্বীপের চাষীদের 'রিলিফ' দিতে এসে লাল ঝাণ্ডা তথা কম্যুনিষ্ট পার্টির কর্মীরা তাদের বোঝাতে লাগলেন যে এই ভয়ঙ্কর শোষণ, উৎপীড়ন আর দুর্ভিক্ষের কবল থেকে বাঁচতে হলে চাষীদের শোষক ও শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে লড়তে হবে। কাকদ্বীপের সমস্ত চাষী মন প্রাণ দিয়ে লাল ঝাণ্ডার এই ডাক শুনল। সাড়া দিল। সমস্ত চাষী কৃষক-সমিতির সভ্য হয়ে দলবদ্ধ সংগ্রামের শপথ গ্রহণ করল। মিলিত কণ্ঠে আওয়াজ উঠল: 'ফসলের তিনভাগ চাই।' ক্ষেতমজুররা দাবী তুলল তাদের মজুরী বৃদ্ধির। বাধা দিল জোতদার গোষ্ঠী। সুরু হয়ে গেল চাষীদের তেভাগার সংগ্রাম। বুধাখালি থেকে সুরু হয়ে পার্শ্ববর্তী বেবারলাট, ফটিকপুর, উকিলের লাটে ছড়িয়ে পড়ল এই সংগ্রাম।

চাষীদের মধ্যে ক্ষেতমজুররাই সব চাইতে জঙ্গী। তারাই হল এই সংগ্রামের প্রকৃত নেতা। হাজার হাজার চাষী লাঠি আর কাস্তে নিয়ে মাঠে নামল। তিন ভাগ নয়, পুরো ফসলই তাদের ঘরে তুলল।। ক্ষেতমজুরদের মজুরী বেড়ে হল দ্বিগুণ। ক্ষেতমজুর আর বর্গাচাষীর আনন্দের বজ্রনিনাদে শোষকগোষ্ঠীর বুক

কেঁপে উঠল। জোতদার আর লাটদারদের অনেকেই পালিয়ে গেল। তাদের জমিজমা দখল করে নিল চাষীরা। এইভাবেই লয়ালগড় আর বুধাখালিতে ক্ষেতমজুর আর চাষীরা তাদের কর্তৃত্ব কায়েম করল। সংগ্রাম-কমিটি ভূমিহীনদের ভূমিদান করল। ক্রমে ক্রমে ক্ষেতমজুরদের প্রায় সব সমস্যারই সমাধান হল। প্রতিবছর বর্গাদার উচ্ছেদ বন্ধ হল ভাগচাষীদের লাঠির জোরে। লয়ালগড় রূপান্তরিত হল লালগড়ে।

বাইশ

ইংরেজ তখনও ভারত ছাড়েনি। জজসাহেব আর ম্যাজিস্ট্রেটরাই তখন চাষীদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। কাকদ্বীপের লাটদার-জোতদারের দল নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ইংরাজের শরণাপন্ন হল। সংগ্রামের চেহারা দেখে শাসকরা তখন চোখে অন্ধকার দেখছিল। তাদের নির্দেশে এক বিরাট সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী মুহূর্তের মধ্যে ছেয়ে ফেলল কাকদ্বীপের বিস্তীর্ণ এলাকা। পুলিশের ক্যাম্প বসল লালগড়, চন্দনপিঁড়ি, রাজনগর, বুধাখালি এবং অন্যান্য বহুস্থানে। লালগড়ের ক্যাম্পে বসানো হ'ল বেতার প্রেরক ও গ্রাহক যন্ত্র।

গ্রামগুলির নিরীহ চাষীদের উপর পুলিশের অকথ্য অত্যাচার শুরু হল। ঘরবাড়ি ভাঙলো। টাকা-পয়সা লুঠ হ'ল। চাষীদের মূল্যবান জীবন বলি হ'ল। মেয়েরাও এই পশুদের পাশবিক অত্যাচারের হাত থেকে নিস্তার পেল না। লালগড়ের গিরীশ মণ্ডলের ছয় মাসের শিশুকে ছিনিয়ে নিয়ে পশুরা আছড়ে মেরে ফেলল। এদের নির্বিচার গুলির মুখে প্রাণ দিল ষোল জন নিরীহ চাষী। বিনা বিচারে আটক হল আরও পাঁচশো জন।

ইংরেজ সরকার মনে করেছিল বন্দুকের নলে চাষীদের এই সংগ্রাম তারা ব্যর্থ করে দেবে। কিন্তু তাদের সেই ধারণাকে ভুল প্রমাণিত করে এই বর্বরতার বিরুদ্ধে বাঘের মতো গর্জে উঠল লালগড় এবং সারা কাকদ্বীপের সমস্ত মানুষ। তারা বুঝেছিল এই পশুদের হাত থেকে মেয়েদের ইজ্জৎ, জমিজমা, ঘরবাড়ি বাঁচাতে হলে অস্ত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্র চাই। তারা বুঝেছিল, যে কোন মূল্য দিয়ে এই অত্যাচার ও অবিচারকে রুখতে হবে।

কিন্তু তার জন্য চাই সংগঠন। গ্রামে গ্রামে নারী-পুরুষ, যুব-বৃদ্ধ সবাইকে নিয়ে

তৈরি হল সংগঠন। একেবারে যুদ্ধ-সংগঠন। পুলিশের উপর নজর রাখতে তৈরি হ'ল এক অতন্দ্র প্রহরীর দল। এদের সংকেত পেলেই হাজার হাজার মেয়ে-পুরুষ পুলিশকে ঘিরে ফেলত। তাদের প্রতিহত করত। বন্দীদের ছিনিয়ে নিত। পুলিশের বন্দুকের বিরুদ্ধে দুরপাল্লার অস্ত্র চাই। তৈরি হল তীর ধনুক। গ্রামের প্রতিটি মানুষ তীর ছোঁড়া শিখে নিল। এই প্রস্তুতিপর্ব সংঘবদ্ধ সংগ্রামের পটভূমি রচনা করল।

১৯৪৮-এর নভেম্বর। ক্ষেতে সোনার ফসল। চাষীদের মনে আনন্দের দোলা। অন্যদিকে কংগ্রেস নেতা আর কংগ্রেস সরকারের দারোগার মধ্যে এই ধান নিয়েই চলছে গোপন ষড়যন্ত্র। চাষীরাও অতীত অভিজ্ঞতায় বুঝে নিয়েছে যে এই ধান তাদের ঘরে তুলতে হ'লে হয়ত বা আরও এক কঠিন সংগ্রামের মুখোমুখি হ'তে হবে। তারাও হাত গুটিয়ে বসে ছিল না।

৬ই নভেম্বর ভোরে একসঙ্গে নয়টি বোট-এ প্রায় পাঁচশো সশস্ত্র পুলিশ কাকদ্বীপে এসে নামল এবং সঙ্গে সঙ্গেই সব কটি সংগ্রাম কেন্দ্রের উপর আক্রমণ সুরু করে দিল। চাষীদের মনোবল ভাঙতে প্রথমেই তাদের কুঁড়েঘরগুলি ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিল। মেয়েদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালাল।

৩০শে ডিসেম্বর সশস্ত্র পুলিশের চোখের সামনে হাজরাঘেরির ধান পাঁচশো চাষী-যোদ্ধা তাদের নিজেদের ঘরে তুলল। সাতশো বিঘা চকের প্রতিটি ধান উঠল সংগ্রামী বীর চাষীদের ঘরে।

লালগড়ে চাষীদের লাল ঝাণ্ডা নিয়ে শোভাযাত্রার উপর অতর্কিত আক্রমণ হানল পুলিশ। চাষী ও পুলিশের তীব্র খণ্ডযুদ্ধে পুলিশদল ভূমিশয্যা নিল। চাষীরা বীরদর্পে ফিরে এল নিজেদের ঘরে। লালগড় দুর্ভেদ্য জেনে কাকদ্বীপের অন্য অঞ্চলের দিকে ধাবিত হল পুলিশ দল। এইভাবে আড়াইশো কৃষক-অধ্যুষিত পাঁচ হাজার বিঘার বিস্তীর্ণ অঞ্চল শত্রুমুক্ত হ'ল।

১০ই আগস্ট, ১৯৪৯ সাল। মেয়ে-পুরুষের সম্মিলিত এক সভায় সংগ্রাম কমিটি ঘোষণা করল: উদ্ধার করা জমি নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে নেবে। সবাই হবে জমির মালিক। সরকারের আইন-আদালত তারা মানবে না। জনগণই হবে বিচারক। তাদের জীবন ও জমি বাঁচাতে প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দেবে।

১৯৪৯ সালের ১৮ই আগস্ট রাধানগর মৌজার উপর সশস্ত্র পুলিশী আক্রমণও ব্যর্থ হ'ল সংগ্রামী লালগড়ের দেড়শো জনের রণনৈপুণ্যে। শুধু তাই নয়, জোতদার কুঞ্জ সাঁতরা ও কংগ্রেস পাণ্ডাদের আঁতাতে লালগড় পুনরাক্রমণের গভীর চক্রান্তও ব্যর্থ হল চাষী যোদ্ধাদের কর্তব্যনিষ্ঠা ও তৎপরতায়। পরদিন নদীর জলে পাওয়া গেল কুঞ্জ সাঁতরা আর তার দেহরক্ষীর মৃতদেহ। এই ঘটনায় পুলিশ আর গুণ্ডারা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। তাদের আর দ্বিতীয়বার লালগড় আক্রমণ করা হ'ল না। লালগড়ের চাষীরা তাদের আসন প্রতিষ্ঠিত করল লালগড়ে।

তেইশ

কাকদ্বীপের ছোট গ্রাম চন্দনপিঁড়ি। কিন্তু বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম ও বিপ্লবী চেতনায় এই গ্রাম কোন অংশেই ছোট নয়। ১৯৪৬ সালে তেভাগার দাবী নিয়ে কাকদ্বীপে যখন প্রথম মুক্তিসংগ্রাম সুরু হয় তখন থেকেই চন্দনপিঁড়ির শতাধিক ক্ষেতমজুর আর ভাগচাষী সুরু করে তাদের সংগ্রাম। তার পরিণতিও লাল-গড়ের মতো মুক্ত-অঞ্চল প্রতিষ্ঠার দিকে যায়। লাঠি, বল্লম আর তীর ধনুক ছুঁড়ে তারা পরেশ দাস, রাইচরণ, বসন্ত প্রভৃতি জোতদারের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিল তাদের চাষের জমি, ঘরবাড়ি ইত্যাদি। কাছারী থেকে তাদের দলিল দস্তাবেজ পুড়িয়ে দিয়ে চাষীরা কার্যত তাদের দাসত্বের বন্ধন ছিন্ন করল।

চাষীদের লাঠির ভয়ে জোতদার-মহাজনরা সাময়িকভাবে পালিয়ে গেলেও তারা যে চাষীদের ফিরে পাওয়া জমি-জমা শান্তিতে ভোগ করতে দেবে না, চাষীদের প্রিয় নেতা গজেন মালী, অশ্বিনী দাস, গণেশ ভূঁইয়া-রা তা' ভাল করেই জানতেন। তাই পরবর্তী সংগ্রামের প্রস্তুতিপর্ব হিসাবে প্রত্যেকটি চাষী, মা-ভাই-বোনদের এক একটি মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে শিক্ষিত করে তুললেন। গ্রাম-রক্ষার দায়িত্ব নিল স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী।

একদিন হঠাৎ চন্দনপিঁড়ি আক্রান্ত হল। একটি রাইফেলধারী দল দিয়ে কাকদ্বীপের দারোগা চন্দনপিঁড়ির ঘাটে নৌকা ভেড়ালো। মুহূর্তে সংকেতধ্বনি ছড়িয়ে পড়ল চন্দনপিঁড়ির আকাশে বাতাসে। চোখের নিমেষে স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী চারদিক থেকে শত্রুদের ঘিরে ফেলল। চাষীদের সংগ্রামী তৎপরতা ও

ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখে প্রমাদ গুনল প্রায় ৪৫ জন সশস্ত্র পুলিশ। ক্ষমা ভিক্ষা করে সে যাত্রা তারা প্রাণে বাঁচল। দারোগা নাকে খত দিয়ে রেহাই পেল।

কিন্তু পরদিনই আবার আক্রান্ত হল চন্দনপিঁড়ি। এবার সশস্ত্র পুলিশের সঙ্গে গুর্খা সৈন্য। কয়েক ভাগে ভাগ হয়ে তারা আক্রমণের রণকৌশল রচনা করল। স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীও তৎপরতার সঙ্গে চারদিক দিয়ে শত্রুকে ঘিরে ফেলে আক্রমণ চালাতে এগিয়ে এল। সুরু হল লড়াই।

অশ্বিনী দাস খবর পেলেন, শত্রুরা মেয়েদের উপর অত্যাচার করছে। ষোলজন স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে তিনি ঘটনাস্থলে ছুটে গেলেন। দেখলেন তাঁরই বাড়িতে ঢুকে শত্রুরা মেয়েদের অপমান করতে উদ্যত। মেয়েরা মরণপণ করে শত্রু-সৈন্যের আক্রমণ প্রতিহত করছে। শত্রুরা সংখ্যায় ছত্রিশ। তাদের সাহায্য করছে কাছারীর নায়েব এবং কংগ্রেস নেতা বক্সী, বসন্ত ও পরেশ দাস। ছত্রিশ জন সশস্ত্র পুলিশ ও গুর্খা সৈন্যের বিরুদ্ধে চোদ্দটি কৃষক মেয়ের সংগ্রাম। কারও হাতে বঁটি, কারও হাতে ঝাঁটা, কারও হাতে বা দাও। গর্ভবতী অহল্যার হাতে ঝাঁটার প্রচণ্ড এক ঘা খেয়ে পরেশ দাস পুলিশের পেছনে গিয়ে মুখ লুকালো। সরোজিনী হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে একটি গুর্খা সৈন্যের বন্দুকের নল হাতে চেপে ধরল। উর্বশী ও বাতাসী দায়ের কোপ বসিয়ে দিল পুলিশের গায়ে।

অশ্বিনী দাসের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর ষোল জনের হাতে ছিল লাঠি, বর্শা আর তীর-ধনুক। মুখে লালঝাণ্ডার জয়ধ্বনি। মনে শত্রু নিপাতের শানিত প্রতিজ্ঞা। মেয়েদের প্রায় প্রত্যেকেই তখন রক্তস্নাত। অশ্বিনী ও তার দলের লোকেরা আর স্থির থাকতে পারলনা। ঝাঁপিয়ে পড়ল শত্রুদের উপর। ঝাঁকে ঝাঁকে তীর ছুঁড়ে তাদের পর্যুদস্ত করল। বর্শার আঘাতে ধরাশায়ী করল কয়েকটি পুলিশকে। আহত হল পুলিশ আর গুর্খার দল। অশ্বিনী দাসের এই রণমূর্তিতে ভীত ও সন্ত্রস্ত হল কংগ্রেসী পাণ্ডা পরেশ ও বসন্ত। ভয় পেয়ে গেল পুলিশ আর গুর্খা সৈন্যরাও। অশ্বিনীর হাত থেকে রেহাই নেই দেখে অশ্বিনীকে গুলি করল। গুলিবিদ্ধ রক্তাক্ত অশ্বিনী দেখল বাতাসীর উপর আক্রমণে উদ্যত এক গুর্খা সৈন্য। সেই অবস্থাতেই অশ্বিনী লাঠির আঘাত হানল। গুর্খাটির মাথা ফেটে চৌচির হয়ে গেল। আর নয়। এক সঙ্গে শত্রুর কুড়িটি রাইফল গর্জে উঠল। অশ্বিনীর সমস্ত দেহ ঝাঁঝরা হয়ে গেল। একটা গুলি লাগল মাথায়। প্রাণহীন দেহ লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। সেই প্রাণহীন দেহের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল আর একটি গুর্খা সৈন্য

সঙ্গীনের ঘায়ে অশ্বিনীর বুকখানা চিরে ফেলল। অন্যদিকে উত্তমী একাই একটি রাইফেলধারী পুলিশের সঙ্গে লড়াই করে যাচ্ছিল। উত্তমীর দাও-এর আঘাতে পুলিশের হাত দ্বিখণ্ডিত। অপর এক পুলিশ উত্তমীর বুকে সঙ্গীন বসাতে যেতেই গজেন ভূঁইয়া তার সড়কির আঘাতে পুলিশটির দেহ এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দিল। অপর এক পুলিশ গজেনের বুক লক্ষ্য করে গুলি চালালো। গুলির আঘাতে গজেন মাটিতে পড়ে গেল। মরবার আগে সেই পুলিশটার টুঁটি টিপে ধরে তাকে নিয়েই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল! দারোগা দেবেন ধর পুলিশদের হুকুম দিচ্ছিল। আহত অবস্থায় উত্তমী আর বাতাসী দা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর। কিন্তু পুলিশের আঘাতে লুটিয়ে পড়ল তারা। বোন সরোজিনী ভাই অশ্বিনীর মৃতদেহটি বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। গুর্খা সৈন্যের গুলিতে সেও লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। এবার অশ্বিনীর মৃতদেহ বুকে তুলে নিল সাত আট মাসের গর্ভবতী অহল্যা। শত্রুরা তার তলপেটে গুলি করল। আর এক পশু তলপেট চিরে দিল সঙ্গীনের আঘাতে। নিস্তব্ধ অহল্যা মাটিতে পড়ে গেল, কিন্তু আবার উঠে দাঁড়াল অশ্বিনীর মৃতদেহ উদ্ধারের চেষ্টায়। কিন্তু অজস্র রক্তপাতে দুর্বল অহল্যা-মা মাটিতে শয্যা নিল।

বিধান রায়ের নেতৃত্বে পরিচালিত কংগ্রেস সরকারের পুলিশ ও মিলিটারির গুলি ও সঙ্গীনের আঘাতে প্রাণ দিল বীরমাতা অহল্যা। জন্ম-লগ্নের পূর্বেই মৃত্যু হল তার গর্ভস্থ সন্তানের। সেই অজাত সন্তানের আত্মা যেন আজ প্রতিবাদ-মুখর। সেই প্রতিবাদ ধ্বনিত আকাশে বাতাসে। শোষণ, মাতৃহত্যা শিশুহত্যার বিরুদ্ধে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পরার আহ্বান। সেই আহ্বানেই বুঝি সাড়া দিল মকশালবাড়ি থেকে সোনারপুর পর্যন্ত অজস্র অসংখ্য সংগ্রামী ভাগচাষী ও ক্ষেতমজুর। এগিয়ে এল নতুন প্রেরণায় উদ্দীপিত হয়ে। পশুশক্তির বিরুদ্ধে মরণপণ লড়াইয়ে প্রাণ দিল সরোজিনী, উত্তমা, বাতাসী আর অহল্যা-মা। প্রাণ দিল অশ্বিনী, গজেন। তবু চাষীরা হতোদ্যম হয়নি! মরিয়া হয়ে যুদ্ধ করেছে পশু-শক্তির বিরুদ্ধে। প্রায় সকলেই আহত। সেদিকে লক্ষ্য নেই কারও। শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও তারা এই ভ্রাতৃহত্যা ও মাতৃহত্যা, ভগ্নীহত্যা ও শিশুহত্যার প্রতিশোধে বদ্ধপরিকর। বীর কৃষকের রক্তে রাঙা হল অশ্বিনীর বাড়ির অঙ্গন ও ধানের ক্ষেত। স্বেচ্ছাসেবকদের কয়েকজন বিসর্জন দিল তাদের অমূল্য প্রাণ। অনেকে গুরুতর আহত হল। গুর্খা পশুরা সঙ্গীনে গেঁথে টেনে নিয়ে গেল মৃত, অর্ধমৃত দেহগুলি।

সংবাদ পৌঁছল নদীর অপর পারে লালগড়ে। নদী পার হয়ে এল একশোর মত স্বেচ্ছাসেবক, জয়ধ্বনি তুলল তারা আকাশে বাতাসে। সেই জয়ধ্বনি শুনে প্রাণের ভয়ে পালিয়ে গেল পুলিশ আর গুর্খা সৈন্য। স্বেচ্ছাসেবকরা মিলিত সিদ্ধান্ত নিল কৃষক হত্যার প্রতিশোধ তারা নেবে। ঘোষণা করল দুই কংগ্রেসী পাণ্ডা পরেশ দাস ও বসন্তের মৃত্যু দণ্ড।

পরদিন সকালেই পাঁচশো গুর্খা সৈন্য নিয়ে চন্দনপিঁড়িতে উপস্থিত হল পুলিশ কমিশনার এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। সদম্ভে ঘোষণা করল চন্দনপিঁড়িকে কামানের গোলায় উড়িয়ে দেবে। সুরু হল পুলিশের তাণ্ডব। চন্দনপিঁড়িতে ১৪৪ ধারা জারি হল। বহু তরুণ, তরুণী, বৃদ্ধ গ্রেপ্তার হলেন। গনেশ দাস প্রমুখ নেতারা আত্মগোপন করলেন।

কিন্তু বেলা দশটায় সবাইকে সচকিত করে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ হল। মৃতদেহগুলিকে বহন করে নিয়ে এল এক বিরাট শোকযাত্রার মিছিল। অহল্যা-মা আর অশ্বিনীর মৃতদেহ ঢেকে দেওয়া হয়েছে লাল কাপড়ে। সেই বিরাট শোকযাত্রার মিছিলকে আক্রমণ করার সাহস পুলিশ-মিলিটারির হলনা। জনতার ইস্পাত-কঠিন দৃঢ়তার মুখে ব্যর্থ হল ১৪৪ ধারা। সভা অনুষ্ঠিত হল। সেই সভায় মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হ'ল হত্যাকাণ্ডের নেতা পরেশ এবং বসন্তকে। কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবককে নিযুক্ত করা হল এই দণ্ড কার্যকরী করার জন্য।

কয়েকদিন পরেই নদীতে ভাসমান পরেশ ও বসন্তের মৃতদেহ দেখতে পাওয়া গেল। পাঁচশো গুর্খা সৈন্যের আগমন সম্ভাবনাকে উপেক্ষা করে এবং ১৪৪ ধারাকে দ্বিতীয়বার ভঙ্গ করে চন্দনপিঁড়ির লোক এসে ভিড় জমালো এই দুই নরপশুর কুকীর্তির চরম ও পরম পরিণতি প্রত্যক্ষ করতে।

পাঁচশো সৈন্যের বর্বর আক্রমণ সুরু হল। দ্বীপটিকে কামানের গোলায় উড়িয়ে না দিলেও তারা প্রতিটি চাষীর ঘর-সংসার ভেঙ্গে তছনছ করল। নারীধর্ষণ ও অগ্নিসংযোগের বীভৎস নজির সৃষ্টি করল। দশদিন ধরে চলল এই অত্যাচার। পুরুষহীন গ্রামে রইল শুধু মেয়েরা। তারাই রুখে দাঁড়াল এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে।

গ্রামের পুরুষদের ধরে নিয়ে যাবার পর স্বভাবতই প্রথম দিকে মেয়েরা কিছুটা দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মাত্র কয়েকদিনের জন্য। গোপনে তারা নিজেদের মধ্যে সংগঠন গড়ে তুলল। গোপন-সংকেত স্থির করল। পুলিশের

চোখ এড়িয়ে লালগড়ের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগও স্থাপন করল। লালগড় থেকে এল বস্ত্রহীনের বস্ত্র, ক্ষুধার্তের খাদ্য। এল অস্ত্রশস্ত্র পুলিশ আর গুর্খাসৈন্যের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য। মহিলা-বাহিনীর পরিচালিকা রূপে এগিয়ে এল এক মুসলমানের বৌ। স্বামী ফেরার। মেয়েদের মান-সম্মান রক্ষা করতে, লড়াইয়ের নেতৃত্ব দিতে বোরখা ছেড়ে হাতে তুলে নিল শানিত অস্ত্র।

গ্রামে শান্তি প্রচারের নামে কংগ্রেসের পোষা গুণ্ডাবাহিনী দল বেঁধে বেরোতো রাত্রিবেলা। সুযোগ পেলেই অত্যাচার করত যুবতী মেয়েদের উপর। একটি মেয়ের ইজ্জৎ রক্ষা করতে একটি মহিলা দল বঁটির আঘাতে খতম করল দুই গুণ্ডাকে। বন্ধ হল গুণ্ডাদের 'শান্তি প্রচার'। মেয়েদের সাহসে সাহসী হয়ে বৃদ্ধরাও এদের দলে যোগ দিল। এরা শপথ নিল: উত্তমী, বাতাসী, সরোজিনী অশ্বিনীর রক্তমাখা ধান অন্ততঃ একটি আঁটিও ঘরে তুলবে।

গুর্খা সৈন্য আর পুলিশ প্রহরাকে অগ্রাহ্য করে মাত্র কুড়িটি মেয়ের একটি দল একদিন সকালে মাঠে নামল। তাদের শক্ত হাতে ধরা কাস্তের ফলাগুলি সূর্যালোকে ঝলসে উঠল। গুর্খা আর পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা নিতে বাধ্য হল। প্রতিটি মেয়ের হাতে উঠল এক আঁটি করে ধান। সার্থক হল রক্তপাত আর জীবন দান। মেয়েদের জয়োল্লাস ছড়িয়ে পড়ল দিকদিগন্তে। প্রতিজ্ঞা মতো ধান কেটে তারা ঘরে তুলেছে। এবার ঘরে অনাহারে মরলেও তাদের দুঃখ নেই।

এই ঘটনায় পুলিশের বড়কর্তা আর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট দুশ্চিন্তায় পড়ল। তারা বুঝল গজেন মালী ও অন্যান্য আত্মগোপনকারী নেতাদের সাহায্যেই মেয়েদের এই দুঃসাহসিক কাজ সম্ভব হয়েছে। এই নেতাদের ধরতে না পারলে চন্দনপিঁড়ির সংগ্রামকে স্তব্ধ করা যাবে না। প্রথমে গ্রামের লোকদের উপর অত্যাচার করে নেতাদের খোঁজ পাবার চেষ্টা হ'ল। তাতে ফল না হওয়ায় তাদের জন্য গোপন জাল পাতা হল। যোগাযোগ রক্ষার জন্য নেতারা রাত্রে চলাফেরা করতেন। সেই অবস্থায় একদিন রাত্রে নদীপথে পুলিশের হাতে ধরা পড়লেন চাষীনেতা গজেন মালী। পর পর আরও কয়েকজন নেতা ধরা পড়লেন। নেতাদের ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে ঘরে পশুদের অত্যাচার শুরু হল। চন্দনপিঁড়ির সংগ্রাম স্তিমিত হয়ে এল।

শতসহস্র বীর ও বীরাঙ্গনার রক্ত ও আত্মত্যাগে উজ্জ্বল এই চন্দনপিঁড়ির

সংগ্রামের পর বহু বছর কেটে গিয়েছে। কাকদ্বীপের মানুষ নদীপথে যাবার সময় চন্দনপিঁড়ির ঘাটে নৌকা বেঁধে অশ্বিনী-ভাই আর অহল্যা-মা'র স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানায়।

চব্বিশ

বাংলাদেশের কৃষক সংগ্রামের ইতিহাসে লালগড় ও চন্দনপিঁড়ির পরই বুধাখালির স্থান। লালগড় ও চন্দনপিঁড়ির মতোই বুধাখালি একটি মৌজা। ১৯৪৭ সালের মাঝামাঝি লালগড়ের ডাক বুধাখালির ভাগচাষীদেরও চঞ্চল করে তুলেছিল। এই বছরই চাষবাসের প্রথম দিকে ছোটখাট সংগ্রাম সুরু হয়ে গিয়েছিল। ক্রমে সেই সংগ্রামের মধ্য দিয়েই ইস্পাতের মতো কঠিন হয়ে উঠল ভাগচাষীদের সাহস আর সংগ্রামের প্রতিজ্ঞা।

১৫ই ডিসেম্বর। নিজেদের জমিতে ধান কাটতে গেল বুধাখালির সব ভাগচাষী। অদূরে অপেক্ষমান আঠারোজন রাইফেলধারী পুলিশ। সঙ্গে জোতদারদের দল আর কংগ্রেস সেবাদল। হঠাৎ তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল ভাগচাষীদের উপর। ধানের বোঝা মাথায় নিয়ে ঘরে ফিরছিল দশ-এগারো বছরের একটি ছেলে। নির্মম প্রহারে তার মাথা ফাটল। মাথা-নাক-মুখ দিয়ে অঝোরে রক্ত পড়তে লাগল। এই বর্বর আক্রমণে ক্ষিপ্ত হয়ে লাঠি-দা-বল্লম প্রভৃতি অস্ত্র নিয়ে প্রায় তিন-চারশো মেয়ে পুরুষ সশস্ত্র পুলিশদের চারিদিক থেকে ঘিরে ধরল। সুরু হয়ে গেল বুধাখালির কৃষক-সংগ্রাম।

চাষী-বৌ পাখী ছেলেকে রক্ষা করতে গর্ভবতী অবস্থায় এগিয়ে এসেছিল পুলিশের সামনে। একটি পুলিশ অতর্কিতে বন্দুকের বাঁট দিয়ে আঘাত হানল পাখীর পেটে। আর্তনাদ করে রক্তাক্ত দেহ নিয়ে পেট চেপে শুয়ে পড়ল পাখী। সেখানেই তার গর্ভপাত হল।

এই দৃশ্যে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে চাষীদের মাথায় রক্ত চড়ে গেল। মরিয়া হয়ে লাঠি আর বল্লমের আঘাতে অনেককে জখম করল। নিজেরাও অক্ষত রইল না। এই ঘটনায় বুধাখালিতে আগুন জ্বলল প্রতিটি মেয়ে ও পুরুষের বুকে। সভা ডেকে শত্রুদের প্রতি চরম আঘাত হানবার পরিকল্পনা পাকা হল। গ্রামের জোয়ানদের নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন দল হল। মেয়েদের নিয়েও একটি পৃথক দল হল।

কিন্তু তাদের প্রস্তুত হবার আগেই শত্রুরা আঘাত হেনে বসল। চারজন অফিসারের নেতৃত্বে পঞ্চাশজন পুলিশ ও সেবাদলের গুণ্ডারা ১৩ই ডিসেম্বর রাত একটায় গ্রামের উপর হঠাৎ আঘাত হানল। চাষীরা তৈরি হবার সময় পায়নি। নেতাদের বাড়িতে অমানুষিক অত্যাচার সুরু হল। গবুয়া হালদার, বিহারী, শিবু মণ্ডল, নন্দপতি, হরিশ মণ্ডল প্রভৃতি চাষীদের ঘরবাড়ি তারা ভেঙে দিল। গুণ্ডাদের প্রচণ্ড প্রহারে অনেকেই সংজ্ঞা হারালো। দু'টি চাষী-বৌ গুণ্ডাদের পাশবিক অত্যাচারের শিকার হল।

ক্রোধে ফেটে পড়ল বুধাখালির চাষীরা। পরিকল্পনা মতো তাদের কাজ তারা সুরু করে দিল। অস্ত্র সংগ্রহ হল। প্রহরা বসল গ্রামের চতুর্দিকে। মেয়ে-পুরুষ সবাই এবার তৈরী।

চাষীদের বেপরোয়া প্রহারের ভয়ে গুণ্ডারা দলবদ্ধ না হয়ে রাস্তায় পা বাড়াতো না। ২২শে ডিসেম্বর সকালে জোতদারদের পাণ্ডা ভূষণপতি বর্শা হাতে থাকা সত্ত্বেও রাস্তার উপরে বারো-তেরো বছরের দুটি কিশোরের আকস্মিক আক্রমণ ও বেদম প্রহারে দিশাহারা হয়ে প্রাণভয়ে ছুটে পালালো। কিছু পরেই একদল পুলিশ নিয়ে ভূষণপতি ফিরে এল। ইতিমধ্যেই বড়রা তৈরি হয়ে গিয়েছে। চারদিক থেকে পুলিশ দলকে ঘিরে ফেলে আঘাতের পর আঘাত হেনে পর্যুদস্ত করে ফেলল! শত্রুরা কোনক্রমে প্রাণ বাঁচিয়ে চম্পট দিল। জয়ের প্রথম স্বাদ পেল বুধাখালির চাষীরা!

পালাবার সময় এক চাষীকে রাস্তায় একা পেয়ে গুণ্ডারা তাদের ঘাঁটিতে তাকে তুলে নিয়ে গেল। প্রায় পনেরো জন গুণ্ডা তাদের হেনস্তার প্রতিশোধ তুলবার জন্য সারাদিন ধরে অকথ্য অত্যাচার চালালো এই একটি লোকের উপর। কোন রকমে প্রাণে বেঁচে থাকলেও লোকটি চিরকালের মতো পঙ্গু হয়ে গেল।

পর পর এই ধরনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বুধাখালির সমস্ত মানুষ প্রতিশোধের শপথে কঠোর হয়ে উঠল।

৩০শে ডিসেম্বর তিনশো মেয়ে-পুরুষ মাঠে নামল। শত শত মন ধান কেটে ভাগচাষীদের ঘরে তোলা হল। সেবাদলের বাহিনী এবং পুলিশ সন্ধ্যার অন্ধকারের প্রতীক্ষায় কাছেই ওত পেতে ছিল। এই সময় একাকী পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন চাষীদের এক প্রিয় নেতা। তিনি পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হলেন। কিন্তু তাঁর গ্রেপ্তারের কথা চাষীদের চিৎকার করে জানিয়ে দিলেন।

শত শত চাষী মেয়ে-পুরুষ হাতিয়ার নিয়ে তাদের প্রিয় নেতাকে মুক্ত করতে এগিয়ে এল। প্রাণভয়ে পলায়মান পুলিশ বাহিনীকে ঘিরে ফেলল চাষী-জনতা। ছিনিয়ে আনল তাদের প্রিয় নেতাকে। শিকার পালাতে দেখে পুলিশ বেপরোয়া গুলিবর্ষণ করতে লাগল। পুলিশের সহযোগিতায় এগিয়ে এল কংগ্রেস-পাণ্ডা বিজয়মাধব। গুলিতে আহত হ'ল বহু লোক। সংকটাপন্ন অবস্থা হল নীলকণ্ঠ, সুধীর ও সুরেনের মতো চাষী নেতাদের। মরণাপন্ন এই তিন চাষী নেতার কাছ থেকে গোপন কথা বের করার জন্য অকথ্য নির্মম অত্যাচার চালালো। ব্যর্থ হয়ে লাঠি আর সঙ্গীনের আঘাতে তাদের হত্যা করল।

এর পরেও সংগ্রাম চলেছিল। চাষীরা তাদের উপর অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে ছাড়েনি। গুণ্ডা ও পুলিশ ছাড়াও বিহারী জানার মতো কয়েকজন দালাল চাষীদের গুপ্ত আক্রমণে প্রাণ দিয়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছে।

আজকের বুধাখালির মানুষ আজও গভীর শ্রদ্ধায় বুধাখালির বীর সন্তান সুধীর, সুরেন আর নীলকণ্ঠের আত্মদানের কাহিনী স্মরণ করে।

পঁচিশ

১৯৪৮ সালের শেষভাগে লালগড়ের সংগ্রামের ঝড় আছড়ে পড়ল ক্যানিং থানার সন্দেশখালি মৌজায়।

এর কিছু পরেই সারা বাংলার ক্ষেতমজুর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ক্যানিং থানার ৯০ জন ক্ষেতমজুর এই সম্মেলনে যোগদান করে। সন্দেশখালির প্রতিনিধিরাই ছিল সংখ্যায় বেশী। সম্মেলন শেষে লালগড়ের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা ফিরে এল। অবিলম্বে ছড়িয়ে পড়ল সমস্ত থানায়, মৌজায়। ডাক দিল সংগ্রামের। কৃষি বিপ্লবের মুক্তিযোদ্ধা তারা, কংগ্রেস শাসনের নাগপাশ থেকে তারা মুক্ত করবেই তাদের এলাকা। খেয়ে পরে মানুষের মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার ন্যায্য অধিকার তাদের চাই। বিনিময়ে মৃত্যুকে বরণ করতেও তাদের দ্বিধা নেই।

ক্যানিং থানার শত শত ক্ষেতমজুর তাদের মহাজনের কাছে টাকা আর ধান চাইতে গিয়ে লাঞ্ছিত হয়ে শূন্যহাতে ফিরে এসেছে। লতা-পাতা শামুক খেয়ে দিন কাটছে তাদের। সন্দেশখালির কুখ্যাত জোতদার রমানাথ চাষীদের ধান

দিয়ে সাহায্য করার পরিবর্তে লাঠিয়াল আর বন্দুকের ভয় দেখিয়ে তাদের বিতাড়িত করেছে। সন্দেশখালির বুভুক্ষু চাষীরা সিদ্ধান্ত নিল, ধানের গোলা তারা দখল করবে; সেই ধান ঘরে ঘরে বন্টন করে অগণিত মানুষকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবে।

সংগ্রামের প্রথম দিনেই দখল করা ধানের গোলার প্রায় দু'শো মন ধান সন্দেশখালির চাষীদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হ'ল। বহুদিন পর নিরন্ন মানুষ ভাতের স্বাদ পেল। উৎসাহিত হয়ে পরদিনই প্রায় ৪৫ জন ক্ষেতমজুর লুঠ করল জোতদার রমানাথের ধানের গোলা। মারমুখী ক্ষেতমজুরদের ভয়ে রমানাথ ও পুলিশবাহিনী সন্দেশখালি থেকে বিদায় নিল।

এইভাবে প্রায় পাঁচশো মন ধান দখল করা হল। তা' বন্টন করে দেওয়া হল গ্রামের অনাহারক্লিষ্ট মানুষের মধ্যে। অঞ্চলের বড় জোতদার রমানাথের ছিল বিরাট মহাজনী কারবার। চাষী আর ক্ষেতমজুররা রমানাথের কাছারী বাড়ি আক্রমণ করে সমস্ত কাগজপত্র আগুনে পুড়িয়ে দিল। রমানাথের লাঠিয়ালদের হাতে একজন কৃষককর্মী আটক হয়। একশো জন মুক্তিযোদ্ধা লাঠি আর বল্লম নিয়ে লাঠিয়ালদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কৃষককর্মীটিকে মুক্ত করে। লাঠিয়ালরা পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে পুলিশবাহিনী ছুটে এল। দু'শো জন ক্ষেতমজুর বন্দী হল। কিন্তু চাষীদের ধানের গোলা লুঠ করা বন্ধ হল না।

সন্দেশখালির সুখদেয়ানি অঞ্চলের সব চাইতে বড় জোতদার দ্বারিক শর্মা। হাজার হাজার মন ধানের মালিক সে। এ ছাড়াও গুদামে মজুত করা তেল, চিনি, কাপড় ও অন্যান্য জিনিষ দিয়ে চলে দ্বারিকের চোরাকারবার। দাউদপুর, গারবেড়ে, সুকদেয়ানি ও দুর্গামণ্ডপ থেকে প্রায় পাঁচশো সশস্ত্র ক্ষেতমজুর লালঝাণ্ডা হাতে নিয়ে দ্বারিকের বাড়ি ও কাছারী ঘেরাও করল। সংগ্রামী জনতা দ্বারিক এবং তার লাঠিয়ালদের একটি ঘরের মধ্যে বেঁধে রেখে লুঠ করল বড় বড় ধানের গোলা। উদ্ধার করল বস্তা বস্তা নুন, চিনি, টিন-টিন তেল, চারশো বস্তা গম এবং আটশো জোড়া ধুতি। দ্বারিকের ঘর থেকে উদ্ধার করল লক্ষাধিক টাকার মতো দলিল, হাতচিটা এবং মহাজনী খাতা। এই সব কাগজে শোষণের দলিল পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হল।

ঘটনার পরদিন ৪৫ জনের একটি সশস্ত্র পুলিশ দলের আবির্ভাব ঘটল। দাঁড়িয়ে থাকা ৫০০ জন নিরপরাধ চাষীকে গুলি করল তারা। দু'শো জন চাষী প্রাণ

হারালো। গুলির আওয়াজে লাঠি-বল্লম নিয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে এল পাঁচশো চাষী। সিপাইদের চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল। অবস্থা প্রতিকূল দেখে পুলিশ কর্তারা ক্ষমা চাইল। চাষীরা ক্ষমা করে দিল। বসিরহাটের এস-ডি-ও স্বয়ং এলেন চাষীদের বোঝাতে যাতে তারা লুঠের ধান ফেরত দেয়। কিন্তু সচেতন চাষীরা এই কথায় কান দিল না। দ্বিগুণ উৎসাহে চারিদিকে ধানের গোলা লুঠ করে চলল তারা। শয়ে শয়ে মন ধান বন্টন করা হল গ্রামের নিরন্ন মানুষদের মধ্যে। বাধা দিতে এসে ভয় পেয়ে ফিরে গেল একদল পুলিশ।

এইখানেই শেষ নয়। সন্দেশখালি মৌজার সুসংগঠিত সংগ্রামকে বানচাল করার জন্য পাঁচশো পুলিশের এক বাহিনী ছুটে এল গ্রামের দিকে। মাত্র দু'তিন দিনেই গ্রেপ্তার হ'ল প্রায় সাড়ে তিনশো ক্ষেতমজুর। এক মাসের মধ্যে পুলিশ গুলি চালিয়ে হত্যা করল পাঁচজন চাষীকে। আহত হ'ল অনেক। গ্রামে ঢুকে চাষীদের ঘরবাড়ি ভেঙ্গে গৃহহারা করল হাজার হাজার নারী-পুরুষকে। এইভাবেই একদিন সন্দেশখালির বীর ক্ষেত-মজুরদের অভূতপূর্ব সংগ্রামের উপর যবনিকা নেমে এল।

ছাব্বিশ

২৪-পরগণার অপরদিকে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের স্মৃতিকে বুকে নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে বুরুল। বুরুল ছিল কংগ্রেসীদের পুরনো ঘাঁটি। কিন্তু ১৯৪৮ সালের মাঝামাঝি বিদ্রোহী ক্ষেতমজুররাই কংগ্রেসী পাণ্ডাদের উপর ১৪৪ ধারা জারি করে তাদের গ্রামে ঢোকার পথ বন্ধ করে দিয়েছিল।

বুরুলের সংগ্রামের সূত্রপাত ছাত্রদের দাবীদাওয়াকে কেন্দ্র করে। বুরুল বিদ্যালয়ে গরীব চাষী আর ক্ষেতমজুরদের ছেলেদের সংখ্যাই ছিল বেশী। কংগ্রেসী কর্তারা চিরাচরিত নিয়মে এই বিদ্যালয়ের চাষী ও ক্ষেতমজুরের ছেলেদের উপর অত্যাচার ও নির্যাতন চালাতো। এই অত্যাচার যখন চরমে উঠল, তখন গরীব চাষী ও ক্ষেতমজুররা বিদ্যালয়ে ধর্মঘট ডেকে বসল। তাদের দাবী প্রত্যেক ছাত্রকে সমান অধিকার দিতে হবে। বুরুল বিদ্যালয়ের বড় কর্তা চার হাজার বিঘা জমির চকদার। জমিদার চণ্ডী ঘোষ। গরীব ছাত্রদের এই ঔদ্ধত্য সে মেনে নিতে পারল না। সেখানকার কংগ্রেসী পাণ্ডা মুরারীশরণকে নিয়ে সিদ্ধান্ত নিল, এর

সমুচিত জবাব দিতে হবে। তালা পড়ল বিদ্যালয়ের দরজায়। ছাত্রদের বিভ্রান্ত করতে কর্তাব্যক্তিদের আমন্ত্রণে বুরুলে এলেন মন্ত্রী বিমল সিংহ।

কংগ্রেসীদের এই আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল ছাত্ররা। মন্ত্রী বিমল সিংহ লাঞ্ছিত হলেন। বিদ্যালয়ে তালা লাগানোর প্রতিবাদে ছাত্রদের অনশনকে ভাঙতে পুলিশ এল। কিন্তু ছাত্র ও জনগণের চাপে বাধ্য হল পিছু হটতে। পুলিশ দিয়ে কয়েকজন ছাত্রনেতাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল কংগ্রেসীরা। আগেই সে খবর ফাঁস হয়ে যাওয়ায় পুলিশের একজন মারা পড়ল জনসাধারণের হাতে। ঘরে ঘরে আওয়াজ উঠল: মুরারীশরণ ও চণ্ডী ঘোষের মুণ্ডু চাই। প্রাণের ভয়ে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গেল মুরারী আর চণ্ডী ঘোষ। বিদ্যালয়ের শীর্ষ থেকে কংগ্রেস-পতাকা অপসারিত হ'ল। স্থান পেল রক্তরাঙা লাল পতাকা। সরকারী কর্তারা ক্ষেপে গিয়ে দু'শো গুর্খা সৈন্য পাঠালো বুরুলকে ঠাণ্ডা করার জন্য। বিদ্রোহী নেতাদের দেখামাত্র গুলি করার নির্দেশ দেওয়া হল।

আড়াই মাস ধরে চলল বুরুল ও তার আশেপাশের গ্রামগুলির উপর পুলিশের তাণ্ডবলীলা। শত শত চাষী গ্রেপ্তার হল। কিন্তু নেতাদের ধরা গেল না।

পনেরোই আগস্ট। হাটখোলায় সভা ডেকেছে কংগ্রেসীরা। কম্যুনিষ্টদের শোভাযাত্রা যাতে বের না হয় তার জন্য ৮০ জন সশস্ত্র পুলিশকে মোতায়েন করা হয়েছে। সভায় একজন গ্রামবাসীও যায়নি।

হঠাৎ রক্তরাঙা পতাকা নিয়ে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে বিরাট শোভাযাত্রা করে প্রায় এক হাজার ক্ষেতমজুর উপস্থিত হল সেখানে। শোভাযাত্রার সামনের সারিতে বেনেগ্রামের বৃদ্ধা চাষী-মা রেবতী দাসী। মরিয়া হয়ে পুলিশ গুলি চালালো। বেশ কয়েকজন আহত হ'ল। কিন্তু শোভাযাত্রার গতি স্তব্ধ হল না। স্তব্ধ হল পুলিশবাহিনীর গুলি। চণ্ডী ঘোষ আর মুরারীশরণ প্রাণের ভয়ে পালিয়ে গেল। শোভাযাত্রা এগিয়ে চলল অব্যাহতগতিতে।

১৯৪৯ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী। রক্তের অক্ষরে লেখা একটি দিন। এই দিন পুলিশের বন্দুকের নির্মম গুলিতে প্রাণ দিল হুগলী জেলার ডুবেরভেড়ীর পাঁচজন কৃষক রমণী। অখ্যাত গ্রাম ডুবেরভেড়ীর এই পাঁচ কৃষাণী নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বুকের রক্ত ঢেলে এক রক্তাক্ত ও গৌরবদীপ্ত ইতিহাস রচনা করেছিল। এই পাঁচ কৃষাণী হলেন পাঁচুবালা ভৌমিক, মুক্তকেশী মাঝি, দাসীবালা মাল, চণ্ডীবালা পাখিরা ও পুষ্প মাঝি।

চুঁচুড়া ষ্টেশন থেকে কয়েক মাইল এগোলেই কচুয়ার মোড়। অজ পাড়াগাঁ। সেখান থেকে যেতে হয় ডুবেরভেরীতে। তেভাগা আন্দোলনের ঢেউ লেগেছিল হুগলী জেলার কৃষকদের মধ্যে। ডুবেরভেরীর কৃষকদের জমির লড়াই সেদিন রক্তের বন্যায় ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পুলিশের অবর্ণনীয় অত্যাচারের সামনে কৃষকরা মাথা নত করেনি। পাঁচ কৃষক রমণীর প্রাণের বিনিময়েও তারা তাদের সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছিল। এই পাঁচজন বীরাঙ্গনার জীবনদান শুধু হুগলী জেলায় নয়, সারা পশ্চিমবাংলায় কৃষক আন্দোলনে নতুন প্রাণের সঞ্চার করেছিল।

সাতাশ

১৯৪৬ সালে আসামের লামডিং-এ অনুষ্ঠিত হয় বেঙ্গল-আসাম রেলরোড ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলন। এই সম্মেলনে একটি প্রস্তাবে বলা হয় "বাংলা ও আসামের কৃষকরা ফসলের ন্যায্য অংশ পাওয়ার জন্য তেভাগা আন্দোলন সুরু করিয়াছেন। এই সম্মেলন মনে করে যে, যে-সমস্ত জমিতে মালিকরা ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থায় তাদের ন্যায্য অংশ গ্রহণ করেন না তাহারা ফসলের এক-তৃতীয়াংশের বেশী পাইবার অধিকারী নহেন।"

গ্রামের অগণিত দরিদ্র ভাগচাষীদের সমর্থনে রেলশ্রমিকদের এই প্রস্তাব কৃষক-শ্রমিক ঐক্যকেই নিবিড় করে তুলল। শুধু তাই নয়, দরিদ্র ভাগচাষীদের ন্যায্য দাবীর সমর্থনে রেলশ্রমিক এবং চা-শ্রমিকরা বুকের রক্ত ঢেলে জলপাইগুড়ির ডুয়ার্স অঞ্চলে সেদিন গণবিপ্লবের উৎসমুখ উন্মুক্ত করেছিল। সে কাহিনী এক অনন্ত ও স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাস।

জলপাইগুড়ি জেলার তেভাগা আন্দোলনের একটি বড় এলাকা ছিল পদাগড়, সুন্দরদীঘি, বোদা, দেবীগঞ্জ ইত্যাদি। এখন স্বাধীন বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত।

তিস্তার ওপারে অবস্থিত ডুয়ার্স অঞ্চল তখন সম্পূর্ণ অসংগঠিত। একদিন ওদলাবাড়ি থেকে কয়েকজন আদিবাসী মালবাজারে রেলশ্রমিক ইউনিয়নের অফিসে এসে উপস্থিত। লালঝাণ্ডার ইতিহাস জানতে চাইলেন তাঁরা। সম্প্রতি তে-ভাগা সংগ্রামে আহত মাধব দত্তের সংবাদ তাঁরা শুনেছেন এবং তাঁদের সংগ্রামে রেলরোড শ্রমিক ইউনিয়নের সমর্থন আছে বলে তাঁরা জেনেছেন।

ইউনিয়ন অফিসের তরফ থেকে কমরেড পটল ঘোষ একখানি লালঝাণ্ডা তাঁদের উপহার দিলেন। তাঁদের জানিয়ে দেওয়া হল, ৩রা মার্চ দোমহনীতে শ্রমিক-কৃষকদের যুক্তসভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সেই সভায় তাঁদের উপস্থিত থাকতে হবে।

পূর্বনির্দিষ্ট ৩রা মার্চ অনুষ্ঠিত হল দোমহনীর সভা। সারা ডুয়ার্স-এর রেলশ্রমিক, চা-শ্রমিক কৃষক আর ভাগচাষীরা জনসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ তুলে অগ্রসর হল। লালমনিরহাট থেকে মাদারহাট পর্যন্ত দু'শো মাইল বিস্তৃত রেলপথে আবালবৃদ্ধ-বনিতার কাফেলা এগিয়ে চলল ডুয়ার্স-এর সভাকে লক্ষ্য করে। প্রত্যেকে ন্যায্য ভাড়া গুণে দিয়ে। যাত্রিবাহী গাড়িতেও স্থান সংকুলান না হওয়ায় জনতার চাপে চা-চালানের বাসগুলোকেও যাত্রিবহনের কাজে লাগাতে কর্তৃপক্ষ বাধ্য হল। কিন্তু তাতেও হল না। পায়ে হেঁটে সবাই এগিয়ে চলল তাদের লক্ষ্যে। বাচ্চাদের পিঠে বেঁধে এগিয়ে চলেছে মেয়েরা। ছেলেদের কাঁধে তীর-ধনুক টাঙ্গি। মাথায় চিঁড়ে-মুড়ির পোঁটলা। সবার লক্ষ্য এক—দোমহনীর সভা।

৩রা মার্চ-এর দোমহনীর সভার পরেই প্রকৃতপক্ষে সুরু হয়ে যায় তেভাগার সংগ্রাম। রেলের পয়েন্টসম্যান মনি সিং প্রথমে সাতদিনের ছুটি নিয়ে তেভাগা সংগ্রামে অংশ নিলেন। তার সঙ্গে যোগ দিল মূর্তী গ্যাং-এর বুধন, চালসা গ্যাং-এর গুটি, ট্র্যাফিক জমাদার যদুনাথ সিং এবং আরও অনেকে। মনি সিং চলতেন আধা মিলিটারি বেশে। তার সাতদিনের ছুটি চাকরি থেকে চিরদিনের ছুটিতে পরিণত হয়েছিল।

প্রথম তেভাগা সংগ্রাম হয়েছিল বাতাবাড়ি, পাগলা দেউলিয়াবাড়িতে। সেখান থেকে চা-বাগানের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে বাহিনী নদী পার হ'ল। শিবির স্থাপন করল বালগোবিন্দের মাঠে। পরে যার নামকরণ হয়েছিল পলাশীর মাঠ। ডুয়ার্স-এর তেভাগা আন্দোলনে প্রথম গুলি চলেছিল এখানে। গুলিতে মারা যায় চারজন এবং আহত হয় ২২ জন। হতাহতের মধ্যে ছিল ওদলাবাড়ি চা-বাগানের একাধিক শ্রমিক—বুধু উরাও, কর্মা খারিয়া, পাতারাস মাঝি, লছমন সিং প্রভৃতি।

আরও একটি স্মরণীয় ঘটনা হল মহাবাড়ি গয়ানাথের খোলানে তেভাগা লড়াই। মেটেলি থানার মহাবাড়ি থেকে মাল থানার পানোয়ার বস্তি পর্যন্ত প্রায় আট মাইল রাস্তা অবরোধ করে তেভাগার লড়াই চরম পর্যায়ে উঠেছিল। অবস্থা প্রতিকূল দেখে পুলিশ গুলি চালালো। নিহত হল চারজন। আহত সাতজন।

নিহতের তালিকায় ছিল একটি আট বছরের কিশোর। তার হাতে মুষ্টিবদ্ধ ছিল লাল পতাকা। কিশোরটি মাটিতে লুটিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিপ্ত জনতা ঝাঁপিয়ে পড়ল পুলিশের উপর। ছিনিয়ে নিল তাদের রাইফেল। পুলিশের গুলিতে আহত বুনী উরাও আজও বেঁচে আছেন। দীর্ঘদিন কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত। গুলিতে আহত আরও এক কমরেড পুরিয়া মানকী মুণ্ডা মারা গেছেন দু'বছর আগে। রেলের ট্র্যাফিক জমাদার যদুনাথ সিং ১৯৪৮ সালে কম্যুনিষ্ট পার্টি বে-আইনী ঘোষিত হবার পর আত্মগোপন করেন। সেই অবস্থাতেই টি-বি রোগাক্রান্ত হয়ে মারা যান।

ফসলের সংগ্রাম কিভাবে মুক্তির সংগ্রামে রূপ নিল, তার সাক্ষ্য মাল থানা ঘেরাওয়ের ঘটনা। তেভাগা সৈনিকদের একজনকে পুলিশ মাল থানায় আটকে রেখেছে—এই সংবাদ পেয়ে প্রায় দশ হাজার কৃষক-শ্রমিক ঘন্টার পর ঘণ্টা মাল থানা ঘেরাও করে রাখে। অবরোধের ফলে মাল-মঙ্গলবাড়ি রোড বন্ধ হয়ে যায়। জলপাইগুড়ির এস-পি খবর পেয়ে শহর থেকে মাল থানার দিকে রওনা হন। কিন্তু তাঁর জীপগাড়ি অবরোধে আটকে পড়ল। অবরোধকারীরা জানিয়ে দিল এস-পি সাহেবকে ঢুকতে দেওয়া হবে না। খবর এল মালবাজারের নেতাদের কাছে। তেভাগা সৈনিকরা নির্দেশ চাইছে। নেতারা নির্দেশ দিলেন, সঙ্গে সশস্ত্র পুলিশ থাকলে তাদের আটকে রেখে এস-পিকে আসতে দেওয়া হোক। টুপি খুলে পায়ে হেঁটে এস-পিকে যেতে বাধ্য করা হল। তিনি থানায় এসে নেতাদের ডেকে সমস্ত ঘর দেখালেন। বললেন, তাদের কোন লোকই আটকে নেই। নেতারা অবরোধকারীদের বুঝিয়ে বলায় ঘেরাও তুলে নেওয়া হল।

পরদিন ছিল রবিবার। ডেপুটি কমিশনার সাহেব মাল থানায় এসে নেতাদের ডেকে পাঠালেন আলোচনার জন্য। নেতাদের মধ্যে সমর গাঙ্গুলী গেলেন না। সন্দিগ্ধ মন নিয়েও পরিমলবাবু ও ননী ভৌমিক গেলেন আলোচনায় যোগ দিতে। কিন্তু নেতারা থানায় পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠানো হল। ১৪৪ ধারা জারী করে পুলিশ আর মিলিটারী দ্বারা মালবাজার ও তার চারদিক ছেয়ে ফেলা হল। সুরু হয়ে গেল ব্যাপকহারে ধরপাকড়। নেতাদের সঙ্গে আলোচনার ধাপ্পা দিয়ে ডেকে এনে এইভাবে গ্রেপ্তার করায় শাসককুলের কাপুরুষতা ও বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় আবার নতুন করে পাওয়া গেল।

আঠাশ

দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন স্তরে মেদিনীপুর জেলার কৃষকসমাজ সব সময়েই ছিল অগ্রণী। ১৯২০-২৪ সালের অসহযোগ আন্দোলন, ১৯৩০-৩৪ সালের অহিংস আইন অমান্য আন্দোলন এবং ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলনে মেদিনীপুরের কৃষকদের সংগ্রামী ভূমিকা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই জেলাতেই তিন ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটকে হত্যা করা হয়। বিপ্লবীরা নিদারুণ অত্যাচার ও নির্যাতন হাসিমুখে সহ্য করেছেন। বৃটিশের অধীনতা থেকে মুক্তির সংগ্রামে, জমিদারী শোষণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে, ধারেন্দা পরগণার সাঁজাভাঙা আন্দোলন বা মহিষাদল, সুতাহাটা, ময়না থানাগুলিতে কর আদায় বন্ধ ও কর্জাধানের সুদ কমানোর আন্দোলনে এবং তমলুক, পাঁশকুড়া, কেশপুর, চন্দ্রকোনা, দাসপুর প্রভৃতি থানাগুলিতে জমিদারী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামে মেদিনীপুরের সংগঠিত কৃষক দীর্ঘস্থায়ী ইতিহাস রচনা করেছিল। ১৯৪২ সালে কংগ্রেসের ডাকে 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে এই জেলার কৃষক-সমাজ সারা জেলাতেই ছড়িয়ে দিয়েছিল বিদ্রোহের আগুন। তারপর ১৯৪২ সালের ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, মহামারী, দুর্ভিক্ষ আর লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনহানির ভয়াবহতার বিরুদ্ধে লোন, রিলিফ ও বাঁচার সংগ্রামেও এ জেলার কৃষকরা পিছিয়ে পড়েনি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি ও খাদ্য সংকটের চাপে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল করভারে জর্জরিত মেদিনীপুরের দরিদ্র কৃষক, ভূমিহীন ভাগচাষী আর ক্ষেতমজুর। জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতায় এক নতুন চেতনা নিয়ে এগিয়ে এল তারা প্রাদেশিক কৃষক সভার তেভাগার সংগ্রামের ডাকে। কৃষক সভা আওয়াজ তুলল: 'এই ফসলেই তেভাগা চাই'—'রসিদ ছাড়া ধান নেই—'জোতদারদের খামারে নয়, চাষীদের হেপাজতে ধান খামারে তোল'—'তেভাগার দাবী আদায় কর'। জেলার সমগ্র ভাগচাষ-প্রধান অঞ্চলে গরীব কৃষক ও ভূমিহীন ভাগচাষীদের সামনে বাঁচার নিশানা তুলে ধরেছিল এই আওয়াজ।

জেলার কৃষক-নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত নেন যে, জেলার ভাগচাষ-প্রধান এলাকাগুলিকে ভিত্তি করে এই আন্দোলনকে দ্রুত সংগঠিত করতে হবে। কৃষি-মজুরদের মজুরীবৃদ্ধির দাবী তুলতে হবে। আবার, সংগ্রামী ভাগচাষীদের পাশাপাশি ছোট-মাঝারী রায়ত প্রজাদের সংগ্রামী ঐক্য বজায় রাখার জন্য বাকী বকেয়া

খাজনা মকুব, হাজা-শুকায় খাজনা ছাড়, সেচ ও নিকাশীর সুব্যবস্থার দাবীতে খাজনা বন্ধ আন্দোলনকেও প্রসারিত করতে হবে, যাতে বৃটিশ সরকার পুলিশী জুলুম চালিয়ে ভাগচাষীদের একক সংগ্রামকে বিচ্ছিন্ন করে দমিয়ে দিতে না পারে। জেলা নেতৃত্বকে সেই ভাবে বিভক্ত করে নির্দিষ্ট দায়িত্ব দেওয়া হয়। তেভাগা আন্দোলনের দায়িত্ব যাদের উপর ন্যস্ত হয় তাঁরা হলেন অনন্ত মাজী, বঙ্কিম গিরি, ভূপাল পাণ্ডা, পণ্ডিত জানা, সরোজ রায়, রাখাল বাগ প্রমুখ নেতৃস্থানীয় কর্মীরা। নেতারা স্থির করেন যে তমলুক মহকুমাতে নন্দীগ্রাম থানা বিশেষভাবে ভাগচাষ-প্রধান অঞ্চল হওয়ায় সেখানেই আন্দোলনকে সুসংগঠিত করে সাফল্যের পথে এগিয়ে নিতে হবে। ব্যাপক প্রচার সংগঠিত করার জন্য ছাত্র কর্মীদল পাঠানো হয় গ্রামাঞ্চলে। মেয়েদের সংগঠিত ও সংগ্রামে সামিল করার দায়িত্ব দেওয়া হয় বিমলা মাজীকে।

ভূমিহীন ভাগচাষীদের উপর সরকার ও জোতদার-মহাজনদের শোষণ এখানে মাত্রাধিক্য হওয়ায় তেভাগার সংগ্রামও ব্যাপক রূপ নেয়। এই সংগ্রাম বিস্তৃতি লাভ করে এবং তীব্র হয়ে ওঠে বড় বড় জোতদারদের বিরুদ্ধে। তাদের মধ্যে রয়েছে মনুচকের দেওয়ান সাহেব, মহম্মদপুরের পড়ুয়া ও মাইতি পরিবার, কেন্দে-মারীর জানা পরিবার, গোপাল চকের সিং পরিবার, গড়চক্রবেব্যার খাঁ পরিবার, সুতাহাটার শ্যামাচরণ ত্রিপাঠি, পাঁশকুড়ার হরিসাধন চক্রবর্তী চৌধুরী, মহিষা-দলের মাইতি পরিবার, ময়নার আসনামের দাস পরিবার, কেশপুর-আমনপুরের চৌধুরী পরিবার ইত্যাদি জোতদাররা।

এই সমস্ত বড় বড় জোতদার-মহাজনের এলাকাধীন ভাগচাষীপ্রধান গ্রামগুলিতে প্রতিটি মালিকের বিরুদ্ধে কৃষকদের পৃথক পৃথক আঞ্চলিক সংগ্রাম কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির প্রতিনিধি এবং জেলা কৃষক নেতাদের নিয়ে থানা সংগ্রাম কমিটি গড়ে ওঠে। সেখান থেকে আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রদত্ত নির্দেশ মতো সংগ্রাম পরিচালিত হয়। সংগ্রাম কমিটির অধীনে জঙ্গী কৃষক-যুবকদের নিয়ে ভলান্টিয়ার বাহিনী ও জঙ্গী-মেয়েদের নিয়ে নারী বাহিনী গঠন করা হয় প্রতিটি গ্রামে।

তেভাগার দাবীর ন্যায্যতা, ফ্লাউড কমিশনের সুপারিশ, রসিদ না দিয়ে জোতদার মহাজন শ্রেণীর নির্মম শোষণের ঘটনাবলী তুলে ধরে হাটে বাজারে গ্রামে গঞ্জে ব্যাপক প্রচার চলে। এই অবিচারের বিরুদ্ধে সর্বস্তরের কৃষকদের প্রতিবাদ

জানানোর এবং ভাগচাষীদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে সামিল হবার আহ্বান জানানো হয়। মাঝে মাঝে সংগঠিত কৃষক বাহিনীর লালঝাণ্ডা উড়িয়ে আন্দোলন, এলাকা জুড়ে জঙ্গী কৃষক-স্বেচ্ছাসেবকদের কুচকাওয়াজ সমগ্র এলাকায় ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। গ্রামের পর গ্রামে গরীব ভূমিহীন ভাগচাষীরা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এই আন্দোলনে সামিল হয়ে নিজেদের সংগ্রাম কমিটি গড়ে তোলে। দিকে দিকে আওয়াজ ওঠে: 'এই ফসলেই তেভাগা চাই—'রসিদ ছাড়া ধান নেই—"মালিকের খামারে নয়, চাষীর পঞ্চায়েত খামারে ধান তোল'—'তেভাগার দাবী আদায় কর।'

ঘটনার এই আকস্মিকতা ও ব্যাপ্তিতে বড় বড় জোতদার ও মালিক গোষ্ঠী প্রমাদ গুনল। ইংরেজ জেলা ও মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের দরবারে ধর্ণা দিয়ে আবেদন জানালো লালঝাণ্ডা দলের বেআইনী লুঠতরাজ, খুনখারাপী ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়া হোক। বশংবদদের রক্ষার জন্য ইংরেজ সরকার প্রতিটি থানায় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী পাঠিয়ে দিল। পুলিশ ক্যাম্প বসল জোতদার-জমিদারদের বসতবাড়ি, কাছারীবাড়ি ও স্কুল ঘরে।

এর পরই সুরু হল মাঠের ধান খামারে তোলার সংগ্রাম। কৃষক ঐক্যে ফাটল ধরাবার জন্য আতঙ্কিত জোতদার-জমিদাররা মিথ্যা প্রচারের আশ্রয় নিয়ে বলতে লাগল: মালিকের খামারে ধান তুললে বাকী-বকেয়া মকুব। জমি কায়েম থাকবে। অন্যথায় বাকী ধানের নালিশ হবে। পুলিশ দিয়ে জেলে পাঠানো হবে। ঘরবাড়ি লুঠ করে সবংশ নিধন করা হবে। অন্যদিকে সংগ্রাম কমিটির আওয়াজ হল: 'জোতদারের খামারে নয়, চাষীর নিয়ন্ত্রণাধীন পঞ্চায়েত খামারে একত্রে ধান তোল। এই ফসলেই তেভাগা চাই। রসিদ ছাড়া ধান নেই।' তারা স্থির করল ক্যাম্প-এর পুলিশ দূরে সরে গেলে কাটা ধান চাষীর খামারে তুলে নেবে। কোন কাটা ধান মাঠে পড়ে থাকবে না।

পুলিশকে এড়িয়ে এইভাবেই প্রতিটি মালিকের প্রায় সারা মাঠের ধান চাষীরা দল বেঁধে নিজেদের পঞ্চায়েত খামারে তুলে নিল। কিন্তু পুলিশ ক্যাম্প-এর কাছাকাছি কয়েক শ' বিঘা জমির ধান তখনও মাঠে পড়ে আছে। সংগ্রাম কমিটির নেতারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, লাল ঝাণ্ডার মান রাখতে ঐ ধান যে করেই হোক তুলতে হ'বে। প্রশ্ন উঠেছিল, সশস্ত্র পুলিশের মুখোমুখি ফাঁকা মাঠে দাঁড়িয়ে এ কাজ কি সম্ভব? কিন্তু অনেক জয়ের স্বাদ তারা পেয়েছে। পিছু হটতে তারা রাজী নয়। যে করেই হোক ধান ঘরে তুলতে হবে।

স্থির হল পরদিন সকালেই শত শত কৃষক-মিছিল এসে পুলিশ-ক্যাম্প ঘিরে ফেলবে এবং তার পর ধান তোলা হ'বে। প্রথম বাহিনীর পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত হ'ল ভূপাল পাণ্ডার উপর। সকাল হতেই চারদিক থেকে কৃষকবাহিনী এগিয়ে চলল কেন্দেমারী অভিমুখে। উত্তর দিক থেকে প্রথম বাহিনী ক্যাম্প-এর মাঠে ধাবিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জোতদারদের ভাড়াটিয়া মজুররা দৌড়ে ক্যাম্প-এ পালালো। সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল সশস্ত্র পুলিশ-বাহিনী। তাদের সঙ্গে জোতদার ও গুণ্ডারা দু'দিক থেকে এসে ঘিরে ফেলল প্রথম বাহিনীকে। সংঘর্ষ সুরু হয়ে গেল। রণ-কৌশলের ত্রুটির জন্য অন্যান্য কৃষকবাহিনী তখনও মাঠের দূর প্রান্তে। তারা পৌছবার আগেই প্রথম বাহিনীকে পুলিশ ও গুণ্ডার দল ক্যাম্প-এ বেঁধে রাখে। কিছুক্ষণের মধ্যেই কৃষকদের জঙ্গীবাহিনীগুলি ক্যাম্প ঘেরাও করার জন্য পশ্চিম দিকে এসে সমবেত হতে থাকে। ইতিমধ্যে থানার সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীও এসে পড়ে। আক্রমণকারী কৃষক-বাহিনী বন্দুকের গুলির মুখে পিছু হটতে বাধ্য হয়।

প্রথম জঙ্গী কৃষক দলটিকে গ্রেপ্তার করতে পেরে জোতদার ও পুলিশ-বাহিনীর মনোবল প্রচণ্ড বেড়ে যায়। তারা চক্রান্ত করে চাষীর পঞ্চায়েত-খামার ভেঙ্গে সমস্ত ধান মালিকের খামারে তুলে আনবার। মহম্মদপুরের দাসপাড়ার পঞ্চায়েত-খামার তারা প্রথম আক্রমণ করে। তাদের আক্রমণ প্রতিরোধে এগিয়ে আসে কমরেড বিমলা মাজীর নেতৃত্বে জঙ্গী কৃষক-নারী বাহিনী দা, বঁটি, ঝাঁটা ও কোঁচড়ে ধুলোর সঙ্গে লঙ্কা-নুনের গুঁড়ো নিয়ে। খামারের মধ্যেই সুরু হয় সংঘর্ষ। নারী-বাহিনী কোঁচড় থেকে লঙ্কা-নুনের ধুলো উড়িয়ে দেওয়ায় পুলিশ ও গুণ্ডার দল চোখের জালায় আতঙ্কিত হয়ে পালাতে সুরু করে। আর ঠিক সেই সময়েই লাঠিধারী স্বেচ্ছাসেবক দল আওয়াজ তুলে দৌড়ে আসতে থাকে। তাই দেখে সশস্ত্র পুলিশ-বাহিনী পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। মুহূর্তে এই খবর ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত সংগ্রামী এলাকাগুলিতে। পরদিন থেকেই প্রতিরোধের প্রস্তুতি নিয়ে খামারে খামারে ধান ঝাড়াই ও মাড়াইয়ের কাজ সুরু হয়ে যায়।

সশস্ত্র পুলিশ ও গুণ্ডাবাহিনীর বিরুদ্ধে নন্দীগ্রাম-মহম্মদপুরের নারীবাহিনীর মুখোমুখি প্রতিরোধের এই অপূর্ব কৌশল জেলার সমস্ত এলাকাকে উদ্বুদ্ধ করে। সর্বত্র কৃষক-রমণীরা পুলিশ-প্রতিরোধে অপূর্ব বীরত্বের পরিচয় দেয়। পাঁশকুড়ার চকগোপালপুরে চাষীদের খামার ভাঙতে আসে পুলিশবাহিনী। একই কৌশলে ঝাঁটা-বঁটি নিয়ে তারা পুলিশবাহিনীকে প্রতিরোধ করে। শেষ পর্যন্ত অত্যাচারী

জোতদাররা চাষীদের সঙ্গে আপোষের মাধ্যমে ৪০ ভাগ নিয়ে ৬০ ভাগ চাষীদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। মহিষাদল, সুতাহাটা, কেশপুর—সর্বত্রই চাষীরা তাদের সংগঠনের শক্তি অনুযায়ী মোট ফসলের অর্ধেকের বেশী ভাগ ও বাকী বকেয়া মকুবে জোতদারদের বাধ্য করে।

মেদিনীপুর জেলায় তেভাগা লড়াইয়ের এই ব্যাপক জয় ঐ বছর কেশপুর থানার পাঁচখুরিতে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনের বিশেষ অভিনন্দন লাভ করে।

১৯৪৬ সালে তেভাগা আন্দোলনের সময় মুক্ত-অঞ্চল কথাটি প্রথম প্রচলিত হয়। যশোহরে মুক্ত-অঞ্চল ছিল বড়েন্দার, পাঁজিয়া, এগারখান, মনিরামপুর, দুর্গাপুর প্রভৃতি গ্রাম নিয়ে এক বিরাট এলাকা। এই এলাকা দিনরাত পাহারা দিত লাল টুপি পরিহিত সেচ্ছাসেবীরা। মুক্ত-অঞ্চলে পুলিশবাহিনী প্রবেশ করলেই জয়ঢাক পিটিয়ে সংকেত করা হত। এই ঢাকের আওয়াজে সংলগ্ন গ্রামগুলিতেও জয়ঢাক বেজে উঠত। মুহূর্তেই গোটা অঞ্চল সতর্ক হয়ে যেত আসন্ন বিপদ সম্পর্কে।

একদিন খবর এল ভোরের দিকে কয়েক গাড়ি রাইফেলধারী পুলিশ দুর্গাপুর অভিমুখে রওনা হয়েছে। যথাসময়ে যথাস্থানে খবর পৌছল। সশস্ত্র পুলিশ-বাহিনী ঘেরাও হল। নিজেদের বিপদ বুঝে পুলিশবাহিনী বেরিয়ে চলে যাবার পথ চাইল। কৃষক নেতারা তাদের উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন করলেন, কেন তারা গ্রামে ঢুকে নিরীহ গ্রামবাসীদের যথাসর্বস্ব লুঠ করছে? এই প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর না দিতে পারলে তাদের ছেড়ে দেওয়া কোন মতেই সম্ভব নয়। একটা বড় রকমের সংঘর্ষ প্রায় অপরিহার্য হয়ে উঠল। শেষ পর্যন্ত পুলিশ অফিসার গুলি চালানোর নির্দেশ দিলেন। কিন্তু পুলিশবাহিনী স্তব্ধ। তারা বুঝতে পেরেছে তারাও তো কৃষক-সন্তান! এদের গুলি করলে সে গুলি তাঁদের বুকে এসেই বিঁধবে। ঘটনার আকস্মিকতায় কৃষক নেতারা, চাষী ও স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী—সবাই বিস্ময়ে মূক।

দু'দিন বাদে 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় প্রকাশিত হল একটি সংবাদ: 'নড়াইলে কৃষক-জনতার উপর পুলিশের গুলি চালাতে অস্বীকার'।

ঊনত্রিশ

কংগ্রেসমন্ত্রী জমিদার হেম নস্করের জমিদারী এলাকা দক্ষিণের সোনারপুর-ভাঙর। তিনি মাছের ব্যাপারীও। হাজার বিঘা ভাগা জমি তার। মাছের ব্যবসা চালাবার জন্য জমিদারবাবুরা নদী মজিয়ে ভাগা এলাকা করেছেন কৃষকদের সর্বনাশ করে। এই টাকার কুমীরদের প্রতিটি টাকার পেছনে রয়েছে চাষীর অশ্রু আর জমাট বাঁধা রক্ত।

শত শত চাষীকে জমিজমা, ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করে জমিদার হেম নস্করের ব্যবসা ফুলে ফেঁপে উঠতে লাগল। সাকরেদ হিসাবে জুটল ২৪ পরগণা জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক জমিদার হৃদয়ভূষণ চক্রবর্তী। এদের জমিদারীতে চাষীদের দুর্দশার অন্ত ছিল না। হাড়ভাঙ্গা খাটুনি। বিনিময়ে সামান্য মজুরী। কোনদিন তা'ও জুটতো না। অনাহার ছিল নিত্যসঙ্গী। এমনই অবস্থায় আট-দশ দিন অনাহারে থেকে দাবা গ্রামের ষাট বছরের চাষী রমানাথ মণ্ডল প্রাণত্যাগ করল। জমিদারদের ঘরে ঘরে ধর্ণা দিয়ে একমুঠোও ক্ষিধের অন্ন জোটেনি। জুটেছে লাঞ্ছনা, গঞ্জনা। রমানাথের মৃত্যু সমস্ত চাষীর চোখ খুলে দিল। তারা বুঝতে পারল, বাঁচতে হ'লে সংগ্রাম করতে হবে। বেওতা, বাতাবাড়ী ও বনগ্রামের শত শত ক্ষুধার্ত মানুষ লাঠি-বল্লম নিয়ে জমিদারের ধানের গোলা দখল করল। লুঠ করা ধান প্রতিটি চাষীর ঘরে বণ্টন করে দিল। জনতার আদালত বসালো তারা। সেই আদালতের বিচারে অত্যাচারী জমিদার ও তাদের স্তাবকদের চরম শাস্তি ঘোষণা করা হল। গরীব চাষীর সর্বনাশ করে অসৎভাবে সঞ্চিত তাদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হল।

চাষীদের এই বিদ্রোহের সংবাদ পেয়ে পুলিশ আর ফৌজ নিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হ'ল ভাঙর থানার দারোগা। সঙ্গে এল ২৪ পরগণার সর্বোচ্চ কর্তা। কিন্তু সেচ্ছাসেবকদের হাতে প্রচণ্ডভাবে মার খেয়ে সেদিনের মতো পালিয়ে যেতে বাধ্য হ'ল। আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে প্রতিধ্বনিত হ'ল কম্যুনিষ্ট পার্টির জয়ধ্বনি।

কৃষক-জনতা সংগ্রাম কমিটি গঠন করল। জমিদার আর জোতদারদের জমি দখল করে নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নিল। জমির ভাগ পেল দরিদ্র ভাগচাষী আর ক্ষেতমজুর।

এবার তারা দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল মেছোঘেরি দখলের জন্য। সমস্ত

মেছোঘেরি দখল করে লোনা জল বের করে জমিকে চাষোপযোগী করে তুলতে তারা। ভেড়ী দখলের কাজ চলল মেয়াদাসাহেবের আবাদ তিউড়ি ও নয়াবাদ এলাকায়। সোনারপুরের তুলসী নস্কর হলেন ভেড়ী-মজুরদের প্রধান নেতা। কংগ্রেসকর্মী ভূপতি নস্কর প্রমাদ গুনল। সন্ধ্যার আগে শ্রীধরণ পাণ্ডে, ভূপতি নস্কর ও অন্যান্য জোতদার-জমিদারদের নেতৃত্বে পঁচিশ জন সশস্ত্র পুলিশ ভেড়ী-মজুরদের আক্রমণ করল। ভেড়ী-মজুর আন্দোলনের কর্মী বামাচরণ। তাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করল। মুহূর্তে চারদিকে সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল। কৃষক-জনতা পুলিশকে ঘিরে ফেলে আক্রমণ চালালো তাদের প্রিয় কর্মী বামাচরণকে মুক্ত করে আনবার জন্য। এই আক্রমণের সুযোগে বামাচরণ এক ফাঁকে পুলিশের হাত ছাড়িয়ে জনতার মধ্যে মিশে গেল। বেপরোয়া হয়ে গুলি চালালো পুলিশ। সেই গুলিতে প্রথম শহীদ হলেন ষাট বছরে বৃদ্ধ মতি ধাড়া।

এই ঘটনায় ক্ষিপ্ত জনতা তাদের আক্রমণ তীব্রতর করে পুলিশের বন্দুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বামাচরণ দারোগার গালে প্রচণ্ড জোরে ঘুষি চালিয়ে তাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে তার রিভলভারটি ছিনিয়ে নিল। ওই রিভলভার থেকে বেপরোয়া গুলি চালিয়ে অনেক পুলিশকে হতাহত করল। অন্যদিকে পুলিশের গুলিতে দ্বিতীয় শহীদ হ'ল দাশু।

দু'দিন পর পাঁচশো সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে ২৪ পরগণার পুলিশের বড়কর্তা গ্রামে চড়াও হ'ল। তিনমাস ধরে চালালো সন্ত্রাসের রাজত্ব। সক্ষম পুরুষরা প্রত্যেকে গ্রেপ্তার হ'ল। ভাগচাষী আর ক্ষেত মজুরদের একটি ঘরও অক্ষত থাকলো না। এদের পাশবিক অত্যাচারের শিকার হ'ল অসংখ্য যুবতী মেয়ে ও বৌ। অত্যাচারের তাণ্ডবে একদিন শেষ হয়ে গেল সোনারপুর-ভাঙরের সংগ্রাম।

ত্রিশ

১৯৪৬ সালে মৌভোগ কৃষক সম্মেলনে "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ" বিষয়ক প্রস্তাব গৃহীত হয়। সেই প্রস্তাবে জমিদারী শোষণের বিরুদ্ধে শেষ সংগ্রামের জন্য কৃষকদের আহ্বান করা হয়।

এই সম্মেলনে বর্গাদারদের জন্য তেভাগা আইন প্রণয়নের দাবীও করা হয়। ঐ বছরই সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক কৃষক কাউন্সিলে সিদ্ধান্ত নেওয়া

হয় যে পরবর্তী ফসলের মরশুমেই তেভাগা সংগ্রাম সুরু করতে হ'বে। অক্টোবর মাসে দিনাজপুরে পার্টির জেলা কমিটি ও জেলা কৃষক সমিতির সভায় তিনটি দাবীর ভিত্তিতে জেলার তেভাগা সংগ্রাম সুরু করার জন্য সিদ্ধান্ত ও বিস্তৃত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এই তিনটি দাবী হ'ল: নিজের গোলায় ধান তোল, আধি নেই, তেভাগা চাই; কর্জাধানের সুদ নাই। এর মধ্যে নিজের গোলায় ধান তোলার উপরেই বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়।

গাঁয়ের মাঠে মাঠে তখন পাকা ধানের সোনা-রংয়ের সমারোহ। হাটে-বাজারে, পথে-ঘাটে, লালঝাণ্ডা ও লাঠিধারী স্বেচ্ছাসেবকের সমাবেশ। স্লোগানে স্লোগানে সারা গ্রাম কেঁপে উঠছে। পাকা ধানের শীষ বাতাসে কাঁপছে। সংগ্রামের দামামা বেজে চলেছে। বজ্রমুষ্টি উঁচিয়ে কৃষকরা একে অপরকে সংগ্রামী সম্ভাষণ জানাচ্ছে: 'কমরেড, ইনক্লাব'। সেই সঙ্গে খবর নিচ্ছে অন্য গ্রামের প্রস্তুতির। গ্রামের পর গ্রাম একই চিত্র। প্রতিটি গ্রাম জমাট বাঁধা কৃষক ঐক্যের প্রতীক। ক্ষেতমজুর, আধিয়ার, মাঝারি কৃষক, কিছুটা স্বচ্ছল কৃষক—সকলেই আধিয়ারের পক্ষে লাঠি ধরেছে, ভলান্টিয়ার হয়েছে। কমরেড গুরুদাসের এলাকা ছিল জেলার দুর্ভিক্ষ পীড়িত অঞ্চল। ঠাকুরগাঁর ঐ পশ্চিমাঞ্চল ছিল জেলার পার্টি ও কৃষক-সমিতির সব চাইতে শক্তিশালী ঘাঁটি। এই এলাকা থেকেই ধান কাটা সুরু করার সিদ্ধান্ত হয়। সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করার দায়িত্ব দিয়ে জেলা-সম্পাদককে এই এলাকায় পাঠনো হয়।

সুরু হল ধান কাটা। একদল ভলান্টিয়ার লালঝাণ্ডা নিয়ে স্কোয়াড করে ধান কাটছে। অন্যরা পাহারা দিচ্ছে। মেয়ে-পুরুষ—সকলেই মাঠে। ধান কাটা হ'ল। আধিয়ারের বাড়িতে সেই ধান তোলা হ'ল। পুলিশ কোন বাধা দিল না। পরদিন সশস্ত্র পুলিশ গ্রামে হানা দিল। জেলা সম্পাদকসহ ৩২ জন কৃষক কর্মীকে গ্রেপ্তার করে ধানচুরির অভিযোগে ঠাকুরগাঁ চালান দিল। কিন্তু ধান কাটা বন্ধ হল না। পুলিশ, মাঠে নেমে ধান কাটায় বাধা দিতে গেল। কৃষক-মহিলা কমরেড দীপশ্বরী লাঠি উঁচিয়ে পুলিশের দিকে ছুটে গেলেন। পেছনে ভলান্টিয়ারের দল। পুলিশ পিছু হটল। মাঠ ছেড়ে চলে গেল। দীপশ্বরীর দুরন্ত সাহস ও পুলিশের পিছু হঠার কথা চারদিকে বিদ্যুৎগতিতে ছড়িয়ে পড়ল। সর্বত্র প্রবল উদ্দীপনার সৃষ্টি হল। সব এলাকায় ধান কাটা এগিয়ে চলল জোর কদমে। পুলিশ বাধা দিল না। কিন্তু ধান চুরির মিথ্যা দায়ে কর্মীদের নামে হাজার হাজার গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বের হ'ল। জেলা ও

মহকুমা শাসকদের কাছে দলবেঁধে জোতদারদের ছুটোছুটি, কৃষকদের মধ্যে আতঙ্ক ও সন্ত্রাস সৃষ্টির প্রচেষ্টা, জোতদারদের আপোসের গালভরা প্রস্তাব—সবকিছুকে উপেক্ষা করে আধিয়াররা সব ধান কেটে নিজেদের খোলানে তুলতে লাগল। পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করতে গ্রামে ঢুকলে প্রতিরোধের সম্মুখীন হল।

৪ঠা জানুয়ারী, ১৯৪৭ সাল। দিনাজপুর সহরের সন্নিকটে চিরিরবন্দর এলাকায় সশস্ত্র পুলিশের গুলিতে কমরেড শিবরাম ও সমিরুদ্দীন নিহত হন। তেভাগা আন্দোলনের প্রথম শহীদ শিবরাম ও সমিরুদ্দীন। সমিরুদ্দীন ছিলেন ক্ষেতমজুর আর শিবরাম গরীব সাঁওতাল আধিয়ার। একজন পুলিশও তীরবিদ্ধ হয়ে মারা যায়।

সংগঠিত এলাকার সর্বত্রই আধিয়াররা ধান কেটে নিজ নিজ খোলানে তুলেছে। পুলিসী সন্ত্রাস তাদের দমন করতে পারেনি। সংকল্পে অটল ছিল তারা। অসংগঠিত কিছু এলাকায় অবশ্য আধিয়াররা নিজেদের খোলানে ধান তুলতে সাহস করেনি। জোতদারের খোলানেই ধান তুলেছিল।

ইতিমধ্যে সংগঠিত এলাকায় কিছু কিছু ধান ঝাড়াই ও ভাগ সুরু হয়ে গিয়েছে। কৃষক সমিতির ছাপ দিয়ে তারিখ ও সময় জানিয়ে জোতদারদের নোটিশ দেওয়া হয়েছে ধান ওজন ও ভাগ করার সময় উপস্থিত থেকে নিজের নিজের অংশ বুঝে নেবার জন্য। জোতদাররা অনুপস্থিত। গ্রামের লোককে সাক্ষী রেখে তাদের উপস্থিতিতেই ধান ওজন ও ভাগ হচ্ছে। অনুপস্থিত জোতদারদের নামে নামে তিনভাগের একভাগ ধান ধর্মগোলায় অথবা সকলের আস্থাভাজন কৃষকের ঘরে জমা রাখা হচ্ছে। দুর্ভিক্ষের সময় কৃষকরা এই ধর্মগোলা তৈরি করেছিল।

গ্রামে পুলিশের হানা কিন্তু অব্যাহত। তারা গ্রামে ঢুকলেই ঘণ্টাধ্বনি হয়। কাঁসর-শঙ্খ বেজে ওঠে একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত। আর, মুখরিত হয়ে ওঠে 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ' ধ্বনি। কৃষক-মহিলারাই এর সংগঠক। সংকেত ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে লাঠি, ঝাঁটা ও গাইন হাতে মহিলারা পথে বেরিয়ে এসে গ্রামে ঢোকবার মুখে পুলিশের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের সৃষ্টি করে। এই প্রতিরোধ সংগ্রাম সবত্র। রাত দুপুরে ঠুমনিয়া অফিসে খবর এল—রাণী শঙ্কাইলে এক বন্দুকধারী পুলিশ মহিলা ভলান্টিয়ারদের প্রতি সম্মানহানিকর উক্তি করেছে। কমরেড ভাণ্ডনীর নেতৃত্বে মহিলারা পুলিশটিকে 'গ্রেপ্তার' করে একটি ঘরে আটকে রেখেছেন। ঠুমনিয়া থেকে নির্দেশ না আসা পর্যন্ত কমরেড ভাণ্ডনী বন্দুকটি নিজ

কাঁধে তুলে নিয়ে পুলিশকে পাহারা দেন। এই সমস্ত রাজবংশী মহিলারা বিভিন্ন এলাকায় বীরত্ব ও নির্ভীকতার অপূর্ব নজির সৃষ্টি করেন।

এই সময়েই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় যে লীগ সরকার তেভাগা সংক্রান্ত একটি বিল আইন সভায় আনছেন। ঐ বিলের খসড়া ২২শে জানুয়ারীর গেজেট-এ প্রকাশিত হয়। তেভাগার তীব্র সংগ্রাম সরকারকে এই ঘোষণায় বাধ্য করে।

সংগ্রাম এবার নতুন মোড় নিল। এক নতুন জঙ্গী অধ্যায় সুরু হল। এই সংগ্রাম খোলান-ভাঙ্গা আন্দোলন নামে পরিচিত। তেভাগা সম্পর্কিত আইনের সংবাদ অসংগঠিত এলাকার আধিয়ারদের চঞ্চল করে তুলল। তারা জোতদারদের খামারেই ধান তুলেছিল। কিন্তু আন্দোলনের গতি লক্ষ্য করছিল। তাদের আশঙ্কা, আইন পাশ হলেও জোতদারদের খামার থেকে তারা তাদের ন্যায্য অংশ পাবে না। দলে দলে কৃষক-সমিতির কাছে এসে তারা সাহায্য চাইল। যাতে জোতদারের খামার থেকে নিজ নিজ ধানের পুঁজি ভেঙে তাদের নিজেদের খোলানে তুলতে পারে।

এক লাঠি—এক মানুষ—এক টাকা। কৃষক-সমিতি সংগ্রামের এই সাংগঠনিক স্লোগান ঘোষণা করল। গ্রামের প্রতিটি বাড়ি থেকে এল একজন লাঠিধারী ভলান্টিয়ার, একজন কৃষক-সমিতির সভ্য, এক টাকা সংগ্রাম তহবিলে চাঁদা।

এই আধিয়ারদের বিরাট অংশ ছিল মুসলমান কৃষক। জেলার মুসলিম লীগের নেতারা নোয়াখালি থেকে কিছু মৌলভী আমদানী করে মুসলমান কৃষকদের দিয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধাবার চেষ্টা করল। কৃষকনেতা হাজী মহম্মদ দানেশকে খুন করবার চেষ্টা হল। মুসলমান আধিয়াররা হাজী সাহেবের কাছেই 'পুঁজিভাঙ্গা আন্দোলন'-এর 'হুকুম' আনতে গিয়েছিল।

'পুঁজভাঙ্গা আন্দোলন' স্বতঃস্ফূর্তভাবেই আগুনের মতো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। হাজার হাজার ভলান্টিয়ার। তারা দিনের পর দিন লালঝাণ্ডা হাতে মিছিল করে জোতদারের খামার থেকে নিজ নিজ ধানের পুঁজি ভেঙ্গে নিয়ে আসে। নিজ নিজ বাড়ির খোলানে মজুত করতে থাকে। নিজ ধানের পুঁজি ছাড়া জমিদার বাড়ির অন্য কিছুই তারা স্পর্শ করেনি।

জোতদাররা আতঙ্কিত হয়ে গ্রাম ছেড়ে পালালো। কেউ ভীড় করল জেলা ও মহকুমা সহরে, কেউ বা কলকাতায় ছুটল। জেলা থেকে হাজার হাজার টেলিগ্রাম গেল মন্ত্রীদের কাছে। লুঠতরাজ ও ডাকাতির কাল্পনিক অভিযোগ

আনা হ'ল সংগ্রামী কৃষকদের বিরুদ্ধে। কংগ্রেস নেতা নিশীথনাথ কুণ্ডু জোতদারদের এক প্রতিনিধি দল নিয়ে কলকাতায় রওনা হলেন।

জোতদারদের চাপে লীগ-সরকার পিছু হটল। গেজেটে প্রকাশিত হলেও তেভাগা বিলটি আইনসভায় উত্থাপিত হল না। তার বদলে এল নৃশংস দমন-পীড়ন। জেলার বিভিন্ন স্থানে ৩৫টি পুলিশ ক্যাম্প বসল। সেই ক্যাম্প থেকে গ্রামে গ্রামে সুরু হল পুলিশের ব্যাপক তাণ্ডব অভিযান।

পতিরাম-খাঁপুরেও আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। পতিরামে জোতদারের খামার থেকে ধানের পুঁজি ভেঙ্গে ভলান্টিয়াররা আধিয়ারের খোলানে ধান তুলে দেয়। পাশের গ্রাম খাঁপুরেও আন্দোলন বিস্তৃত হয়। খাঁপুরের সিংহকাছারীর জোতদার অত্যন্ত প্রভাবশালী। এই জোতদারের ধানের খামার ঘেরা ছিল না। খোলা খামারের ধান আধিয়ার কৃষকদের গরু খেয়ে ফেলায় জোতদারের হুকুমে তার বরকন্দাজরা গরু খোঁয়াড়ে নিয়ে যায়। আধিয়াররা সেই গরু ছিনিয়ে নেয়। জোতদার ক্ষিপ্ত হয়ে পুলিশ ডাকে। সতেরোজন আধিয়ার কৃষকের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা নিয়ে সশস্ত্র পুলিশ গ্রামে গিয়ে গ্রেপ্তার সুরু করে। এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ স্থানে ভলান্টিয়াররা বিপুল সংখ্যায় সমবেত হয়ে এই অন্যায় গ্রেপ্তারের প্রতিরোধ করে। বিরাট কৃষকবাহিনীর সম্মুখীন হয়ে পুলিশ ১২১ রাউণ্ড গুলি চালিয়ে ২২ জনকে হত্যা করে। ঐ এলাকার জেলা সংগঠক ছিলেন কমরেড কালী সরকার। খাঁপুরের ঐ ঘটনাস্থলে ঐদিনই এক বিরাট কৃষক সমাবেশ হয়। কমরেড অবনী লাহিড়ী ঐ সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন।

পুলিশ তখন খুনের নেশায় মাতাল। পরদিনই ঠাকুরগাঁর পশ্চিম অঞ্চলে ঠুমনিয়ায় গুলি চলল। কমরেড সুকুরচাঁদ ও তাঁর স্ত্রীসহ চারজন নিহত হলেন। খাঁপুর-ঠুমনিয়ায় এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ঠাকুরগাঁ সহরে কৃষকদের এক বিরাট সমাবেশ হয়। হঠাৎ মিছিল ও সমাবেশকে বেআইনী ঘোষণা করা হল। কোন সময় না দিয়ে এবং সতর্কীকরণ না করেই পুলিশ আবার শান্তিপূর্ণ মিছিল ও সমাবেশে গুলি চালালো। পাঁচজন কৃষক নিহত হলেন। কমরেড সৌরি ঘটককে জেলা থেকে বহিষ্কার করা হল। তিনি ঠাকুরগাঁ সহরে চাকরী করতেন এবং পার্টির গোপন যোগাযোগ কেন্দ্রের দায়িত্বে ছিলেন। দিনাজপুর সহর থেকে মহিলা নেত্রী কমরেড রাণী মিত্র (দাশগুপ্ত) ও বীনা গুহকে পার্টি থেকে ঠাকুরগাঁর কৃষক সমাবেশ উপলক্ষে পাঠানো হয়েছিল। পুলিশ তাঁদের সমাবেশ

স্থানে যেতে দেয়নি। ঠাকুরগাঁ শহর থেকে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। বহির্জগত থেকে সমস্ত সংগ্রামী এলাকাগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে দিল পুলিশ। কলকাতা থেকে ছাত্র-যুবক, ডাক্তার ও সাংবাদিকদের যে সৌভ্রাত্রমূলক প্রতিনিধিদল পাঠানো হ'ত মহিলা নেত্রীরাই তাঁদের সংগ্রামী এলাকাগুলিতে নিয়ে যেতেন। পুলিশ সে-পথ বন্ধ করে দিল। খাঁপুরে মেডিক্যাল মিশনকেও ঢুকতে দেওয়া হল না।

তারপর সুরু হল পুলিশের বাড়ি বাড়ি হানা। মারপিট, গ্রেপ্তার ও লুটপাট। পুলিশ আধিয়ার কৃষকদের বাড়ি থেকে ধান নিয়ে জোতদারদের বাড়িতে তুলে দিতে লাগল। মেয়েদের উপর চলল অমানুষিক অত্যাচার। কর্মীদের গ্রেপ্তার করতে না পেরে তাদের অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করার পরোয়ানা বের করল। এই অত্যাচারের মুখে সমস্ত প্রতিরোধই ভেঙ্গে পড়ল।

দমন-পীড়নের মধ্য দিয়েই উপস্থিত হ'ল সেই স্মরণীয় দিন। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট। গ্রামের গোপন-কেন্দ্র থেকে সুশীল সেনের নেতৃত্বে বেরিয়ে এল সবাই। দেশের মানুষের সঙ্গে আধিয়ার কৃষকরাও মিছিল বের করে স্বাধীনতা লাভের বিজয়-উৎসব পালন করল।

একত্রিশ

১৯৪৮ সালের কম্যুনিস্ট পার্টি কংগ্রেসে নেহরু সরকারকে উচ্ছেদের ডাক দিয়ে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাজ্যে রাজ্যে যে আন্দোলন সুরু হয়, তা' পৌঁছে গেল পঞ্চাশের দশকে। দেশের বিভিন্ন স্থানে সশস্ত্র লড়াই হল। লড়াই হল জমি নিয়ে, ফসল নিয়ে ক্ষেতে-খামারে। লড়াই হল মজুরী ও অধিকারের দাবীতে কলে-কারখানায়। কম্যুনিষ্ট পার্টির লড়াইয়ের সঙ্গে আরও অনেক লড়াই সুরু হল জনজীবনের বিভিন্ন দাবীর ভিত্তিতে।

১৯৪৯ সালে উদ্বাস্তু সমস্যা প্রকট হয়ে উঠেছে পশ্চিমবঙ্গে। হাজার হাজার উদ্বাস্তু এসে এ রাজ্যে আশ্রয় নিচ্ছে। তৎকালীন রাজ্য সরকার তখন পর্যন্তও উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে সঠিক কোন নীতি গ্রহণ করতে পারেনি। কিছু 'ডোল' অর্থাৎ কিছুটা ত্রাণের মাধ্যমে সমস্যার মোকাবিলার চেষ্টা করছে। শিয়ালদহ স্টেশন ও তার সংলগ্ন অঞ্চল শরণার্থীর ভীড়ে ভরে গিয়েছে। জানুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে

খাঁপুরে নিহত তিন শহীদ



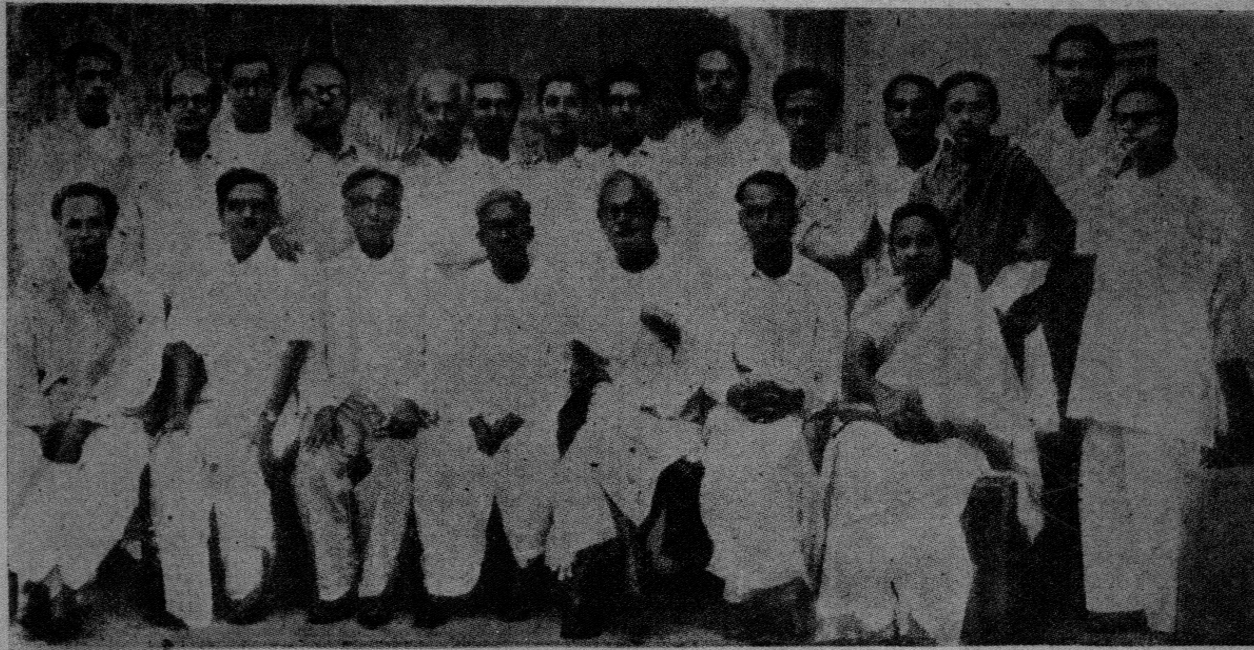
যশোদারাণী সরকার



নারায়ণ মুর্মু



ভবানী বর্মণ



বর্ধমান সম্মেলনে প্রমোদ দাশগুপ্ত রাজ্য সম্পাদক নির্বাচিত হবার পর (১৯৬১) ফেব্রুয়ারী) বসে ঃ (ডাইনে) মনিকুন্তলা সেন, বিনয় চৌধুরী, বঙ্কিম মুখার্জী, প্রমোদ দাশগুপ্ত, মুজফ্‌ফর আহমেদ, সরোজ মুখার্জী, সমর মুখার্জী। দাঁড়িয়ে ঃ জলি কল, মহম্মদ ইলিয়াস, জ্যোতি বসু, কানাই ভৌমিক, ভূপেশ গুপ্ত, রতনলাল ব্রাহ্মণ, বিশ্বনাথ মুখার্জী, ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত, জ্যোতি দাশগুপ্ত, মহম্মদ ইসমাইল, নিরঞ্জন সেন, রণেন সেন, সুশীতল রায়চৌধুরী ও হরেকৃষ্ণ কোঙার।

বিক্ষুব্ধ উদ্বাস্তুদের সামাল দিতে শিয়ালদহ চত্বরে পুলিশ লাঠি চালায়। টিয়ার গ্যাস ছোঁড়ে। বেশ কিছু উদ্বাস্তু আহত হয়। প্রতিবাদে গর্জে ওঠে ছাত্ররাই প্রথম।

১৯৪৯ সালের ১৮ই জানুয়ারী। উদ্বাস্তুদের উপর পুলিশের লাঠিচালনার প্রতিবাদে ছাত্ররা মিছিল নিয়ে অভিযান করে রাইটার্স বিল্ডিংস্ অভিমুখে। পুলিশ গুলি চালায়। চারজন মারা যায়। বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা আগুন ধরায় ট্রামে বাসে। ট্রাম তখনও বিলিতি কোম্পানী। ন'খানা ট্রাম পুড়ে ছাই হয়। পরদিন ১৯শে জানুয়ারী একই ভাবে মিছিল বের হয়। এই দিনের মিছিল ছিল আরও অশান্ত। পুলিশ আরও মারমুখী। পুলিশ আবার গুলি চালায়। মারা যায় আরও পাঁচজন। বিক্ষুব্ধরা এবার শুধু বিলিতি কোম্পানীর ট্রাম নয়, সরকারী বাসেও আগুন ধরায়। পুড়লো বাস। পুড়লো ট্রাম। অবস্থা আয়ত্বে আনতে সামরিক বাহিনীকে রাস্তায় নামানো হ'ল।

এর কিছুদিন পরেই আটক বন্দীদের মুক্তির দাবীতে এক মহিলা-মিছিল বের হ'ল। এই মিছিল বৌবাজার-কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে পৌঁছলে পুলিশ গুলি চালায়। চারজন মহিলা-নেত্রী নিহত হলেন। নিহতদের মধ্যে ছিলেন প্রখ্যাত কম্যুনিষ্ট নেতা রণেন সেনের স্ত্রী লতিকা সেন। বে-আইনী কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতা ভবানী সেন ডাক দিলেন: 'শেষ আঘাত হানো।' নির্দেশ গেল: 'জেলের মধ্য থেকেও অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে লড়াই করো।' জেলের মধ্যেও লড়াই সুরু হয়ে গেল। আটক বন্দীদের নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ গুলি চালালো। জেলের মধ্যেও নিহত হ'ল কয়েকজন।

পশ্চিমবঙ্গের এই উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে শাসকদল কংগ্রেসেও ভাঙ্গন দেখা দিল। দলের অন্যতম শীর্ষনেতা হেমন্তকুমার বসু কংগ্রেস ত্যাগ করলেন। হেমন্তকুমার বসু ছিলেন ফরোয়ার্ড ব্লকের বিশিষ্ট নেতা। ভারতের স্বাধীনতার সর্ত হিসাবে কংগ্রেস যখন দেশভাগ মেনে নেয় তখন দল হিসাবে ফরোয়ার্ড ব্লক কংগ্রেস থেকে বের হয়ে এলেও হেমন্তকুমার বসু কংগ্রেসেই থেকে যান। মন্ত্রী না হলেও তিনি কংগ্রেস পরিষদীয় দলের অতি উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তা সত্ত্বেও সরকারের উদ্বাস্তু নীতির প্রশ্নে হেমন্ত বসুর সঙ্গে দলের মতান্তর চলছিল। বৌবাজার ষ্ট্রীটে মহিলাদের উপর পুলিশের গুলিচালনায় হেমন্তকুমার বসুর মন একেবারে ভেঙ্গে গেল। ইতিমধ্যে কোরিয়া যুদ্ধে ভারত যখন আমেরিকার সঙ্গে

গাঁটছড়া বাঁধল তখন তাঁর সহ্যের সীমা অতিক্রম করে গেল। হেমন্তকুমার বসু কংগ্রেস ত্যাগ করলেন। বিধানসভার সদস্যপদেও ইস্তফা দিলেন। ইতিমধ্যে শরৎচন্দ্র বসুও কংগ্রেস ত্যাগ করে নতুন দল গঠন করলেন। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে উপ নির্বাচনে তাঁর জয়লাভকে কেন্দ্র করে বামপন্থীদের মধ্যে এক মোর্চা গঠনের ভিত্তি রচিত হল। পরবর্তীকালে হেমন্তকুমার বসুও উত্তর কলকাতা নির্বাচনে নির্দল প্রার্থী হিসাবে জয়লাভ করেন। এই দুই ক্ষেত্রেই রাজ্যের সব বামপন্থীরা শরৎচন্দ্র বসু ও হেমন্তকুমার বসুকে সমর্থন করে বাম ঐক্যের সূচনা করলেন। প্রকৃতপক্ষে এই রাজ্যে উত্তরকালের বাম ঐক্য, বাম মোর্চা, যুক্তফ্রন্ট বা বামফ্রন্টের ভিত্তি এই ভাবেই রচিত হয়েছিল।

১৯৪৯ সালে আর একটি দুঃসাহসী রাজনৈতিক সশস্ত্র ঘটনা ঘটল। 'আর-সি-পি-আই' দলের নেতৃত্বে এক দল সশস্ত্র বিপ্লবী তিনভাগে ভাগ হয়ে আক্রমণ করল দমদম বিমান বন্দর, দমদমের একটি অস্ত্র তৈরির কারখানা এবং জেসপ কারখানা। দমদম বন্দরে একটি বিমানে আগুন ধরানো হল। তিনজন খুন হল। সাতটি রিভলভার ছিনিয়ে নেয়া হল।

জেসপ্ কারখানায় তিনজন বিদেশীকে জ্বলন্ত ফার্নেস-এর মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়। এই সশস্ত্র বিপ্লবীরা গৌরীপুর পুলিশ ফাঁড়ি ও বসিরহাট থানাতেও হানা দেয়। এই সশস্ত্র আক্রমণের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন প্রমোদ দাশগুপ্তের বাল্যসঙ্গী ভাই পান্নালাল দাশগুপ্ত।

বত্রিশ

পঞ্চাশের দশক সুরু হতেই কম্যুনিষ্ট পার্টির আভ্যন্তরীণ লড়াই তীব্র হয়ে ওঠে। সাতশো-র বেশী কম্যুনিষ্ট নেতা জেলে বন্দী। অন্যরা বাইরে আত্মগোপন করে আছেন। জেলে বন্দী নেতাদের মধ্যে অনেকেই রণদিভে-ভবানী সেনের লাইনকে হটকারী লাইন বলে মনে করলেন। বন্দী নেতাদের মধ্যে মুজফ্ফর আহমেদ ছিলেন রণদিভে-লাইনের ঘোরতর বিরোধী। জেলের বাইরের নেতারা দুইভাগে বিভক্ত। হঠকারী লাইনের সঙ্গে যুক্ত ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত, মহম্মদ ইসমাইল, নৃপেন চক্রবর্তী এবং ভবানী সেন—যিনি আগেই 'শেষ আঘাত' হানবার আহ্বান জানিয়েছেন। বিরোধী মতের নেতৃত্বে ছিলেন রণেন সেন, জ্যোতি বসু, নিরঞ্জন

সেন, সরোজ মুখোপাধ্যায় ও প্রমোদ দাশগুপ্ত। জেলের মধ্য থেকেই মুজফ্ফর আহমেদ আব্দুল হালিমের মাধ্যমে নির্দেশ পাঠালেন পার্টির বামবিচ্যুতির বিরুদ্ধে সংগঠিত আভ্যন্তরীণ লড়াই স্থরু করার জন্য। সেই নির্দেশ অনুযায়ী জেলের বাইরে আত্মগোপনকারী কয়েকজন নেতা এক বৈঠকে মিলিত হয়ে গঠন করলেন 'পি-ও-সি'। রণেন সেন 'পি ও-সি'-র সম্পাদক হলেন। পার্টির বামবিচ্যুতির হটকারী লাইনের স্বরূপ তুলে ধরে একটি দলিল রচিত হল। সেই দলিলের প্রণেতা আব্দুল হালিম ও প্রমোদ দাশগুপ্ত। এই দলিল সাইক্লোস্টাইল করে বিলি করা হ'ল পার্টিকর্মীদের মধ্যে। পার্টির হটকারী লাইনের বিরুদ্ধে এই লড়াইয়ে প্রমোদ দাশগুপ্ত অসাধারণ নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। পার্টির পত্র-পত্রিকা বন্টনের মধ্য দিয়ে প্রমোদ দাশগুপ্ত যে সংযোগসূত্র স্থাপন করেছিলেন তার মাধ্যমেই তিনি এই দলিল পৌছে দিতে পেরেছিলেন সর্বত্র। প্রমোদ দাশগুপ্ত এই দ্বিতীয়বার পার্টির মতাদর্শগত লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিলেন, যদিও ভূমিকাটি ছিল কর্মীর। পি সি যোশীর আমলে পার্টির মধ্যে বুর্জোয়া ভাবধারার অনুপ্রবেশ রুখতে প্রমোদ দাশগুপ্ত ছিলেন প্রথম সারির যোদ্ধা। আবার, বিটি রণদিভে ক্ষমতাসীন হবার পর যে হটকারী সংকীর্ণতাবাদের নীতি গ্রহণ করা হয় তার বিরুদ্ধেও প্রমোদ দাশগুপ্ত ছিলেন প্রথম সারির যোদ্ধা। কিন্তু বেশীদিন বাইরে থেকে তিনি এই হটকারী লাইনের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে পারেন নি। ১৯৪৮-৪৯ সালে যাঁরাই দলের মধ্যে হটকারী লাইনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমেছেন তাঁরাই পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়ে যেতেন। এই সম্পর্কে 'গণশক্তি' পত্রিকায় প্রকাশিত স্নেহাংশুকান্ত আচার্যের 'কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্ত' শীর্ষক লেখাটি অনেক অকথিত তথ্যে ভরা। সেই '৪৮ থেকে '৫০ সাল পর্যন্ত পার্টির বিশিষ্ট কর্মী ও নেতাদের কীভাবে পার্টি থেকে বের করে দেওয়া হ'ত এবং কী ভাবে পার্টির অন্তর্দ্বন্দ্বে পার্টির নেতারা বিপদে পড়তেন, এমন কি পুলিশের হাতেও ধরা পড়তেন, তারই ইঙ্গিত আছে এই লেখাটিতে। তিনি লিখেছেন, "...এরপর আমার জীবনে এল একটা প্রকাণ্ড বড় বিপর্যয়। যখন পার্টি আবার বে-আইনী ঘোষিত হল তখন যে কয়জন প্রাদেশিক কমিটির সভ্য বাইরে ছিলেন তাঁদের মধ্যে আমি একজন। বাকী নেতারা বিনা বিচারে বন্দী ছিলেন এবং কিছু আত্মগোপন করে থাকতেন। তখন আমার বিরুদ্ধে একটা অপবাদ দিয়ে আমার উপর কন্ট্রোল কমিশন নিযুক্ত হল। সেই কন্ট্রোল কমিশন শেষ হল ১৯৪৮ সালে পূজার পরে। একদিন আমি জ্যোতি বসুকে নিয়ে (জ্যোতি বসু তখন আত্মগোপন করে আছেন) তাঁর

'ডাক' নিয়ে যাচ্ছি, জ্যোতি বসু বললেন 'একটু দাঁড়াও তো দেখি জরুরী কোন কাজ আছে কি না।' আমি তখন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের পিছনে একটা গ্যাসবাতির তলায় গাড়ি দাঁড় করালাম। জ্যোতিবাবু সেই আলোয় একটা কাগজ পড়ে আমাকে বললেন, 'স্নেহাংশু, তুমি এবার পার্টি থেকে বিতাড়িত হতে চলেছ।' আমি তখন জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি ব্যাপার?' তখন জ্যোতি বসু বললেন, 'তোমাকে কন্ট্রোল কমিশন ছেড়ে দিয়েছে, কিন্তু এই চিঠিতে দেখা যাচ্ছে যেন ঐ সংবাদ প্রচার করা না হয় এবং এই খবরটা চাপা দিতে হবে এবং স্বাক্ষর করেছেন 'রবি' অর্থাৎ কমরেড ভবানী সেন। তিনি তখন পি-বি সদস্য ও আমাদের প্রাদেশিক কমিটিরও সম্পাদক। পরে মহম্মদ ইসমাইল সম্পাদক হন।

"তার পরের ঘটনা : ১৯৪৯ সালের জানুয়ারী মাসে আমাকে বহিষ্কার করা হয় এবং যে সব অভিযোগ কন্ট্রোল কমিশনের সামনে ছিল, সেই অভিযোগে নয়, একেবারে নতুন করে বানানো অভিযোগ তৈরি করে আমাকে পার্টি থেকে বের করে দেওয়া হয়। এই ঘটনার কিছুদিন পরে কমরেড মুজফ্ফর আহমেদ জেলে যাবার আগে আমার বাড়িতে এসে খাওয়া দাওয়া সেরে চলে যান। আগেই কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্ত আমাকে বলে রেখেছিলেন, কাকাবাবু ও দু'একজন ছাড়া-পাওয়া নেতাকে আবার দিনদশেকের মধ্যে ধরা হ'বে। কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্ত আমাকে বলেছিলেন ঐ খবরটা অন্যান্য কমরেডদের পৌঁছে দিতে হবে। এই খবর পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল এবং অনেকে গা-ঢাকা দিয়েছিলেন। প্রমোদবাবুর মতে কমরেড মুজফ্ফর আহমেদ বাইরে থাকলে আমাকে কতকগুলি মিথ্যা অভিযোগে বহিষ্কার করা হোত না।

"এরপর একদিন অনেক রাতে আমার বাড়িতে জ্যোতি বসু এবং কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্ত এসে হাজির হলেন। কিন্তু তখন আমি পার্টি থেকে বহিষ্কৃত এবং তাঁরা আমাকে জানালেন যে তাঁদের জন্য একটা ভাল গোপনীয় স্থান জোগাড় করে দিতে হ'বে। কারণ, তাঁরা আশঙ্কা করছিলেন যে পার্টির অন্তর্দ্বন্দ্বে তাঁরা আবার বিপদে পড়বেন এবং আমি তার ব্যবস্থাও করে দিয়েছিলাম।"

প্রকৃতপক্ষে কম্যুনিষ্ট পার্টির অনেক নেতাই তখন দ্বিমুখী আক্রমণে নাজেহাল। একদিকে পার্টির অন্তর্দ্বন্দ্বে তাঁরা আক্রান্ত—কমরেড "রবি"র নির্দেশে তখন কে কেউ যে কোন শাস্তির সম্মুখীন হতেন, অন্যদিকে পুলিশের গ্রেপ্তারের জাল—

পুলিশ আঁতিপাঁতি করে খুঁজে বেড়াতো আত্মগোপনকারী নেতাদের। এই অবস্থার মধ্যেও কম্যুনিষ্ট পার্টি, বিশেষ করে প্রমোদ দাশগুপ্ত পার্টির পত্রিকা ও প্রচারপত্র প্রকাশের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। 'দৈনিক স্বাধীনতা' পত্রিকা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সাপ্তাহিক আকারে বের হত। পরিচালনা করতেন নৃপেন চক্রবর্তী, সুধাংশু দাশগুপ্ত, আব্দুল্লা রসুল, অরুণ রায় প্রমুখ। '৪৮-'৪৯ সালে আরও অনেকগুলি পত্রিকা নানাভাবে বের করা হয়। এগুলির নাম ছিল 'সংবাদ', খবর', 'মধ্যবিত্ত' 'শিবির' ইত্যাদি। এই সব পত্রিকার পরমায়ু সরকারী আক্রমণে পাঁচদিন থেকে সাতদিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এই দুর্যোগের সময়ে সর্বশেষ যে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় তার নাম ছিল 'মতামত'। এর সম্পাদক ছিলেন প্রথমে মুজফ্ফর আহমেদ, পরে মনসুর হবিবুল্লা।

জোয়ার ভাঁটার টানে কম্যুনিষ্ট পার্টি পৌছলো ১৯৫০ সালে। পার্টির নীতি নিয়ে বিভ্রান্তি তখন চরমে। ঠিক এই সময়েই মস্কো থেকে প্রকাশিত 'কমিনফর্ম'-এর মুখপত্র 'ফর লাস্টিং পীস ফর এ পিপলস্ ডিমোক্রেসী' পত্রিকায় একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই নিবন্ধে কম্যুনিষ্ট পার্টির মধ্যেকার হটকারী লাইনের ভুল তুলে ধরা হয়। চারজন শীর্ষ নেতা ছুটে যান মস্কোতে। সাক্ষাৎ করেন স্টালিন ও মলোটভের সঙ্গে। এস এ ডাঙ্গের মুখে শোনা এই সাক্ষাৎকারের বিবরণ এখানে তুলে ধরছি।

ডাঙ্গে বলেছেন, "১৯৫০ সালে ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির পক্ষ থেকে চারজন মস্কো যান স্টালিনের সঙ্গে আলোচনার জন্য। এই চারজন হলেন, অজয় ঘোষ, রাজেশ্বর রাও, বাসব পুন্নাইয়া ও আমি। স্টালিনকে বলা হয় যে, ভারতবর্ষে আমরা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পথ নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলাম, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছি। এখন করণীয় কি? তিনি (স্টালিন) প্রশ্ন করেন, 'আপনাদের হাতে অস্ত্র, বিশেষ করে রাইফেল কত ছিল?' আমরা উত্তরে বলি, দু'শোর মতো হবে। স্টালিন পাশে উপস্থিত এক রুশনেতাকে প্রশ্ন করেন, '১৯১৭ সালের জুন মাসে লেনিন যখন জুন-অভ্যুত্থান-এর পরিকল্পনা করেন তখন বলশেভিকদের হাতে কত রাইফেল ছিল?' পাশে বসা রুশনেতা জবাব দেন 'দুই লক্ষেরও বেশী।' স্টালিন হেসে বলেন, 'লেনিন দুই লক্ষ রাইফেল হাতে থাকতেও বিপ্লব স্থগিত রেখেছিলেন অস্ত্র ঘাটতির কারণে। আর আপনারা দুশো রাইফেল নিয়ে বিপ্লব সুরু করে দিলেন?' মস্কো আলোচনায় যা হবার তা' হল।

মস্কো থেকে ফিরে অতি গোপনে একটি দলিল প্রচার করা হল। দলিলের বিষয় ছিল মস্কোর নির্দেশ ও পার্টির ইতিকর্তব্য। এই দলিল প্রচারিত হবার পরই নেতৃত্বের যে অংশ জোয়ারে ছিলেন, তাঁরা ভাঁটার টানে পড়লেন। ১৯৪১ সালের ৩১ শে মে তারিখে কম্যুনিষ্ট পার্টির নতুন নীতি ঘোষণা করে হটকারী লাইন বর্জন করা হয়। ১৯৫১ সালের ১১ই থেকে ১৫ই অক্টোবর কলকাতায় অনুষ্ঠিত হল কম্যুনিষ্ট পার্টির সর্বভারতীয় সম্মেলন। এর আগেই স্নেহাংশুকান্ত আচার্য রিট-আবেদন মারফত আটক কম্যুনিষ্ট নেতাদের অনেককেই মুক্ত করেন। আত্মগোপন অবস্থায় প্রমোদ দাশগুপ্ত, জ্যোতি বসু, আব্দুল হালিম প্রমুখ যাঁরা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন তাঁরা মুক্তি পান। পরবর্তী পর্যায়ে হাইকোর্টের এক রায়ে পার্টি বৈধ ঘোষিত হয়। যাঁরা আত্মগোপন করে ছিলেন, তাঁরা প্রকাশ্যভাবে পার্টির কাজে ফিরে আসেন।

কম্যুনিষ্ট পার্টির কলকাতা সম্মেলনে বিরাট ওলট-পালট হয়ে গেল। বি টি রণদিভের জায়গায় পার্টির সাধারণ সম্পাদক হলেন অজয় ঘোষ। বি টি রণদিভে গঙ্গাধর অধিকারী সহ অনেককেই পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হল। বহিষ্কৃত হলেন পশ্চিমবঙ্গেরও অনেকে, যাদের মধ্যে একজন ভবানী সেন।

তেত্রিশ

১৯৫১ সালের শেষ দিকে কম্যুনিষ্ট পার্টি যখন বৈধ ঘোষিত হয়নি এবং নেতারা অনেকেই জেলে, তখনই দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচনের তোড়জোড় সুরু হয়ে যায়। দেশ স্বাধীন হবার পর এই-ই প্রথম সাধারণ নির্বাচন। ৫১ সালের অক্টোবর মাসের সুরু থেকেই কংগ্রেস-বিরোধী দলগুলির মধ্যে জোট বাঁধার কথাবার্তা সুরু হয়। কিন্তু তখন কম্যুনিষ্ট পার্টির সঙ্গে মোর্চা বা সমঝোতা তৈরি করা অপেক্ষা কম্যুনিষ্ট পার্টিকে একঘরে করার দিকে কংগ্রেস বিরোধী দলগুলির ঝোঁক ছিল বেশী। কম্যুনিষ্ট পার্টির যুদ্ধকালীন ভূমিকা, সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে মূল্যায়ন এবং ১৯৪৮ সালের পর দু'তিন বছর কম্যুনিষ্ট পার্টির হটকারী লাইন সম্পর্কে সেদিনের অ-কম্যুনিষ্ট বিরোধী দলগুলির মধ্যে অধিকাংশই ছিল নীতির দিক দিয়ে কাছাকাছি। সেদিনের এই বিরোধী দলের বেশীর ভাগই কংগ্রেস থেকে সদ্য বেরিয়ে আসা। কংগ্রেস দল বা নীতির সঙ্গে এদের যত বিরোধ ছিল

তার চেয়েও বেশী বিরোধ ছিল ব্যক্তি সম্পর্কে। অর্থাৎ, কংগ্রেস ভাল, কিন্তু নেহরু ভাল নয়। আচার্য কৃপালনী এই কারণেই কংগ্রেস বিরোধী হয়েছেন। একই ভাবে বিধানচন্দ্র রায় এবং প্রফুল্লচন্দ্র সেনের উপর গোসা করে বিরোধী হয়েছেন প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ, সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। শরৎচন্দ্র বসুর সঙ্গে যারা কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসেছেন তাঁরাও একই পথের পথিক। এই সব দলের কংগ্রেস সম্পর্কে ক্ষোভ ছিল, রাগ ছিল, কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশী বিদ্বেষ এবং বিরোধিতা ছিল কম্যুনিষ্ট পার্টি সম্পর্কে। তখন বামপন্থী দল বলে পরিচিতদের মধ্যে আর-এস-পি, আর-সি-পি-আই, এস-ইউ-সি দলের প্রভাব ছিল নিতান্তই সীমিত। প্রভাবশালী দল বলতে তখন রাজ্যে কম্যুনিষ্ট পার্টি, ফরওয়ার্ড ব্লক, পি-এস-পি এবং এস-আর-পি। ফরওয়ার্ড ব্লক দলের মধ্যে আবার দুইটি সমান শক্তিশালী মত ছিল। মার্কসবাদ ও সুভাষবাদকে কেন্দ্র করে একটি ভাঙন-পর্ব এই দলের মধ্যে সুরু হয়ে গিয়েছে। এই সময় ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর নেতৃত্বে জনসংঘ রাজ্যে বেশ প্রভাবশালী দল। সব মিলিয়ে কংগ্রেস বিরোধী শক্তি বলতে তখন কোন জোট ছিলনা। জোট গঠনের সম্ভাবনাও ছিল না।

কিন্তু এর মধ্যেই একটি উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক ঘটনা ঘটল। কম্যুনিষ্ট পার্টির সঙ্গে ফরওয়ার্ড ব্লকের এক বৈঠক হয় এবং ১৯৫১ সালের ২১শে ডিসেম্বর জ্যোতি বসু এবং অশোক ঘোষ এক যুক্ত বিবৃতিতে ঘোষণা করলেন যে কম্যুনিষ্ট পার্টি এবং ফরওয়ার্ড ব্লক যুক্তভাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। এই দুই দলের মধ্যে রাজনৈতিক বৈরিতা ছিল সব চাইতে বেশী। নির্বাচনে এই দুই দল ঐক্যবদ্ধ ভাবে লড়াই করবে এই ধারণা অনেকের কাছেই অভাবনীয় ছিল।

কম্যুনিষ্ট পার্টির পক্ষ থেকে সত্তর জন প্রার্থী দেওয়া হল। ৩রা জানুয়ারী থেকে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত এই নির্বাচন চলেছিল। নির্বাচনে কংগ্রেস বিপুল ভাবে জয়ী হল সত্য, কিন্তু প্রথম নির্বাচনেই কংগ্রেস দলকে নাস্তানাবুদ হতে হল।

১৯৫২ সাল পর্যন্ত বিধানসভায় বিরোধী সদস্যের সংখ্যা ছিল মাত্র উনিশ। এই উনিশ জনের মধ্যে মাত্র দুজন ছিলেন কম্যুনিষ্ট পার্টির। জ্যোতি বসু ও রতনলাল ব্রাহ্মণ। আট জন ছিলেন ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের কৃষক-প্রজা-মজদুর দলের। ১৯৫২-র নির্বাচনের পর এই চেহারা অনেক পালটে গেল। বিরোধী সদস্যের সংখ্যা পৌছল ৯৫-তে। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী সত্যপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে জয়ী হলেন মাত্র চার হাজার ভোটের ব্যবধানে।

তাঁর মন্ত্রিসভার মাত্র চারজন মন্ত্রী জয়ী হলেন। সাতজন মন্ত্রী মর্মান্তিক ভাবে পরাজিত হলেন। পরাজিত মন্ত্রীরা হলেন প্রফুল্লচন্দ্র সেন, ভূপতি মজুমদার, নিকুঞ্জবিহারী মাইতি, নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, কালিপদ মুখোপাধ্যায়, হরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী এবং বিমলচন্দ্র সিংহ।

১৯৫২ সালের নির্বাচন-মোকাবিলায় বলতে গেলে কোন শক্তি তখন কম্যুনিষ্ট পার্টির ছিলনা। দলের মধ্যে তুই লাইনের ঝগড়ার জের তখনও মেটেনি। তিন-চার বছর জেলে থেকে দলের নেতারা সবে মাত্র জেল থেকে বেরিয়েছেন। অনেক নেতাকেই মুক্তি পেতে হয় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সর্তে।

প্রমোদ দাশগুপ্ত ১৯৫১ সালে জেল থেকে বেরিয়ে এসে কোনদিকে দৃকপাত না করে আত্মনিয়োগ করলেন 'স্বাধীনতা'-র পুনঃ প্রকাশের কাজে। ১৯৫১ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী থেকে 'স্বাধীনতা'-র পুনঃ প্রকাশ সুরু হল। ১৪ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হ'ল সম্পাদকীয় বোর্ড। 'স্বরাজ' পত্রিকার প্রেস সহ সমস্ত যন্ত্রপাতি কিনে নেওয়া হয়েছে। এসবই করেছেন প্রমোদ দাশগুপ্ত, সরোজ মুখোপাধ্যায় ও জ্যোতি বসু। ৬৪ নম্বর লোয়ার সার্কুলার রোডে আব্দুল করিমের বাড়ি ভাড়া নিয়ে দোতলায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পার্টি-দপ্তর। পাঁচখানা ঘরে পার্টির দপ্তর। তার মধ্যে এক ফালি জায়গায় থাকেন প্রমোদ দাশগুপ্ত। পার্টি দপ্তর, পার্টি পত্রিকা আর প্রমোদ দাশগুপ্ত একাত্ম হয়ে গিয়েছেন।

১৯৫২ সালের নিৰ্বাচনে 'স্বাধীনতা' পত্রিকা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তখন দেশের বড় কাগজগুলিতে কম্যুনিষ্ট পার্টি ছিল অচ্ছুৎ। কম্যুনিষ্ট পার্টি ও তার নেতাদের যদি কখনও উল্লেখ করার প্রয়োজন হ'ত, তা হত নিন্দা এবং বিদ্রূপ সমালোচনার উদ্দেশ্যেই। ১৯৫২-র নির্বাচনে কম্যুনিষ্ট পার্টির যে বিরাট অগ্রগতি ঘটল তার অন্যতম কারণ প্রমোদ দাশগুপ্তের অসাধারণ সংগঠন শক্তি। এই নির্বাচনের পরেই রাজ্যদপ্তরে বসে একদিকে যেমন সর্বস্তরের জেলা নেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হলেন, অন্যদিকে স্বীকৃতি পেলেন রাজ্যদলের শীর্ষ নেতাদের কাছ থেকে তাঁর সংগঠন শক্তির কারণে।

চৌত্রিশ

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রথম সাধারণ নির্বাচনে জয়ী হয়ে যে মন্ত্রিসভা গঠন করলেন তা'তে দুইজন পরাজিত মন্ত্রীকে অন্তর্ভূক্ত করলেন। এঁদের একজন হলেন আরামবাগে ফরওয়ার্ড ব্লকের রাধাকৃষ্ণ পালের কাছে পরাজিত প্রফুল্লচন্দ্র সেন। নতুন মন্ত্রিসভায় তিনি হলেন খাদ্যমন্ত্রী। আগের মন্ত্রিসভাতেও তিনি খাদ্যমন্ত্রী ছিলেন।

বিরোধী বামপন্থীরা নতুন কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেন। খাদ্য-আন্দোলন সুরু করলেন। ১৯৫২ সালের ১৬ই জুলাই খাদ্যের দাবীতে বিধানসভা অভিযান পরিচালিত হল। রাজভবনেব সামনে জনতার উপর পুলিশ লাঠি চালানো। কাঁদুনে গ্যাস ছুড়ল। শতাধিক ব্যক্তি আহত হল। গ্রেপ্তার হলেন হেমন্ত বসু, ডাঃ সুরেশ ব্যানার্জী, শ্রীমতী লীলা রায়, যতীন চক্রবর্তী প্রমুখ। পুলিশের লাঠি চালনা ও নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ১৭ই জুলাই বারো ঘণ্টার হরতাল প্রতিপালিত হল।

১৯৫৩ সালে আবার খাদ্য আন্দোলন। আবার গ্রেপ্তার ও পুলিশের লাঠি চালনা। ১৯৫৩-র ২৯শে সেপ্টেম্বর দেউলটি স্টেশনে পুলিশের গুলিতে নিহত হলেন অন্নদা দলুই। এই ১৯৫৩ সালেই আন্দোলনের ক্ষেত্রে বাম-ঐক্য সম্প্রসারিত হল।

এতদিন বামপন্থীরা দুই সংস্থায় ভাগ হয়ে খাদ্য আন্দোলন পরিচালনা করতেন। ফরওয়ার্ড ব্লক ও আর-এস-পি দলের নেতৃত্বে গঠিত হয়েছিল দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি। কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে ছিল খাদ্য অভিযান কমিটি। এই দুই সংস্থার যুক্ত বৈঠকে গঠিত হ'ল সংযুক্ত দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি। হেমন্ত কুমার বসু এই কমিটির আহ্বায়ক নির্বাচিত হলেন। খাদ্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে গঠিত এই যুক্ত আন্দোলন কমিটি রাজ্যে সব আন্দোলনেরই নেতৃত্ব গ্রহণ করে।

১৯৫৩ সাল বাম-আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটি স্মরণীয় বছর। এই বছরের ১লা জুলাই থেকে কলকাতার ট্রাম কোম্পানী দ্বিতীয় শ্রেণীর ট্রামভাড়া এক পয়সা বৃদ্ধি করল। ট্রামভাড়া বৃদ্ধির প্রতিরোধে বামপন্থীরা সর্বশক্তি নিয়ে আন্দোলনে নামলো। ৩রা জুলাই থেকে প্রতিরোধ আন্দোলন সুরু হ'ল। প্রথম দিনেই পুলিশ গ্রেপ্তার করল জ্যোতি বসুকে এবং ৫৮৮ জন আন্দোলনকারীকে। ৫ই জুলাই

মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় চোখের চিকিৎসার জন্য বিদেশ রওনা হলেন। রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব এল প্রফুল্লচন্দ্র সেন ও কালিপদ মুখোপাধ্যায়ের উপর। বাম-পন্থীদের আন্দোলনের গতিবেগও বেড়ে গেল। ১৫ই জুলাই থেকে আন্দোলন এমন পর্যায়ে চলে গেল যে শান্তি রক্ষার জন্য সরকারকে সামরিক বাহিনীর সাহায্য নিতে হল। কিন্তু কোন ক্রমেই ট্রামভাড়া বৃদ্ধির এই প্রতিরোধ আন্দোলনকে দমন করা সম্ভব হলনা। ১৮ই জুলাই এক বৈঠকে মন্ত্রিসভা ট্রামভাড়া বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখলেন এবং একটি ট্রাইবুন্যাল গঠন করলেন। সরকারকে নতি স্বীকার করিয়ে বামপন্থীরা বাম-আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য জয়লাভে সক্ষম হল।

সরকার কিন্তু আন্দোলনের ক্ষেত্রে নতি স্বীকার করলেও আন্দোলনের আটক নেতাদের জেল থেকে ছেড়ে দিলেন না। কলকাতা থেকে ১৪৪ ধারাও প্রত্যাহার করলেন না। আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় সুরু হল। ১৪৪ ধারা অমান্যের আন্দোলন।

কলকাতায় মনুমেণ্ট ময়দানে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের জন্য বামপন্থী দলের প্রায় ৫০০ কর্মী সমবেত হলেন। একটি সভা সুরু হল। সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফাররাও সংবাদ সংগ্রহ ও চিত্র গ্রহণের জন্য উপস্থিত ছিলেন। সভা সুরু হতেই ট্রাক ভর্তি পুলিশ মেয়ো রোড ধরে এসে সভা আক্রমণ করল। সমবেত জনতার উপর নির্বিচারে লাঠি চলল ও কর্তব্যরত সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফারদের উপর নির্মমভাবে লাঠি চালানো হল। সাংবাদিকদের শরীর রক্তাক্ত হল। ফটোগ্রাফাররা নৃশংস ভাবে প্রহৃত হলেন। তাঁদের ক্যামেরা কেড়ে নিয়ে ভেঙ্গে ফেলা হল। ১৮ জন সাংবাদিক আহত হলেন। তাঁদের মধ্যে কয়েক জনের আঘাত ছিল গুরুতর। সাংবাদিকদের অনেকে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হলেন। সাংবাদিকদের উপর পুলিশের এই আক্রমণের খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবার পর সারাদেশে ধিক্কার ধ্বনি উঠল। আনন্দবাজার পত্রিকার প্রখ্যাত সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার 'কেলোর কীর্তি' নামে এক সম্পাদকীয় লিখে পুলিশ মন্ত্রী কালিপদ মুখোপাধ্যায়ের স্বরূপ তুলে ধরলেন। যদিও এই সম্পাদকীয় লেখার ফলে পরবর্তীকালে তাঁকে আনন্দবাজার পত্রিকার চাকরী হারাতে হয়েছিল। কিন্তু আনন্দবাজার সহ সমস্ত পত্রিকায় সেদিন সাংবাদিক নিগ্রহের সচিত্র বিবরণ প্রকাশিত হবার পর মন্ত্রীদের সশস্ত্র পুলিশ পাহারা ছাড়া ঘরের বাইরে বের হবার উপায় ছিলনা।

১৯৫৩ সালের ২৩শে জুলাই সরকারকে আর একবার নতি স্বীকার করতে হল। কলকাতা থেকে ১৪৪ ধারা প্রত্যাহৃত হল এবং সাংবাদিক নিগ্রহের ব্যাপারে একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হল।

বামপন্থীদের এই জয়ের পেছনে সেদিন বিশেষ চালিকা শক্তি হিসাবে কাজ করেছিল 'স্বাধীনতা' পত্রিকা। যে পত্রিকার প্রাণপুরুষ ছিলেন প্রমোদ দাশগুপ্ত। কম্যুনিষ্ট পার্টি এবং তার নেতা ও কর্মীরা অন্যান্য দলের সহযোগিতায় পুরোভাগে থেকে আন্দোলন পরিচালনা করেন।

কম্যুনিষ্ট পার্টির মধ্যে এই সময়ে বেশ কয়েকটি পরিবর্তন ঘটে। ১৯৫৩ সালে কম্যুনিষ্ট পার্টির রাজ্য-সম্মেলনে জ্যোতি বসুকে দলের সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়। সম্পাদক নির্বাচিত হন মুজফ্ফর আহমেদ, নিরঞ্জন সেন ও প্রমোদ দাশগুপ্ত। প্রমোদ দাশগুপ্ত জেল থেকে মুক্তি পাবার পর থেকেই পার্টির নেতৃত্বের প্রথম সারিতে এসে যান। ১৯৫৩ সালে রাজ্য কমিটির সম্পাদক হয়ে দায়িত্ব পালনের দলীয় স্বীকৃতি পেলেন।

এই সময়ে পার্টির মধ্যে রাজনৈতিক প্রশ্ন এবং বিভিন্নমুখী চিন্তার প্রসার ঘটে। প্রশ্নটি ছিল: ন্যাশনাল ফ্রন্ট না ডিমোক্রেটিক ফ্রন্ট? পার্টির চিঠিতে, বিশেষ করে রাজনৈতিক ফোরাম-এর নামে বেশ কিছু বক্তব্য প্রকাশিত হয়। এই সম্পর্কে স্টালিনের মূল্যায়ন নিয়েও বেশ একটি বিতর্কের সৃষ্টি হয়। প্রমোদ দাশগুপ্ত ছিলেন স্টালিনের অবমূল্যায়নের বিরোধী। স্টালিনকে উপযুক্ত মর্যাদা দেবার পক্ষে। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি স্টালিন সম্পর্কে নিজের মনোভাব পরিবর্তন করেন নি। এই প্রশ্নে কারও সঙ্গে আপোষও করেন নি। অনেক পরে কলকাতায় রুশ কনসালের বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে খাবার টেবিলে স্টালিন প্রসঙ্গটি ওঠে এবং রুশ নেতার মন্তব্যে তিনি খাবার টেবিল ত্যাগ করে চলে আসেন।

১৯৫৩ সালের ২৭শে ডিসেম্বর থেকে মাদুরাই-এ কম্যুনিষ্ট পার্টির তৃতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হল। মাদুরাই পার্টি কংগ্রেসে জ্যোতি বসু প্রথম কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হলেন। পলিটব্যুরোর সদস্য ছিলেন ডাঃ রণেন সেন।

১৯৫৪ সালের শিক্ষক আন্দোলনের জন্য বিশেষভাবে চিহ্নিত সাল। রাজপথে নামলেন রাজ্যের গুরুকুল। কিন্তু পুলিশ তাঁদেরও রেহাই দিল না। পুলিসী

বর্বরতার শিকার হলেন শিক্ষকরা। কিন্তু শুধু শিক্ষকদের উপরেই এই বর্বরতা সীমাবদ্ধ রইল না। রাজনৈতিক দলের উপরও আক্রমণ সুরু হল। বামপন্থী নেতাদের ব্যাপকভাবে গ্রেপ্তার সুরু হল। অনেকে আত্মগোপন করলেন। জ্যোতি বসুকে গ্রেপ্তার করার জন্য পুলিশ সারা সহর তোলপাড় করে। একদিন রাত্রে ডাঃ নারায়ণ রায়ের গাড়িতে ফেরার পথে জ্যোতি বসু পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন। সেই গাড়িতে বঙ্কিম মুখার্জী এবং অমর বসুও ছিলেন। সাতজন শিক্ষক পুলিসী বর্বরতার শিকার হয়েছিলেন।

১৯৫৫ সালে রাজ্য কম্যুনিষ্ট পার্টির চীনের কম্যুনিষ্ট পার্টির সঙ্গে যোগাযোগের একটি বিশেষ সুযোগ ঘটল। ১৯৫৫ সালের মে মাসে 'মে দিবস'-এর অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য জ্যোতি বসু চীনদেশে যান এবং চৌ-এন-লাই সহ অনেক চীন কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে দেশে ফিরে আসেন। অবশ্য এর আগে কয়েকজন কম্যুনিষ্ট নেতা চীনে গিয়েছেন।

১৯৫৬ সালে অনুষ্ঠিত রাজ্য কম্যুনিষ্ট পার্টির সম্মেলনের সংগঠন ও প্রস্তুতির প্রধান নেতা ছিলেন প্রমোদ দাশগুপ্ত। রাজ্য সম্মেলনের প্রতিটি প্রস্তাবের রচনা থেকে সুরু করে ব্যবস্থাপনার সব দায়িত্ব ছিল প্রমোদ দাশগুপ্তের হাতে। দলের প্রতিষ্ঠিত স্বীকৃত নেতা তিনি তখন ছিলেন না বটে, কিন্তু দলের মধ্যে বিশেষ একটি চিন্তা ও ভাবধারার চাবিকাঠি প্রমোদ দাশগুপ্তের হাতে এসে গিয়েছে।

১৯৫৭ সালের পার্টি সম্মেলনেও জ্যোতি বসুকে রাজ্য দলের সম্পাদক রাখা হল, যদিও জ্যোতি বসু রাজ্য-সম্পাদকের দায়িত্ব নিতে মোটেই রাজী ছিলেন না। তাঁর যুক্তি ছিল, পরিষদীয় দলের কাজে তাঁকে যে পরিমাণে সময় দিতে হয়, তারপর পার্টি-সম্পাদকের কাজ পরিচালনা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু সেদিন জ্যোতি বসুকেই সম্পাদকের দায়িত্ব নিতে হ'ল খানিকটা স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য। কারণ, সম্পাদকের পরিবর্তন করতে গেলেই বেশ কয়েকটি মুখ সামনে আসত যাঁদের সম্পাদক করার পক্ষে মুজফ্‌ফর আহমেদ, প্রমোদ দাশগুপ্ত, নিরঞ্জন সেন, হরেকৃষ্ণ কোঙার—কারও মত ছিল না। তবে, জ্যোতি বসু সম্পাদকের পদ গ্রহণের আগে সবাইকে চুক্তিবদ্ধ করিয়ে নিয়েছিলেন যে পরবর্তী সম্মেলনে নিশ্চিতভাবে নতুন সম্পাদক নির্বাচিত করা হবে। জ্যোতি বাবুর হাতে রাজ্যদলের সম্পাদকের দায়িত্ব রাখার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল এই যে, কয়েকমাস পরই রাজ্য বিধান সভার সাধারণ নির্বাচন; সেই নির্বাচনে

দল বেশ কিছু সাফল্যের আশা রাখে। তাই নির্বাচনের ঠিক আগেই নতুন কারও হাতে রাজ্যদলের কর্তৃত্ব দেওয়া অপেক্ষা জ্যোতিবাবুর হাতেই কর্তৃত্ব রাখা ছিল অনেক বেশী নিরাপদ।

পঁয়ত্রিশ

১৯৫৭ সাল এসে গেল। রাজ্য-রাজনীতির একটা মোড় ফেরার বছর। ১৯৫৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে রাজ্যের বামপন্থী দল সর্বপ্রথম বিকল্প সরকারের ডাক দিল। কংগ্রেস-বিরোধী শক্তি যে বিকল্প সরকারের ডাক সেদিন দিয়েছিল, তার প্রবক্তা ও চিন্তানায়ক ছিলেন প্রমোদ দাশগুপ্ত। সেদিন রাজ্য বিধান সভায় কংগ্রেস দল এবং বিরোধী দলের তুলনামূলক শক্তির বিচারে বিকল্প সরকারের ডাক ছিল অবাস্তব। প্রমোদ দাশগুপ্তই সর্বপ্রথম পার্টির মধ্যে বোঝালেন যে বিগত পাঁচ বছর জনগণের মধ্যে আন্দোলন এবং পরিষদীয় রাজনীতিতে কংগ্রেস বিরোধী শক্তি যেখানে পৌঁছেছে সেখানে বিকল্প সরকারের ডাক দেওয়া ছাড়া মানুষের কাছে নতুন কিছু বলার নেই। এই বিকল্প সরকারের ডাক দেওয়ার পক্ষে প্রধান সহায়ক হিসাবে কাজ করেছিল কংগ্রেস-বিরোধী শক্তির ঐক্য। কম্যুনিষ্ট পার্টির মধ্যেও বিকল্প সরকারের ডাক দেওয়ার প্রশ্নে বেশ বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল। কারও কারও মতে বিকল্প সরকারের স্লোগান ছিল 'ইউটোপিয়ান'। কিন্তু প্রমোদ দাশগুপ্ত কোন বিরূপ বক্তব্য বা বিদ্রূপকে আমল না দিয়ে দলীয় কর্মীদের 'বিকল্প সরকার' ধ্বনির তাৎপর্য বোঝাতে লাগলেন। প্রকাশ্য জনসভায় সেই সময় তিনি বক্তৃতা দিতেন না বললেই চলে। কিন্তু দলীয় কর্মিসভায়, ঘরোয়া সভায় 'বিকল্প সরকার' ধ্বনির পক্ষে কর্মীদের বক্তব্য প্রস্তুত করে দিতেন। ১৯৫৭ সালের নির্বাচনে প্রমোদ দাশগুপ্তকে নির্বাচন পরিচালনায় সর্বময় সাংগঠনিক কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছিল।

১৯৫৭-র নির্বাচনের দিন ঘোষিত হল। ১লা মার্চ থেকে শুরু হয়ে ৩১শে মার্চ পর্যন্ত নির্বাচন চলবে। '৫৭ সালের নির্বাচনে 'বিকল্প সরকার' ধ্বনির পেছনে ঐক্যবদ্ধ হলেন কম্যুনিষ্ট পার্টি, ফরওয়ার্ড ব্লক ও পি-এস-পি। এই ঐক্য বা সমঝোতার বাইরে ছিল আর-এস-পি সহ অন্য দু'একটি দল। বরানগর কেন্দ্রে জ্যোতি বসু বার-এ্যাট-ল-র বিরুদ্ধে যেমন কংগ্রেস প্রার্থী কানাইলাল ঢোল ছিলেন, তেমনই তরুণ ছাত্রনেতা নিখিল দাসও একজন প্রার্থী ছিলেন।

রাজ্যের নির্বাচনে কম্যুনিষ্ট পার্টির সঙ্গে পি-এস-পি দলের সমঝোতা খুবই জোরদার হাওয়া তুলেছিল। ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ গান্ধীজীর একটি চিঠি প্রকাশ করে '৫৭-র নির্বাচনে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিলেন। এই চিঠির মর্মকথা ছিল : প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ১৯৪৭ সালে পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী হলে গান্ধীজী তাঁকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন, 'মন্ত্রিসভায় একজন মাড়োয়ারী প্রতিনিধিকে মন্ত্রী হিসেবে রাখা উচিত।' এই প্রসঙ্গে গান্ধীজী বদ্রীদাস গোয়েঙ্কা অথবা দেবীপ্রসাদ খৈতানের নাম উল্লেখ করেছিলেন। গান্ধীজীর এই নির্দেশ পালন করা হয়নি বলেই তাঁকে মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে অপসারণ করা হয়েছিল। কম্যুনিষ্ট দলের সঙ্গে কেন তিনি ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন, এই প্রসঙ্গে ডঃ ঘোষ বলেছিলেন : 'কম্যুনিষ্টরা ডান হাতে ভাত খায় বলে আমি কি ডান হাতে ভাত খাবো না?'

১৯৫৭ সালের নির্বাচনে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে বেশ কয়েকজন নতুন প্রার্থীকে মনোনয়ন দিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে একজন হলেন সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়। বৌবাজার কেন্দ্রে ডাঃ রায়ের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন কম্যুনিষ্ট পার্টির মহম্মদ ইসমাইল। প্রার্থী হিসাবে ইসমাইলকে কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে খুব বেশী একটা গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মহম্মদ ইসমাইলের কাছে হারতে হারতে জিতে গেলেন। পোস্টাল ব্যালট সহ মাত্র ৫৪০ ভোটে জিতেছিলেন ডাঃ রায়।

বিধান সভার নির্বাচনে কংগ্রেস জয়ী হল। কিন্তু বিরোধী দলের সঙ্গে আসনের ব্যবধান অর্ধেক কমে গেল। ২৫২টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস পেল ১৫২টি। ১৯৬২-র নির্বাচনে বিরোধী দল যেখানে পেয়েছিল ৫৭টি আসন, সেখানে এবার পেল প্রায় ১০০টি। আর কয়েকটি আসন বেশী পেলেই, অর্থাৎ, আর মাত্র ২৬টি আসনে যদি কংগ্রেসের পরাজয় ঘটত, তাহ'লে 'বিকল্প সরকার' ধ্বনি আর 'ইউটোপিয়ান' থাকত না। কাজেই, প্রমোদ দাশগুপ্তের 'বিকল্প সরকার' গঠনের ধ্বনি কত সময়োপযোগী ছিল, এই নির্বাচনে সেটাই প্রমানিত হল। নির্বাচনের পর প্রমোদ দাশগুপ্তকে সর্বপ্রথম একটি প্রকাণ্ড জনসভায় অভিনন্দিত করা হয়। জনসভাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল নৈহাটির বিজয়নগর মাঠে।

ছত্রিশ

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মন্ত্রিসভা গঠিত হবার পরই সেই মন্ত্রিসভা প্রচণ্ড সংকটের মুখে পড়ল। দু'বছর ধরে চলেছিল এই সংকট। এই সংকট থেকে তিনি উদ্ধার পান ১৯৫৯ সালে যখন চীন ভারত-সীমান্তে এক সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে এবং ১৯ জন ভারতীয় সেনা নিহত হয়। চীন-ভারত সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে ডাঃ রায় প্রচণ্ড কম্যুনিষ্ট বিরোধিতার জোয়ার সৃষ্টি করেন।

মন্ত্রিসভা গঠিত হবার ছ'মাস পরেই আইনমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেনের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় পরে প্রকাশ্যে একটি বিবৃতি দিয়ে কংগ্রেস দল ত্যাগ করেন এবং বামপন্থীদের সঙ্গে হাত মেলান। বঙ্গ-বিহার সংযুক্তি প্রচেষ্টা এবং বাংলার বাইরে উদ্বাস্তু প্রেরণের প্রশ্ন নিয়ে ডাঃ রায়ের মন্ত্রিসভা নানাভাবে আন্দোলনের মুখে পড়ে। উত্তর কলকাতা এবং দক্ষিণ কলকাতার দুটি উপ-নির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয় ঘটে। খাদ্য আন্দোলনকে কেন্দ্র করে 'দ্রব্যমূল্য ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি' সরকারের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দেয়। সব মিলিয়ে ডাঃ রায়ের মন্ত্রিসভার নাস্তানাবুদ অবস্থা। এরই মধ্যে আন্দোলনের ঝড়ো হাওয়ায় পশ্চিমবঙ্গ এসে পৌঁছল ১৯৫৯ সালে।

খাদ্য ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন চলছিল, ১৯৫৯ সালে সে আন্দোলন দুর্বার গতিবেগ পেল। এপ্রিল-মে মাস থেকে রাজ্যে খাদ্যসংকট সুরু হয়। জুন মাসে অনাহারে মৃত্যুর সংবাদ শোনা যেতে লাগল। পশ্চিমবঙ্গের বিরোধীদল রাজ্য সরকারের খাদ্যসংকট মোচনে ব্যর্থতা ও কুশাসনের একটি বাহান্নপৃষ্ঠাব্যাপী দলিল তৈরি করে পেশ করলেন রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের কাছে। বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল রাজভবনে গিয়ে রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে লিখিত এই স্মারকলিপিটি রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডুর হাতে দেন।

১৯৫৯ সালের ৩০শে জুলাই তারিখে পশ্চিমবঙ্গ কম্যুনিষ্ট পার্টি ও অন্যান্য বিরোধী দল রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে এই বাহান্নপৃষ্ঠাব্যাপী স্মারকলিপিটি পেশ করেন। আর, ঠিক তার একদিন পর কেরলে কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে গঠিত সরকারকে বরখাস্ত করলেন রাষ্ট্রপতি। ১৯৫৭ সালের এপ্রিল মাসে ই এম এস

নামবুদিরিপাদের নেতৃত্বে ভারতে প্রথম বামপন্থী সরকারের পতন ঘটল নানা চক্র ও চক্রান্তে। কেরল সরকারকে বরখাস্তের প্রতিবাদে কলকাতা সহরে ১লা আগস্ট কমুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে এক বিরাট প্রতিবাদ মিছিল পথ-পরিক্রমা করে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কম্যুনিষ্ট পার্টির কর্মী ও সদস্যদের কি ভাবে বিপুল সংখ্যায় পথে নামানো যায় তার এক অসাধারণ কৌশলী দৃষ্টান্ত স্থাপিত হ'ল। এই দৃষ্টান্ত স্থাপনের মুখ্য নায়ক ছিলেন প্রমোদ দাশগুপ্ত।

কলকাতার রাজপথে কেরল সরকারকে বরখাস্তের প্রতিবাদে যে বিরাট মিছিল বের হ'ল, সেই মিছিল আর ঘরে ফিরল না। খাদ্যের দাবীতে প্রচণ্ড গতিবেগে সংগঠিত খাদ্য আন্দোলনে সামিল হল। এই আন্দোলনের দাবীর মধ্যে অন্যতম ছিল খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেনের পদত্যাগ। মূল্যবৃদ্ধি এবং দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি সরকারের কাছে স্মারকলিপি পেশ করে জানিয়ে দিলেন যে ২০শে আগস্টের মধ্যে তাঁদের দাবীগুলি মেনে না নিলে তাঁরা গণ-আন্দোলন সুরু করবেন।

দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি যখন জোরদার আন্দোলনের পরিকল্পনায় ব্যস্ত, তখন পি-এস পি দলের ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সঙ্গে দেখা করে এক যুক্ত বিবৃতি প্রকাশ করলেন। এই যুক্ত বিবৃতির মূল লক্ষ্য ছিল আন্দোলন ব্যর্থ করা। বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা। কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতা জ্যোতি বসু এবং দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির সম্পাদক হেমন্ত বসু এক পাল্টা বিবৃতিতে বলেন, ডাঃ রায় এবং ডঃ ঘোষের বিবৃতির মধ্যে কোন নতুন কথা নেই। তাই, খাদ্য-আন্দোলন নির্দিষ্ট কর্মসূচী অনুযায়ী হবেই।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় সম্ভাব্য খাদ্য আন্দোলন প্রতিরোধে একটি 'সবুজ নক্সা' প্রণয়ন করলেন। এ ব্যাপারে তাঁর প্রধান সহায়ক ছিলেন পুলিশের এক কর্তা প্রসাদ বসু। কম্যুনিষ্ট দমনের ব্যাপারে প্রসাদ বসুর উপর ডাঃ রায়ের খুবই আস্থা ছিল। ১৯৪৮-৪৯ সালে কলকাতা পুলিশে কর্মরত থাকাকালীন প্রসাদ বসু সেদিনের কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতা, সভ্য এবং সংশ্লিষ্ট লোকদের গতিবিধি ও কার্যকলাপের তথ্য ডাঃ রায়কে দিতেন। দশ বছর পরে আবার সেই প্রসাদ বসুর উপরই খাদ্য-আন্দোলন প্রতিরোধের পরিকল্পনা রচনার ভার দেওয়া হল। সেই পরিকল্পনা মতো কাজও সুরু হ'ল।

২০শে আগস্ট খাদ্য-আন্দোলন সুরুর দিন নির্দিষ্ট হয়েছিল। ১৭ই আগস্ট

রাত্রিতে পুলিশ কম্যুনিষ্ট পার্টি, ফরওয়ার্ড ব্লক, আর-এস-পি প্রভৃতি দলের অফিসে হানা দিল। হানা দিল দল নেতাদের বাড়িতে। ৭০ জন শীর্ষ নেতাকে গ্রেপ্তার করা হল। এর মধ্যে ১৪ জন ছিলেন বিধানসভা-সদস্য। মাঝরাতের এই হানায় জ্যোতি বসু সহ বেশ কয়েকজন নেতা পুলিশের জালের বাইরে রয়ে গেলেন। দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি ঘোষণা করল, ৩১শে আগস্ট কলকাতার রাজপথে খাদ্যের দাবীতে ভুখমিছিল পরিচালিত হবে। লক্ষ লক্ষ মানুষ শোভা-যাত্রা করে রাজভবন অভিযান করবে। খাদ্যের দাবী জানাবে। আর, দাবী জানাবে প্রফুল্লচন্দ্র সেনের পদত্যাগের।

৩১শে আগস্ট নতুন ইতিহাস রচিত হল কলকাতার রাজপথে। লক্ষাধিক মানুষ মিছিল করে রাজভবন অভিযান করল। সশস্ত্র পুলিশবাহিনী এসপ্লানেড ইস্ট-এ সে মিছিলের গতিরোধ করল। সেদিনের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কালীপদ মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশ ছিল কোন প্রকার প্রশ্রয় নয়। পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়ল মিছিলের উপর। টিয়ার গ্যাস ও গুলি চলল নির্বিচারে। ৩১শে আগষ্টের রাতে এক বিভীষিকার অন্ধকার রচিত হল। ১লা এবং ২রা সেপ্টেম্বর গুলি চলল। পুলিশের গুলিতে নিহত হল ৮০জন। গ্রেপ্তার হ'ল কয়েক হাজার মানুষ। আহত ও পঙ্গু হল কয়েক শো। আন্দোলনকারী জনগণও পিছিয়ে ছিল না। পাড়ায় পাড়ায় সেদিন ব্যারিকেড রচিত হয়েছিল। পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছিল অঞ্চলে অঞ্চলে। আত্মগোপন অবস্থা থেকে জ্যোতিবাবু বিবৃতি দিয়ে বললেন: সব রকম নৃশংসতা সত্ত্বেও আন্দোলনের কর্মসূচী বহাল থাকবে। ২রা সেপ্টেম্বর রাতে সামরিক বাহিনী নামানো হল কলকাতায়। রাজপথের খাদ্য-আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল জেলায় জেলায়। গ্রামে গ্রামে। ১৯৫৯ সালের এই খাদ্য আন্দোলন রাজ্য-রাজনীতির ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনায় পরিণত হল।

সাঁইত্রিশ

এই দুবার গণ-আন্দোলনের চাপে ডাঃ রায়ের মন্ত্রিসভা যে বিপাকে পড়ে তা' থেকে অনেকটা মুক্তি পায় লাদাখে চীনের সঙ্গে সীমান্ত-সংঘর্ষে। এই সংঘর্ষে ১৭ জন ভারতীয় পুলিশ নিহত হন। এই ঘটনাকে অজুহাত করে সারাদেশে কম্যুনিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধে প্রবল আক্রমণ সুরু হয়। শুধু কংগ্রেস দল নয়, এই

ব্যাপারে পি-এস-পি দল কংগ্রেসের চাইতেও বেশী এগিয়ে আসে। পি এস-পি দল তখন ঘোরতর কম্যুনিষ্ট-বিরোধী। কেরলে নামবুদিরিপাদকে হটিয়ে পি-এস-পি দলের নেতা থাম্নু পিল্লাই মুখ্যমন্ত্রী হয়ে বসেছেন। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভাতেও চীনা হামলাকে কেন্দ্র করে একটি নিন্দাপ্রস্তাব আনা হয়। এই প্রস্তাবের উপলক্ষ্য ছিল চীন। লক্ষ্য ছিল কম্যুনিষ্ট পার্টি। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় জ্যোতিবাবুর দিকে আঙুল তুলে বলেছিলেন, "চীনা নীতিকে যে সমর্থন করছে সে দেশদ্রোহী। এটা একটা অদ্ভুত দল যাদের পা রয়েছে মাটিতে, কিন্তু সদস্যরা দৌড়চ্ছে চৌ-এন-লাই-এর কাছে কি করবে না করবে জানতে। দেশ এই দলকে বরদাস্ত করবে না।"

কম্যুনিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধে ডাঃ রায় যে প্রচার-অভিযান সুরু করলেন তার ফলে সারা দেশেই পার্টির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ সুরু হল। জ্যোতি বসু ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে জানালেন তাঁর দলের উপর এবং তাঁদের সভাসমিতির উপর আক্রমণের কথা। ময়দানে জ্যোতিবাবুর একটি সভা আক্রান্ত হয়। বহু জায়গায় সংঘবদ্ধ-ভাবে কম্যুনিষ্ট পার্টির উপর আক্রমণ চলে।

চীনা আক্রমণের সুযোগে কম্যুনিষ্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করার জন্য ডাঃ রায় খুবই তৎপর হয়ে উঠেছিলেন। এই ব্যাপারে বিধানচন্দ্র রায়ের চিঠি ও কিছু পাঠানো তথ্যের জবাবে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু যে চিঠি লেখেন এবং পরে চীন-প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে কম্যুনিষ্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করার জন্য ডাঃ রায় জওহরলালের উপর ক্রমাগত যে চাপ সৃষ্টি করেন তার উত্তরে জওহরলাল নেহরু যে জবাব দেন তা' ভারতীয় রাজনীতির প্রতিটি ছাত্রের অবশ্য পাঠ্য। ডাঃ রায় লিখেছিলেন, 'দেশের কম্যুনিষ্ট দলকে নিষিদ্ধ করা হোক।' জওহরলাল নেহরু তার জবাবে লেখেন: 'চীনের যে বিরোধিতা করতে হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু সেটা আলাদা ব্যাপার। কিন্তু নীতির দিক থেকেই হোক, বা, কৌশলের দিক থেকেই হোক, এমন কিছু করা উচিত হবে না, যা' আমাদের অসুবিধা বাড়িয়ে তুলবে। আমি ঠিক বুঝতে পারি না, মাত্র কম্যুনিজম্ বিরোধিতার জন্য কংগ্রেসও কি অন্যান্য সাম্প্রদায়িক দলগুলির সঙ্গে মিশে যাবে?' নেহরু আর একখানা চিঠিতে লিখেছিলেন, 'আমার মনে হয়, এই স্তরে কম্যুনিষ্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করা আমাদের পক্ষে খুব অনভিজ্ঞতার কাজ হবে। তার ফলে, তারা এই সংকট থেকে বেরিয়ে তো আসবেই, জনগণের বেশ কিছু সহানুভূতিও পেয়ে যাবে। তা' ছাড়া এর আন্তর্জাতিক ফলও ভারতের পক্ষে খুব খারাপ হবে।

১৯৬০ সাল। বেজওয়াদায় কম্যুনিষ্ট পার্টির ষষ্ঠ পার্টি-কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হবে। তার আগেই ফেব্রুয়ারী মাসে বর্ধমান সহরে বসল কম্যুনিষ্ট পার্টির রাজ্য-সম্মেলন। রাজ্য-সম্মেলনের আগে রাজ্যকমিটির সাধারণ সম্পাদক কে হবেন তাই নিয়ে আলোচনা সুরু হ'ল। দলের মধ্যে দুই লাইন অনেক আগে থেকেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। দলের মধ্যে সংশোধনবাদের যাঁরা বিরোধী, সাধারণ সম্পাদক হিসাবে তাঁরা পেতে চাইলেন প্রমোদ দাশগুপ্তকেই। কারণ, সংশোধনবাদের ঝোঁকের বিরুদ্ধে তিনি বিরামহীন লড়াই করেছেন। নেতৃত্ব দিয়েছেন। একদা যিনি দলের মধ্যে হটকারী লাইনের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, পরবর্তীকালে তিনিই সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়েও অগ্রণী। এই পদের জন্য নানাভাবে অন্যান্য নাম যে না উঠেছিল তা' নয়। কিন্তু সে সবই ঘরোয়া আলোচনায়। দলের দায়িত্বে তখন জ্যোতি বসু ছিলেন। তাঁর তখন একটি মাত্র কথা। তিনি অব্যাহতি চান। সরোজ মুখোপাধ্যায় 'স্বাধীনতা' পত্রিকার দায়িত্ব নিয়ে আছেন। রাজ্য-নেতৃত্বে নবাগত হরেকৃষ্ণ কোঙার কৃষক সভার দায়িত্ব নিয়ে রয়েছেন। এই প্রসঙ্গে আরও দুটি নাম উচ্চারিত হয়—ভবানী সেন ও রণেন সেন। এই ব্যাপারে প্রমোদ দাশগুপ্ত নিজে আমাকে যে কথা বলেছিলেন তা' হুবহু তুলে ধরছি: "১৯৫৭ সাল থেকেই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যকমিটির সম্পাদক নির্বাচন প্রশ্নটি একটি বড় সমস্যা হিসাবে দেখা দেয়। কমরেড মুজফ্‌ফর আহমেদ সম্পাদক পদ ত্যাগ করার পর থেকেই জ্যোতি বসুকে পার্টির দায়িত্ব বহন করতে হয়েছে। জ্যোতি বসু আইনসভার বিরোধী দলের নেতার কাজে এবং জন-আন্দোলনের কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকার জন্য পার্টি-সংগঠনের ও পার্টি-সম্পাদকের পদ থেকে অব্যাহতি চেয়ে আসছিলেন অনেকদিন থেকেই। ১৯৫৭ সালেও জ্যোতি বসুকে সম্পাদক থাকতে রাজী করানো গেল। কিন্তু ১৯৫৯ সালে তিনি কোনমতেই এই পদে থাকবেন না বলেছিলেন। এই অবস্থায় পার্টির সম্পাদক হিসাবে তিনটি নাম আসে—ভবানী সেন, রণেন সেন এবং আমার নাম। কমরেড মুজফ্‌ফর আহমেদ আমার সঙ্গে রাজ্যপার্টির সম্পাদক পদের প্রশ্ন নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন। কাকাবাবু বলেন, 'পার্টিকে সংশোধনবাদ কুরে কুরে খেয়ে শেষ করছে। পার্টির বিপ্লবী চেহারা শেষ হয়ে যাচ্ছে। পার্টিকে বিপ্লবী সংগঠন হিসাবে গড়ে তুলতে উপযুক্ত নেতৃত্ব চাই। আপনি সেটা পারবেন। রাজ্য-পার্টির সম্পাদকের পদ গ্রহণে আপনাকে রাজী হতেই হ'বে।' আমি কাকাবাবুর নির্দেশ ও ইচ্ছাকে শিরোধার্য করে সম্মতি দিই। বর্ধমান সম্মেলনে রণেন সেন আমার

নাম প্রস্তাব করেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে আমাকে পার্টির রাজ্যকমিটির সম্পাদক করা হয়।"

কম্যুনিষ্ট পার্টির রাজ্য-কমিটির সম্পাদক হলেন প্রমোদ দাশগুপ্ত।

"আনিলাম অপরিচিতের নাম ধরণীতে
পরিচিত জনতার সরণীতে
আমি আগন্তুক—"

আটত্রিশ

প্রমোদ দাশগুপ্ত কম্যুনিষ্ট পার্টির রাজ্যদলের সম্পাদক নির্বাচিত হয়ে প্রথমেই পার্টির কাজের ধারা পরিবর্তনে মন দিলেন। তিনি জানতেন, দলের মধ্যে যে নীতিগত বিরোধ ১৯৫৪ সালে পালঘাট পার্টি কংগ্রেসের সময় থেকে ধিকিধিকি জ্বলছিল, সেই আগুন আর ধোঁয়ায় ঢাকা থাকছেনা। দলের মধ্যে বাম আর দক্ষিণ হাওয়ায় অনেকে দুলছেন। দলের শীর্ষ নেতারা বিপ্লবের স্তর নিয়ে বহুধা বিভক্ত। প্রমোদ দাশগুপ্ত দলের সম্পাদক নির্বাচিত হলেন প্রধানতঃ দলের মধ্যে যাঁরা বাম, তাঁদের সমর্থনে। একটা বিশেষ লক্ষ্য সামনে রেখেই মুজফ্‌ফর আহ্‌মেদ তাঁকে সম্পাদকের দায়িত্ব নিতে বলেছিলেন। সেই লক্ষ্য হ'ল—সংশোধনবাদ বা দক্ষিণপন্থী ঝোঁক পার্টিকে যেন গ্রাস না করে। প্রমোদ দাশগুপ্তের দলের সাধারণ সম্পাদক হওয়া সম্ভব হয়েছিল অনেকগুলি যোগ্যতার নিরিখে। বর্ধমান পার্টি কংগ্রেসের অনেক পরে। সি-পি-আই নেতা বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়কে একদিন প্রশ্ন করেছিলাম: "প্রমোদ দাশগুপ্তের মত ও চিন্তা আপনাদের জানা সত্বেও তিনি সর্বসম্মতভাবে দলের সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন কি ভাবে? আপনারা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সাধারণ সম্পাদকের পদ ছেড়ে দিয়েছিলেন কেন? বিশ্বনাথবাবু জবাবে বলেছিলেন: লড়াই করে কোন লাভ হ'তনা। দ্বিতীয়তঃ, নীতিগত বিরোধে অন্য অনেকের তুলনায় প্রমোদবাবু অনেক বেশী গ্রহণযোগ্য ছিলেন। তবে আমরা কোন লড়াই করিনি, এ কথা ঠিক নয়। মূল রাজনৈতিক প্রস্তাবে আমি অনেকগুলি সংশোধনী এনেছিলাম এবং প্রতিটি প্রশ্নে ভোটাভুটি হয়েছিল।"

প্রমোদ দাশগুপ্ত সম্পাদক হয়ে প্রথমেই ঠিক করলেন 'নেতারা নীতির ঝগড়া করুন, আমি পার্টিকে জনগণের কাছে নিয়ে যাব। পার্টি কর্মীদের রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে।' তিনি সব চাইতে বেশী জোর দিলেন পার্টি কর্মসূচী, রাজনৈতিক প্রস্তাব এবং চলতি পরিস্থিতিতে পার্টি কর্মীদের ইতিকর্তব্য নিয়ে আলোচনার উপর। দলের সর্বোচ্চ নেতা সর্বনিম্নস্থ গ্রামের কর্মীদের নিয়ে পার্টি মিটিং করেন। কর্মীরা নেতাকে ঘনিষ্ঠভাবে চেনবার সুযোগ পান। নেতা সুযোগ পান ব্যক্তিগতভাবে জানবার কোন্ কর্মী কত পরিশ্রমী, কতটা পার্টিকে ভালবাসে, পার্টির জন্য সময় দেয়। কর্তৃত্বের আসনে বসে হুকুম করা নয়। পার্টি কর্মীদের পাশে দাঁড়িয়ে, সুখদুঃখের ভাগীদার হয়ে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করাই হ'ল প্রমোদ দাশগুপ্তের সম্পাদক হিসাবে কাজের বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য ভাবীকালে কি অসাধারণ ফলপ্রসূ হয়েছিল, পার্টি ভাগের পর তা' বোঝা যায়।

প্রমোদ দাশগুপ্ত তেইশ বছর রাজ্যপার্টির সম্পাদক হিসাবে ছিলেন। যখন সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, পার্টিতে ভাঙনের সংকট তখন প্রায় স্পষ্ট। সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে চলতে হবে—কঠিন দায়িত্ব সন্দেহ নেই। কিন্তু কোন সংকটেই প্রমোদ দাশগুপ্ত বিচলিত হন না, কোন দায়িত্ব পালনেই তিনি পশ্চাৎপদ নন। বিপদে ঝড়ঝঞ্ঝায় কাজ করতেই মনে তিনি বেশী বল পান। সেই অনুশীলন পার্টিতে কর্মী অবস্থা থেকে অনেক অগ্নিপরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হন। তিনি জানতেন ব্যক্তিস্বার্থকে তুচ্ছ করে পার্টিস্বার্থকে একমাত্র অভীষ্ট করে তুলতে না পারলে কম্যুনিষ্ট হওয়া যায় না, মার্কস্‌বাদী, লেনিনবাদী হওয়া যায় না। একজন কম্যুনিষ্টকে হতে হবে বিনয়ী ও নম্র; তাঁর জীবনযাত্রা হবে সহজ, সরল। আর, এই সঙ্গে থাকা চাই দৃঢ়তা, আনুগত্য, নিষ্ঠা। এই সব গুণাবলীই নিজের জীবনে গ্রহণ করে প্রমোদ দাশগুপ্ত কম্যুনিষ্ট পার্টির মধ্যে নিজেকে অনেক উঁচু আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। ত্যাগ, শিক্ষাগত যোগ্যতা বা আরও অন্য অনেক গুণে প্রমোদ দাশগুপ্তের তুল্য অনেকেই হয়ত আছেন। খ্যাতি ও পরিচিতিতে হয়ত অনেকেই অনেক বড় হতে পারেন, কিন্তু নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত থেকে পার্টির সাধারণ কর্মীদের এত আপন অন্য কেউ হ'তে পারেননি। প্রতিটি পার্টিকর্মীর প্রয়োজন, চাহিদা, যোগ্যতা, অযোগ্যতা সব কিছু সম্পর্কেই সজাগ এমন নেতা প্রমোদ দাশগুপ্তের সঙ্গে তুলনীয় কেউ নেই। যে কোন বিপদে পার্টি কর্মীদের পাশে দাঁড়ানো এবং তাদের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেওয়ার দুর্লভ গুণের অধিকারী ছিলেন তিনি। ১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত

নকশালপন্থীদের আক্রমণ এবং ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিটি পার্টিকর্মীকে তিনি বুক দিয়ে আগলেছেন। পার্টিকর্মীদের কাছে কখনও তিনি স্নেহশীল পিতা, কখনও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, কখনও বা তিনি বন্ধু, সমদুঃখী, সমব্যাথী আপনজন।

বাইরে থেকে দেখলে তাঁকে কঠোর মনে হ'ত। কিন্তু ভেতরটা ছিল কোমল। একটা কাঠিন্যের আবরণে নিজেকে ঢেকে রাখতেন তিনি। জেলায় জেলায় ঘুরে বেড়াতেন। গাড়ি করে। ট্রেনে নয়। কলকাতা থেকে কুচবিহার অনায়াসে বিমানে যাবার সুযোগ ছিল। কিন্তু সুস্থ অবস্থায় সে সুযোগ কখনও নেন নি। বহরমপুরে বাড়িতে যাবেন। পথে পার্টিকর্মীদের সঙ্গে মিলিত হতেন। জি-বি মিটিং করতেন। জেলার প্রতিটি কর্মীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ হতেন। জেনে নিতেন পার্টি কর্মীদের সঙ্গে স্থানীয় মানুষের সম্পর্ক ও সমস্যার কথা। তাদের জীবনযাত্রা ও আন্দোলনের কথা। কর্মীদের সঙ্গে তাঁর এই একাত্মতার হাজারো কাহিনী রয়েছে।

পঞ্চাশের দশকের একটি কাহিনী। সাংবাদিক প্রফুল্ল রায় চৌধুরীর মুখে শোনা। ডেকার্স লেনে স্বাধীনতা পত্রিকার অফিস। প্রমোদ দাশগুপ্ত পত্রিকার ম্যানেজার। দপ্তরে দিনরাত্রি তাঁর কাজ। সাংবাদিকদের কাজের সঙ্গে তাঁর সরাসরি যোগ না থাকলেও তিনি ছিলেন সকলেরই অভিভাবক। কলকাতায় একটা বড় আন্দোলন তখন চলছে। খবর এল পুলিশ গুলি চালিয়েছে। অনেকে মারা গিয়েছে। মৃতদেহের সঠিক হিসাব নেই। আবার খবর পাওয়া গেল মোমিনপুর মর্গে বেশ কিছু মৃতদেহ সরিয়ে রাখা হয়েছে। সাংবাদিক প্রফুল্ল রায় চৌধুরী ও অরুণ দাশগুপ্ত গাড়ি নিয়ে রাত্রে রওনা হয়ে গেলেন। গাড়ির চালক স্নেহাংশুকান্ত আচার্যের জনৈক আত্মীয়। কঠিন কাজ। লাশ আবিষ্কার করতে গিয়ে নিজেদের লাশ হয়ে যাবার সম্ভাবনা ছিল যথেষ্ট। সংবাদ ও তথ্য সংগ্রহ করে এই দুই সাংবাদিক যখন ডেকার্স লেনের অফিসে ফিরলেন তখন রাত দেড়টা। দেড়টা কেন, রাত ন'টাও সেদিনের কলকাতায় নিরাপদ ছিল না। বিশেষ করে স্বাধীনতা পত্রিকার সাংবাদিকদের কাছে। ফিরে দেখেন দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন প্রমোদ দাশগুপ্ত। উদ্বিগ্ন পিতা দাঁড়িয়ে আছেন পুত্রদের ফেরার প্রতীক্ষায়! ঘণ্টার পর ঘণ্টা। তাঁদের দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে প্রমোদ দাশগুপ্ত নিজের কাজে ফিরে গেলেন।

আর একটি ঘটনার স্মৃতিচারণ করেছেন সেদিনের স্বাধীনতা পত্রিকার সাংবাদিক ও প্রখ্যাত কবি-সাহিত্যিক সুভাষ মুখোপাধ্যায় :

"চল্লিশ বছর আগের কথা। ২৪৪ বৌবাজার স্ট্রীটে কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রকাশ্য অফিস। নেতারা কেউ এসেছেন সদ্য ছাড়া পেয়ে, কেউ বা অজ্ঞাতবাস পর্ব চুকিয়ে। জনযুদ্ধ সাপ্তাহিক বের হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মায়া কাটিয়ে আমিও তখন সেই কাগজে সবে জুটেছি। সোমনাথ লাহিড়ীর কড়া শাসনে আমি তখন সদ্য লিখতে শিখছি। প্রমোদ দাশগুপ্ত তখন আমাদের ম্যানেজার। যেদিন কাগজ ছেপে আসত সেটা ছিল একটা বিশেষ দিন। ঘরের কোনে টেবিল-চেয়ার সরিয়ে ফেলে মেঝেয় লম্বা করে পাতা হ'ত মাদুর। তাতে বসে কাগজ ভাঁজ করা, মোড়কে ঠিকানা মারা, ওজন বুঝে ডাকটিকিট লাগানো। প্রমোদবাবু ছিলেন এ কাজে আমাদের নেতা। নেতা মানে শুধু তদারকী করতেন এমন নয়, নিজ হাতে আমাদের সঙ্গে সব কাজ করতেন। গ্রামের নাম রয়েছে কিন্তু কোন্ পোস্টঅফিস, কোন্ জেলা? প্রমোদবাবুর ছিল সব মুখস্থ। বাংলাদেশের ভূগোলে বলতে গেলে ঘরে বসে তাঁর কাছেই আমার হাতে খড়ি—জনযুদ্ধের প্যাকেট তৈরীর মাদুরে বসে।

"সম্পাদকীয় দপ্তরের দুইজন—পরে যিনি যুক্তফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী হয়েছিলেন, সেই নিরঞ্জন সেন ও আমি সপ্তাহে একদিন এটা ছিল আমাদের ছুটির দিনের কাজ। কলম ছেড়ে এই হাতের কাজ—কী যে ভাল লাগতো তা বলার নয়।

"প্রমোদ দাশগুপ্তকে সবাই কড়া লোক বলে এড়িয়ে চলতো। কিন্তু কাগজ ডেসপ্যাচের দিন ছিল ওঁর অন্য চেহারা। যতদূর মনে পড়ে—তখন তিনি বিড়ি খেতেন। চুরুট বোধ হয় ধরেছিলেন অনেক পরে। সহকর্মীদের মধ্যে নিরঞ্জন সেনকে তিনি খুব সমীহ করে চলতেন। মনের কথাও বোধ হয় একমাত্র নিরঞ্জনদার সঙ্গেই হ'ত। প্রমোদবাবুকে কখনও পটাবার দরকার হলে আমরা সাধারণতঃ নিরঞ্জনদাকেই ধরতাম। এমনিতে রাশভারি হলেও কাগজ ডেসপ্যাচের দিন কাজে বসে প্রমোদবাবুর মুখে খই ফুটতো। আর সেই সঙ্গে রাজ্যের বিষয় নিয়ে আলোচনা হত। রাজনীতির বিষয়ে প্রমোদবাবুকে যতটা একগুঁয়ে, এক ঠেয়ে বলে মনে হত, ভাষা কিংবা সামাজিক বিষয়ের আলোচনায় ওঁর মন ছিল খুব খোলা। সপ্তাহে এ' একটা দিনই আমরা খুব কাছাকাছি হতাম। কিন্তু দূরে দূরে থাকলেও আমরা সবাই বুঝতাম প্রমোদবাবু ছাড়া জনযুদ্ধ অচল। এটা

স্পষ্ট হল দৈনিক স্বাধীনতা বার হবার পর। যে টাকা হাতে নিয়ে প্রমোদবাবু কাগজ বের করেছিলেন সেই টাকায় কেউ কাগজ বার করবার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারতো না। আস্তে আস্তে হল আমাদের নিজেদের প্রেস, ডেকার্স-লেনের মতো আলাদা ভাড়া বাড়ী। প্রতিপদে ছিল সমস্যা। টাকা জোগাড় হয় তো কাগজ পাওয়া যায় না, কাগজ জোগাড় হয়ত মেসিন বিগড়ে যায়। সব ধকলই সামলাতে হত প্রমোদবাবুকে। অথচ ওঁকে দেখে মনেই হতনা ওঁর মাথার উপর এত চাপ। আমার জীবনে প্রথম রিপোর্টাজ লেখার কথা মনে পড়ছে। বর্ধমানে বন্যা হয়েছে। লেখা আর ছবির জন্য পাঠান হল আমাকে আর টুনুদাকে (ফটোগ্রাফার সুনীল জানা)। ফিরে এসে দেখা গেল ক্যামেরায় জল ঢুকে সব ছবিই নষ্ট। শুধু একটা ছবি যা উঠেছিল। ছবিতে জল ছিল না। একটা উঁচু ডাঙ্গা, একটা কাঁঠাল গাছের ডালে বড় একটা দেওয়াল ঘড়ি। তার নীচে বাঁশের মাচার উপর আপৎকালীন একটা মুদির দোকান। প্রমোদবাবু ছবি দেখে তো রেগে কাঁই। বন্যা নিয়ে এ ছবি অচল। আমিও নাছোড়বান্দা। ছবি না দিলে ও লেখা কেউ পড়বেই না। শেষকালে প্রমোদবাবু নিরুপায় হয়ে নিমরাজী হলেন। আমার লেখার সঙ্গে সে ছবি অবশ্য ছাপাও হল।

"আমি যখন জনযুদ্ধে ঢুকি সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে আমাদের মাইনে ছিল পনের টাকা। নেতা থেকে আমাদের মতো চুনোপুটি সবারই ছিল এক মাইনে। বাড়তে বাড়তে ৪৭ সালে বোধহয় পঁচিশে উঠেছিল। এই বছরই প্রথমে আমার মা এবং তার কিছুদিন পরে আমার দাদা মারা যান। ঠিক তার আগের বছর বাবা চাকরি থেকে অবসর নেন। বাড়িতে তখন বিধবা বৌদি আর ছোট বয়সের দুই ভাইপো আর ভাইঝি। এ অবস্থায় আমার যে চাকরি বাকরি করা দরকার এটা একবারও আমার মাথায় আসেনি। এমন কি আমার বাবাও ঘুণাক্ষরে আমাকে মনে করিয়ে দেননি। পরের মাসে অন্য সকলের সঙ্গে প্রমোদবাবুর কাছে গেলাম মাইনে নিতে। উনি আমার দিকে এগিয়ে দিলেন দশখানা দশটাকার নোট। ওঁর ভুল দেখে আমি হতভম্ব হয়ে গেছি। হাত বাড়াতে পারছিনা। প্রমোদবাবু ওঁর স্বভাবসুলভ রুক্ষ গলায় বললেন 'নিন তাড়াতাড়ি করুন।'

আমি ইতস্তত করে বললাম 'আপনি তো একশো টাকা দিয়েছেন।'

আমার দিকে না তাকিয়ে একই ভাবে উনি বললেন, 'হ্যাঁ এখন থেকে এই টাকাই পাবেন, ওটাই আমাদের হাইয়েস্ট পে।'

কিছুদিন পরে জেলে যাবার আগে পর্যন্ত আমি এই মাইনেই পেয়েছিলাম।"

এমনই আরও অজস্র কাহিনী ছড়িয়ে আছে প্রমোদ দাশগুপ্তের জীবনে। অনেক পরের কথা। তখন পার্টি অফিস ও গণশক্তি পত্রিকার অফিস একই বাড়িতে। প্রমোদ দাশগুপ্ত একদিন পার্টি অফিসে এসে দেখলেন গণশক্তির একজন কর্মী বেঞ্চিতে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। একদিন নয়, দু'তিন দিন একই দৃশ্য। প্রমোদবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ব্যাপার? এই কমরেড কি রাত্রেও এখানে থাকে নাকি? বাড়িতে যায় না?' সময়টা ১৯৭২ সাল। চারদিকে সি-পি-আই (এম) কর্মীদের উপর হামলা চলছে। হাজার হাজার কর্মী ও নেতা পাড়া ছাড়া। তখন ঘরবাড়ি ছাড়া কমরেডদের নিরাপদ আস্তানা যোগাড় করাটাই পার্টির সবচেয়ে বড় কাজ। প্রমোদ দাশগুপ্ত নিজেই বিপদের ঝুঁকি নিয়ে সকলের খোঁজখবর নিচ্ছেন। চিন্তিত হয়ে পড়লেন এই কমরেডের জন্য। ওর তো ছেলে বৌ আছে। ডেকে পাঠালেন তাকে। বললেন, 'ছেলে বৌকে কোথায় রেখে দিয়ে এলে? যাও, যে করে হোক একটা ঘর ভাড়া কর। ভাড়ার টাকা নিয়ে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। প্রমোদ দাশগুপ্তই প্রতি মাসে পার্টির তহবিল থেকে তার জন্য ঘর ভাড়ার ব্যবস্থা করে দিলেন।

আর একদিন। পাশের ঘরে বসে তিনি কথা বলছেন। কানে এল একজন তরুণ পার্টি কমরেড বলছেন, 'দরকারী কাগজ, দলিল, গুরুত্বপূর্ণ জিনিষ নিয়ে যাতায়াত করতে হয়। একটা ব্যাগ পেলে খুব সুবিধা হত। একটা ব্যাগ যোগাড় করে দিতে পারিস? কেনার মতো ক্ষমতা আমার নেই।'

পরের দিন তিনি পার্টি-অফিসে বলে গেলেন, ছেলেটি এলে যেন তাকে তাঁর বাসায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

প্রমোদদা বাসায় ডেকে পাঠিয়েছেন শুনে সেই তরুণ কমরেড তো চিন্তায় পড়ে গেলেন। সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে তিনি প্রমোদ দাশগুপ্তের বাসায় গিয়ে হাজির হলেন। তিনি বসে বই পড়ছিলেন। ওর দিকে না তাকিয়েই বললেন, 'আলমারীটা খোল। অনেকগুলি পোর্টফোলিও ব্যাগ আছে। তোমার তো একটা ব্যাগ দরকার।' আলমারী থেকে ভাল ভাল পাঁচ ছয়টি ব্যাগ বের করে সেই কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্তের সামনে রাখলেন। তিনি ওর দিকে তাকালেন, 'তোমার কোনটা পছন্দ? এই ব্যাগটা জার্মানী থেকে একজন পাঠিয়েছেন। সব চাইতে ভাল ব্যাগ। এইটা নাও।'

কমরেড ইতস্তত করায় প্রমোদ দাশগুপ্ত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বললেন, 'আমি রেখে দিয়ে কি করব? তুমি পার্টির যে কাজ কর তাতে এই ব্যাগটা লাগবে!'

এই হলেন প্রমোদ দাশগুপ্ত। প্রতিটি পার্টিকর্মীর সুখদুঃখের ভাগীদার, অভিভাবক। শুধু ব্যক্তিগত সম্পর্কের ব্যাপারেই নয়, পার্টিগতভাবেও, পার্টির তাত্ত্বিক লড়াইয়ের ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন পার্টিকর্মীদের আপনজন। তাদের তিনি নিজের কাছে টেনে নিতেন। ফলশ্রুতি, পার্টি ভাগাভাগির সময় যুক্তদলের নিচের তলার কর্মীরা সকলেই প্রমোদ দাশগুপ্তের সঙ্গে মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টিতে চলে আসে। পার্টির মধ্যে যখন তত্ত্বগত বিরোধ ক্রমেই মাথা উঁচু করে উঠছিল, সেই সময়ে প্রমোদ দাশগুপ্তের পার্টিগত অবস্থান এবং তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে সর্বস্তরের কর্মীরা ওয়াকিবহাল ছিল।

পার্টিকর্মীদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক এবং ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ কি রকম ফলপ্রসূ হয়েছিল তার ছোট একটি নজির এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৬২ সালের আগে-পিছে সর্বত্র জেনারেল বডি মিটিং চলছে। এই সব জি বি মিটিং-এ প্রধান আলোচ্য বিষয় থাকত পার্টির তত্ত্বগত প্রশ্ন। পানিহাটিতে এমনই একটা জি-বি মিটিং-এর আয়োজন হয়েছিল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ভূপেশ গুপ্ত ও প্রমোদ দাশগুপ্ত। ভূপেশ গুপ্ত নিজে যে তত্ত্ব বিশ্বাস করেন তাঁর দীর্ঘ বক্তব্যে তিনি সেই তত্ত্বকেই উপস্থাপিত করেন। তাঁর বক্তব্য শেষ হলে কর্মীদের প্রশ্নের পালা সুরু হল। কর্মীদের নানারকম প্রশ্নে ভূপেশ গুপ্তকে হিমসিম খেতে হল। প্রমোদ দাশগুপ্ত পাশে বসে শুধু চুরুটে টান দিচ্ছিলেন। একটি কথাও বলেননি। প্রশ্নে প্রশ্নে নাজেহাল হয়ে এক সময় ভূপেশ গুপ্ত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। যাবার সময় প্রমোদ দাশগুপ্তকে লক্ষ্য করে বলে গেলেন, 'তুমি এদের মাথা খেয়েছ। মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছ।'

উনচল্লিশ

১৯৬০ সাল ভারতবর্ষের কম্যুনিষ্ট পার্টির ও কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের এক ক্রান্তিলগ্ন। ১৯৬০ থেকে ১৯৬৪ এই চার বছর পশ্চিমবাংলা ও ভারতবর্ষের কম্যুনিষ্ট পার্টি বিভিন্ন পরিবর্তন ও কর্মকাণ্ডে উত্তাল হয়ে ওঠে। ১৯৬০ সাল থেকেই কম্যুনিষ্ট পার্টির মধ্যে তত্ত্ব ও মতাদর্শের বিতর্ক তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠে। কম্যুনিষ্ট

আন্দোলন তখনও পর্যন্ত দেশভেদে বিচ্ছিন্ন নয়। একই সূত্রে গ্রথিত। রাশিয়া, চীন, ভারতবর্ষের কম্যুনিষ্ট পার্টি পরস্পরের সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ট। ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির মধ্যে দুই মতের লড়াই প্রধানতঃ ছিল বিশ্ব কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের দুই মতের লড়াইয়ের প্রতিফলন।

পর পর বিশ্ব কম্যুনিষ্ট আন্দোলনে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল। মস্কোতে বসল বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক ও কম্যুনিষ্ট ওয়ার্কার্স পার্টির সম্মেলন। ৮১টি পার্টি এই সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করে। চীন কম্যুনিষ্ট পার্টি এই সম্মেলনে থেকে বেরিয়ে যায়। লেনিনের নব্বইতম জন্মবার্ষিকীর প্রাক্কালে চীনের কম্যুনিষ্ট পার্টির তাত্ত্বিক মুখপত্রে সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হল—'লেনিনবাদ দীর্ঘজীবী হোক।' আরও পরে ১৯৬৩ সালের ৩০শে মার্চ সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এক চিঠি লিখল চীন কম্যুনিষ্ট পার্টিকে। ১৪ই জুন চীন কম্যুনিষ্ট পার্টি সেই চিঠির জবাব দিল সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট পার্টিকে। ১৪ই জুনের চিঠি এক ঐতিহাসিক দলিলে পরিণত হল।

ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে কম্যুনিষ্ট পার্টির মধ্যে সোভিয়েত-চীন কম্যুনিষ্ট পার্টির তত্ত্বের লড়াই প্রতিফলিত হচ্ছিল প্রাতটি স্তরেই। ১৯৬০ সালে এবং ১৯৬১ সালে কিছু দিনের ব্যবধানে পশ্চিমবঙ্গের দুই কম্যুনিষ্ট নেতা চীন এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ঘুরে এলেন। হরেকৃষ্ণ কোঙার সুযোগ পেয়েছিলেন ভিয়েতনাম যাবার। ভিয়েতনামে কিছুদিন থেকে অতি গোপনে চলে যান চীনে। সেখানে হরেকৃষ্ণ কোঙার বেশ কয়েকদিন থাকেন। চীন-সোভিয়েত মতাদর্শের লড়াইয়ে চীনের অবস্থিতি কি এবং কোথায় তা' তিনি বুঝে নেন। হরেকৃষ্ণ কোঙার দেশে ফিরে এসে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা একটি দলিলের মাধ্যমে গোপনে সকলের গোচরে আনেন। প্রমোদ দাশগুপ্ত রাশিয়ায় যান। বেশ কিছুদিন রাশিয়ায় থেকে তাঁর অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে আসেন।

প্রমোদ দাশগুপ্ত রাজ্যপার্টির সম্পাদক হবার কয়েক মাস পরেই বেজওয়াদায় বসল পার্টি কংগ্রেস। ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির ইতিহাসে বেজওয়াদা পার্টি কংগ্রেস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতা সুসলভ এই পার্টি কংগ্রেসে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত উপস্থিত ছিলেন। বেজওয়াদা পার্টি কংগ্রেসে দেখা গেল, চীন-সোভিয়েট নীতির প্রশ্নে চীনের দিকে পাল্লা বেশ ভারী। সুসলভ দেখলেন, ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টিতে চীনের প্রভাব সোভিয়েতের প্রভাবকে পেছনে ফেলে

দিয়েছে। বেজওয়াদা পার্টি কংগ্রেসে প্রমোদ দাশগুপ্ত কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে নির্বাচিত হলেন।

প্রকৃতপক্ষে ১৯৫৭ সাল থেকেই প্রমোদ দাশগুপ্ত কম্যুনিষ্ট পার্টির মধ্যে সংশোধনবাদী ঝোঁকের বিরুদ্ধে লড়াই সুরু করে পার্টিকে গ্রামে ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা সুরু করেন। স্বভাবতই বর্ধমান পার্টি সম্মেলনে পার্টি সম্পাদক হয়ে তাঁর প্রথম ধ্বনি হ'ল 'গ্রামে চল, গ্রামে যাও, গ্রামে সংগঠন করো।' প্রমোদ দাশগুপ্তের ধারণায় ভারতের বিপ্লবের বর্তমান স্তরে কৃষি-বিপ্লবই লক্ষ্য হওয়া উচিত। সেই লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য কৃষকদের সংগঠিত করতে হ'বে। তাই প্রমোদ দাশগুপ্ত রাজ্য কমিটির সম্পাদক হবার পর কম্যুনিষ্ট পার্টির শাখা-সংগঠনগুলির মধ্যে কৃষক সভাই সবচাইতে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। অবশ্য, প্রমোদ দাশগুপ্ত কৃষক সভার সংগঠনে হরেকৃষ্ণ কোঙার ও বিনয় চৌধুরীর মতো দু'জন সুযোগ্য নেতার সহযোগিতা পেয়েছিলেন। ৮০-র দশকে কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্য সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ লক্ষে পৌছনোর মধ্য দিয়েই প্রমোদ দাশগুপ্তের 'গ্রামে চলো, কৃষকদের সংগঠিত করো'—এই আহ্বান কত কার্যকরী হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

প্রমোদ দাশগুপ্ত রাজ্যপার্টির সম্পাদকরূপে রাজ্যদলের নেতৃত্বে যত ব্যস্তই থাকুন না কেন, পার্টি-পত্রিকা এবং অন্যান্য প্রচার-পত্রিকার উপর থেকে নজর কমালেন না। ষাটের দশকে রাজ্য কমিটির সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটির বিশিষ্ট নেতা, কিন্তু পত্র-পত্রিকার ব্যাপারে সেই পুরণো প্রমোদ দাশগুপ্ত। স্বাধীনতা পত্রিকার জন্য চীন থেকে নতুন রোটারী মেসিন এল। বসানো হল ২৫ নম্বর পার্ক লেন-এ। সেই রোটারী মেসিনে ছাপা হতে লাগল স্বাধীনতা পত্রিকা। কোথায় পত্রিকার প্রচার-সংখ্যা বাড়াতে হবে, কোথায় পত্রিকার দাম বাকি পড়েছে, তার হিসাব প্রমোদ দাশগুপ্তের মুখস্ত। তিনি রাজ্য-পার্টির সম্পাদক হবার পর পার্টির পত্র-পত্রিকার উপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তার ফলে, রাজ্যপার্টির শুধু একটি মুখপত্র নয়, প্রতিটি শাখা-সংগঠনেরও মুখপত্র রয়েছে।

চল্লিশ

১৯৬২ সালে তৃতীয় সাধারণ নির্বাচন। নির্বাচনের সামান্য কিছুদিন আগে প্রয়াত হলেন ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক অজয় ঘোষ। অজয়

ঘোষ ছিলেন পার্টির মধ্যে কিছুটা মধ্যপন্থী। সেই পালঘাট কংগ্রেস থেকে দলের মধ্যে যে অন্তর্বিরোধ ধাপে ধাপে বেড়ে উঠেছিল, বেজওয়াদা পার্টি কংগ্রেসে এসে যে বিরোধ পার্টিকে প্রায় ভাগাভাগির মুখে এনে দাঁড় করায়, সেই বিরোধের মুখে দুই পক্ষকে এক সঙ্গে ধরে রাখবার কৃতিত্ব ছিল অজয় ঘোষের।

অজয় ঘোষের মৃত্যুর পর পার্টির মধ্যে এই বিরোধ আর এক ধাপ বেড়ে গেল। দিল্লীতে জাতীয় পরিষদের বৈঠকে এস এ ডাঙ্গেকে চেয়ারম্যান ও ই এম এস নামবুদিরিপাদকে সম্পাদক করে এই বিরোধকে চাপা দেবার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু সেটা নিতান্তই সাময়িক। অজয় ঘোষের মৃত্যুর পর যে কেন্দ্রীয় সম্পাদক মণ্ডলী গঠিত হয় তাতে স্থান পান জ্যোতি বসু, পি সুন্দরাইয়া, গোবিন্দন নায়ার, জেড এ আমেদ, যোগীন্দ্র শর্মা। কিন্তু এ কথা পরে।

রাজ্য-পার্টির সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব নেবার পর প্রমোদ দাশগুপ্ত এই প্রথম সর্বময় কর্তৃত্বে নির্বাচন পরিচালনা করলেন। ১৯৬২ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী নির্বাচন সুরু হয়। নির্বাচন চলে দশদিন ধরে। ৬২-র নির্বাচনের ঠিক আগে কম্যুনিষ্ট পার্টি এক প্রবীন নেতাকে হারালো। তিনি হলেন বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়। প্রমোদ দাশগুপ্ত দলের সম্পাদক হয়ে কংগ্রেস-বিরোধী ফ্রন্ট গঠনে সব বামপন্থী দলকে এক মঞ্চে আনতে সচেষ্ট হলেন। সফলও হলেন! '৬২ সালের নির্বাচনেই সর্বপ্রথম প্রকৃত বামপন্থী দলগুলি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হল। এই দলগুলি হ'ল: কম্যুনিষ্ট পার্টি, ফরওয়ার্ড ব্লক, আর-এস-পি, এস ইউ-সি, মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক ও আর-সি-পি-আই। ১৬ই নভেম্বর ময়দানে এক বিরাট সমাবেশে বাম-যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন অভিযান সুরু হল।

পশ্চিমবঙ্গের এই নির্বাচনের মুখে ছয়টি বামদলের ঐক্যবদ্ধ হওয়া খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, চীনের সঙ্গে সীমান্ত-বিরোধ নিয়ে আগে থাকতেই জল বেশ ঘোলা হতে সুরু করেছিল। চীন প্রসঙ্গে কম্যুনিস্ট পার্টির মনোভাবের সঙ্গে অনেক বামদলই একমত ছিল না। কিন্তু এই রাজ্যে কংগ্রেসকে পরাজিত করতে ছ'টি বামদল ঐক্যবদ্ধ হল।

ময়দানের সভাতেই প্রমোদ দাশগুপ্ত ঘোষণা করলেন: কংগ্রেসের বিকল্প যুক্তফ্রন্ট। যুক্তফ্রন্ট রাজ্যে বিকল্প সরকার গঠন করতে চায়।

২রা ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু কলকাতায় এলেন কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রচার অভিযানে। বিভিন্ন সভায় তিনি বারবার চীনের প্রসঙ্গ তুলে

চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষে কম্যুনিষ্ট পার্টির ভূমিকার সমালোচনা করলেন। তিনি ফরওয়ার্ড ব্লকেরও সমালোচনা করলেন কম্যুনিষ্ট পার্টির সঙ্গে নির্বাচনী সমঝোতা করায়। প্রধানমন্ত্রী কলকাতার সভায় চীনের সমালোচনা করায় সভায় উপস্থিত কয়েকজন চীনা কূটনীতিবিদ্ সভা ছেড়ে চলে যান। '৬২ সালের নির্বাচনে চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষ খুবই প্রভাব বিস্তার করেছিল।

নির্বাচনী ফলাফলে কংগ্রেস জয়ী হ'ল। তবে '৫৭-র নির্বাচনের তুলনায় বামপন্থীদের শক্তি বৃদ্ধি পেল। বিশেষ করে লোকসভায়। পশ্চিমবঙ্গ থেকে বামপন্থী দলের ১২ জন সদস্য লোকসভায় নির্বাচিত হলেন। রাজ্য বিধানসভায় ৯৫ জন কংগ্রেস-বিরোধী সদস্য নির্বাচিত হন। মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় এই নির্বাচনে শুধু কলকাতা-নির্ভর হয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে না পেরে বউবাজার এবং শালতলা— দুই কেন্দ্রের প্রার্থী হয়েছিলেন। কলকাতায় তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন কম্যুনিষ্ট পার্টির বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় দু'টি কেন্দ্র থেকেই জয়ী হন। বরানগর কেন্দ্র থেকে বিপুল ভোটের ব্যবধানে জয়ী হলেন জ্যোতি বসু। নতুন বিধান সভায় জ্যোতি বসু বিরোধীদলের নেতা হিসাবে স্বীকৃতি পান।

১৯৬২ সালে চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে ভারতরক্ষা আইন জারি হল। কম্যুনিষ্ট পার্টির বহু নেতা ও কর্মী এই আইনের বলে গ্রেপ্তার হ'লেন। কম্যুনিষ্ট পার্টির মধ্যে প্রধানতঃ যাঁরা বামপন্থী, গ্রেপ্তার হলেন তাঁরাই। কম্যুনিষ্ট পার্টির মধ্যে তখন ডাঙ্গেপন্থী এবং বামপন্থী বলে দুটি কথা চালু হয়ে গিয়েছে। চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষ কম্যুনিষ্ট পার্টির মধ্যেকার বিরোধকে তীব্র করে তুলল। বামপন্থীরা যখন গ্রেপ্তার হলেন তখন কম্যুনিষ্ট পার্টির মধ্যে একটা কথা চালু হয়ে গিয়েছিল যে ডাঙ্গেপন্থীরা পুলিশের হাতে যে তালিকা তুলে দিয়েছিল, সেই তালিকা অনুযায়ী বামপন্থীদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

সারা দেশে একটা কম্যুনিষ্ট-বিরোধী জেহাদ সুরু হল। পশ্চিমবঙ্গে বুদ্ধিজীবী বলে পরিচিত কয়েকজন কম্যুনিষ্ট পার্টির মধ্যে বামপন্থীদের চীনাপন্থী বলে চিহ্নিত করে ব্যাপক প্রচার অভিযান সুরু করলেন। সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অম্লান দত্ত, প্রমথনাথ বিশী প্রমুখ ব্যক্তিরা কেউ চীনকে আখ্যা দিলেন যুগ যুগ পররাজ্যগ্রাসী, কেউ বললেন যুদ্ধই হ'ল চীনের ধর্ম। সেই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট কম্যুনিষ্ট নেতা, বিশেষ করে জ্যোতি বসুকে লক্ষ্য করে নানাপ্রকার উস্কানিমূলক বক্তৃতা ও

লেখা প্রকাশিত হতে লাগল। সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বললেন, 'ভারতে দেশ-প্রেমের জোয়ার নেবেছে, খর্বাকৃতি জ্যোতি বসুর সাধ্য নেই তাকে রোধ করে।' কমলাকান্ত শর্মা ছদ্মনামে প্রমথনাথ বিশী লিখলেন, 'এক চোখেতে কাঁদি আমি / এক চোখেতে হাসি। / চীনদরদের রঙ্গ দেখে / ও ভাই বঙ্গবাসী।' ১৮ই নভেম্বর তারিখের একটি পত্রিকায় 'মিলন-জ্যোতি' শিরোনামে এক সম্পাদকীয়তে জ্যোতি বসুকে আক্রমণ করা হল।

২১শে নভেম্বর তারিখে চীন যেদিন ম্যাকমোহন লাইনের ২৫ কিলোমিটার দূরে সৈন্য সরিয়ে নিয়ে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করল, ঠিক সেইদিনই সারা ভারতবর্ষে কম্যুনিষ্ট পার্টির বহু বিশিষ্ট নেতাকে গ্রেপ্তার করা হল। গ্রেপ্তার হলেন পি সুন্দরাইয়া, অচ্যুত মেনন, কল্যাণ সুন্দরম্, দিনকর মেহতা প্রমুখ। পশ্চিমবঙ্গে জ্যোতি বসু, প্রমোদ দাশগুপ্ত, সরোজ মুখার্জী, মুজফ্‌ফর আহমেদ, গণেশ ঘোষ, হরেকৃষ্ণ কোঙার, নিরঞ্জন সেন, কনক মুখার্জী, আব্দুল হালিম, নারায়ণ চৌবে, চারু মজুমদার, সুশীতল রায়চৌধুরী প্রভৃতি। গ্রেপ্তারের পর একটি দৈনিক পত্রিকায় 'ব্যানার হেডলাইন'-এ প্রকাশিত হ'ল, "সারা দেশে দেশদ্রোহীদের গ্রেপ্তার।" সম্পাদকীয় নিবন্ধে শিরোনাম হ'ল। 'চোর কাঁটা বাছাই।"

২১শে নভেম্বরের পটভূমিতে জ্যোতি বসু ও প্রমোদ দাশগুপ্তের একটি সুন্দর বর্ণনা রয়েছে স্নেহাংশুকান্ত আচার্যের 'কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্ত' শিরোনামে একটি লেখায়: "যেদিন প্রমোদবাবু ও জ্যোতি বসু ধরা পড়েন সেদিনটা আমার খুবই মনে পড়ে। আমি তার আগে বিদেশে ছিলাম এবং পশ্চিম আফ্রিকায় আফ্রো-এসিয়ান আইনজীবি সম্মেলন শেষ করে ৫ই নভেম্বর দেশে ফিরি। দেশে ফেরার পরে দেখলাম প্রমোদবাবু এবং জ্যোতিবাবু দু'জনেই প্রায় প্রতি সন্ধ্যাবেলায় আমার ওখানে আসতেন এবং রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর তাঁদের পৌঁছে দেওয়া হত। যে রাত্রের কথা বলছি সেটা হচ্ছে ২০শে নভেম্বর, ১৯৬২ সাল। সেই রাত্রে প্রমোদবাবু এবং জ্যোতিবাবুকে আমার গাড়ি খাওয়া দাওয়ার পর পৌঁছে দেবার জন্য বেরোলো এবং আমি আমার গাড়ির চালককে বললাম যে কি হল সেটা যেন আমাকে জানানো হয়। সেই গাড়িতে আমার এক ভাগ্নীও ছিল। সে জ্যোতিবাবুর বাড়ির কাছে থাকতো। রাত্রে ফিরে আসার পর আমি যখন তাকে পরিস্থিতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, তখন গাড়ির চালক আমাকে বলল, 'জ্যোতিবাবুর বাড়ি পর্যন্ত একটা গাড়ি আমার গাড়ির পেছনে গেল এবং যখন জ্যোতিবাবুকে বাড়ি ছেড়ে প্রমোদবাবুকে ছাড়তে যাচ্ছিলাম তখন সার্কুলার

রোড এবং পার্ক ষ্ট্রীটের মোড়ে সেই গাড়িটা সরে গেল। তারপর মনে হলো যেন আর একটা গাড়ি আমার গাড়ির পেছনে।' আমি তখনই বুঝলাম যে, এটা বোধহয় অন্য থানার এলাকা বলে পুলিশ অন্য গাড়ির ব্যবস্থা করেছে। সেই রাত্রে, যদিও ইংরাজী মতে ২১শে নভেম্বর প্রায় রাত ৩টার সময় আমাকে 'স্বাধীনতা' অফিস থেকে অধীর চক্রবর্তী টেলিফোনে জানালেন যে চীনা সৈন্য নিজেরাই ম্যাকমোহন লাইনের ২৫ কিঃ মিঃ দূরে সরে গিয়ে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করেছে। তারপর আমি নিশ্চিন্ত মনে আবার ঘুমোতে আরম্ভ করলাম। কিন্তু ভোর ৫টায় আবার টেলিফোন এলো যে প্রমোদবাবু, জ্যোতিবাবু এবং বহু নেতাকে ভোরে তাঁদের বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গিয়ে বিনা বিচারে বন্দী করা হয়েছে।"

এদিনের আরও একটি বর্ণনা দিয়েছেন শান্তিময় গুহ। সেই বর্ণনায় তিনি বলেছেন: "১৯৬২-র ২১শে নভেম্বরের রাত সাড়ে বারোটা ১টা হবে, স্বাধীনতা থেকে ফোন করে প্রমোদদাকে জানাল—চীন একতরফা ভাবে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেছে। ফোন ছেড়ে ফিরে আসার সময় তাঁর মুখে দেখেছিলাম একটা বিরাট রাজনৈতিক সংগ্রামের জয়ের আনন্দ। রাত তিনটে-সাড়ে তিনটের সময় অফিসের দরজায় কড়া নড়ে উঠলে প্রমোদদা উঠে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেন। ফিরে আসতে আসতে বললেন 'পুলিশ'। দরজা খুলে পুলিশ অফিসারকে বললেন, 'কি, যেতে হবে?' অফিসারের মুখে শব্দহীন হাসি। ফিরে আসতে আসতে বললেন সিজ ফায়ারও হল আপনারাও এলেন'। 'তাই নাকি স্যার?' 'কেন শোনেননি—রাত ১২টার পর চীন সিজ ফায়ার ঘোষণা করেছে।' 'খুব ভাল হল স্যার—'। 'ভাল বলছেন আবার এ্যারেস্ট করছেন—'। প্রমোদদার এই তীক্ষ্ণ শ্লেষ ও ব্যাঙ্গোক্তি সরকারী নীতির মুখোশটাকে যেন ছিন্ন ভিন্ন করে আছড়ে ফেলল। হিটারের উপর কেটলিতে চায়ের জল চাপাতে চাপাতে বললেন, 'আর কোথাও যাবার প্রোগ্রাম নেই তো।' 'না না স্যার, আপনি গুছিয়ে নিন আমি বসছি।'

"আমাকে প্রমোদদা বললেন, 'কাকাবাবুকে ফোন করে দেখ।' ফোন করতে কাকাবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, এখানেও এসেছে।' সেদিন যাবার আগে প্রমোদদাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারিনি। যতবারই জিজ্ঞাসা করব ভেবেছি ততবারই তাঁর উপদেশের কথা মনে পড়ায় সংযত হয়েছি। পার্টি অফিসে আসার কয়েকদিন পর, একদিন রাত্রে প্রমোদদা আমাকে বললেন, 'এখানে অনেক কিছু দেখবে, শুনবে। যেগুলি পার্টির নেতৃত্বের বিষয়, অন্যেরা সে সব জানার চেষ্টা করবে।

কাউকে কিছু বলবে না। আর মনে রাখবে তোমার যা জানার নয় তার জন্য কৌতুহল প্রকাশ করবে না।' সেদিন বারবারই মনে হচ্ছিল—যদি অনধিকার চর্চা হয়। যাবার সময় প্রমোদদা নিজেই বললেন, '৩১শের পর (ডিসেম্বর) পার্টি অফিস ও-বাড়িতে (৩৩নং আলিমুদ্দীন ষ্ট্রীট) চলে যাবে—ওখানে থাকতে পারবে না—কড়েয়া রোডে গিয়ে থেকো।' পরদিন দশটা বাজতে না বাজতেই যারা কদাচিৎ পার্টি অফিসে আসতেন—বিশ্বনাথ মুখার্জি, ভবানী সেন, সোমনাথ লাহিড়ী প্রমুখ অফিসে এসে বসলেন। এর কারণ কি তা ইতিহাসই বলবে।"

মতাদর্শের কারণে যে প্রক্রিয়া সুরু হয়েছিল, চীন-ভারত সংঘর্ষ এবং কম্যুনিষ্ট পার্টির মধ্যে বামপন্থী হিসাবে পরিচিতদের গ্রেপ্তার সেই প্রক্রিয়াকে তীব্রতর করে পার্টি ভাগকে ত্বরান্বিত করে দিল। পশ্চিমবঙ্গে কম্যুনিষ্ট পার্টির যে সমস্ত নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তাঁদের বেশীর ভাগকেই রাখা হয়েছিল দমদম জেলে। মুজফ্‌ফর আহমেদ, জ্যোতি বসু, হরেকৃষ্ণ কোঙার, সরোজ মুখোপাধ্যায়—সকলেই ছিলেন দমদম জেলে।

একচল্লিশ

প্রমোদ দাশগুপ্ত বন্দী হবার আগেই বুঝতে পেরেছিলেন পার্টির খারাপ দিন আসছে। চীন-ভারত সংঘর্ষ সুরু হতেই পার্টির ভেতরের এবং বাইরের পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। বাইরের শ্রেণী শত্রুরা এবং ভেতরের সংশোধন-বাদীরা কি জাতীয় আঘাত হানতে পারে সেই ভাবনা ভেবে প্রমোদ দাশগুপ্ত নিজেকে প্রস্তুত করেছিলেন। পার্টি বে-আইনী হতে পারে। পার্টির সংগঠন-দপ্তর বেদখল হতে পারে। সেই আগাম ভাবনায় বিকল্প গোপন সংগঠন গড়ে তুলে সমর মুখার্জিকে কর্তৃত্ব দিলেন। সমর মুখার্জি আত্মগোপন করে যে ভাবে গোপন সংগঠনের পরিচালনা করেছিলেন এবং শোধনবাদের বিরুদ্ধে লড়াই-এ নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সে এক আসাধারণ কাহিনী।

প্রমোদ দাশগুপ্ত এবং অন্যান্য নেতারা গ্রেপ্তার হবার পর বিশ্বনাথ মুখার্জি, সোমনাথ লাহিড়ী প্রমুখ পার্টি দপ্তর, পার্টি পত্রিকা—সবই নিজেদের হাতে নিয়ে নেন। প্রমোদ দাশগুপ্ত গ্রেপ্তার হবার পর আব্দুল্লা রসুল দলের অস্থায়ী সম্পাদক হিসাবে কাজ চালাতে থাকেন। কিন্তু তিনিও পরে গ্রেপ্তার হয়ে যান। বিশ্বনাথ

মুখার্জি, সোমনাথ লাহিড়ী প্রমুখ নেতারা রাজ্য-পরিষদ ভেঙে দিয়ে 'পি-ও-সি' গঠন করে পার্টির সব কর্তৃত্ব নিজেদের হাতে নিয়ে নেন।

সমর মুখার্জির নেতৃত্বে পরিচালিত গোপন সংগঠন নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে ছিল না। পার্টি কর্মীদের মধ্যে সংযোগ রক্ষা এবং সঠিক তথ্য পরিবেশনের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা হয় 'দেশহিতৈষী' পত্রিকা। সম্পাদক হন মোহিত মৈত্র। পরবর্তীকালে পার্টি ভাগ হয়ে সি পি আই (এম) গঠনে এই 'দেশ হিতৈষী' পত্রিকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

১৯৬৩ সালে কার্যত পার্টি দু'ভাগ হয়ে যায় কাজের মধ্য দিয়ে। পার্টি অফিস, প্রেস এবং অন্য সব সংগঠন ভবানী সেন, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, সোমনাথ লাহিড়ী প্রমুখদের হাতে। পার্টির মধ্যেকার বামপন্থীদের হাতে মাত্র পার্টির প্রকাশনা বিভাগ। প্রকাশনা বিভাগকে কেন্দ্র করেই বামপন্থীরা নিজেদের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখলেন। পার্টির বেশীর ভাগ বামপন্থী নেতাই জেলে। অন্যেরা আত্মগোপন করে আছেন। বামপন্থীদের অন্য কোন কাজ করবার মতো সুযোগও নেই সংগঠনও নেই।

এই সময়ে জেলের ভেতরে ও বাইরে বামপন্থী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা সিদ্ধান্ত নিলেন যে ৫ই আগস্ট মুজফ্‌ফর আহমেদের জন্মদিন পালন করা হবে। এই জন্মদিন পালনের মধ্যে দিয়েই পার্টি কর্মীরা নিজেদের সংগঠিত করবেন। জেলের ভেতরে ও বাইরে ৫ই আগস্ট মুজফ্‌ফর আহমেদের জন্মদিন পালনের জন্য বিপুল প্রস্তুতি সুরু হল। প্রস্তুতি কমিটির নামে একটি যুক্ত আবেদন পত্র প্রকাশ করা হল। রাজ্যের বাম ও গণতান্ত্রিক দলগুলির কাছে জানিয়ে দেওয়া হল ৫ই আগস্ট জন্মদিন পালনের কর্মসূচী। জেলের বাইরে জন্মদিন পালনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন পীযুষ দাশগুপ্ত। এই দিনের কর্মসূচী ছিল : সারা রাজ্য জুড়ে সভা-শোভাযাত্রা। একটি শোভাযাত্রা সংগঠিত করা হবে কলকাতা থেকে দমদম জেল পর্যন্ত। দমদম জেলে এই শোভাযাত্রা মুজফ্‌ফর আহমেদকে মাল্যভূষিত করবে। সন্ধ্যায় রামমোহন লাইব্রেরী হলে জন্মজয়ন্তী সভা অনুষ্ঠিত হবে।

৫ই আগস্ট মুজফ্‌ফর আহমেদের জন্মদিন পালন করা হল। দেশ বিদেশের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই উপলক্ষ্যে বাণী পাঠালেন। সুবিশাল মিছিল গেল দমদম জেলে। রামমোহন লাইব্রেরী হলে অনুষ্ঠিত সভায় তিল ধারণের স্থান ছিলনা। এই সভায় মুজফ্‌ফর আহমেদ সহ অন্যান্য আটক ব্যক্তিদের মুক্তির দাবী করা

হল। এই সভাতেই ঘোষণা করা হল নতুন পত্রিকা প্রকাশ করা হবে। নাম হবে 'দেশহিতৈষী'।

জেলে থাকাকালেই জ্যোতি বসুর পিতৃবিয়োগ ঘটে। জ্যোতি বসুকে শ্মশানযাত্রা ও শ্রাদ্ধসভায় উপস্থিত থাকবার জন্য প্যারোলে মুক্তি দেওয়া হ'ল।

দমদম জেলের মধ্যেই পার্টির কর্মসূচী সম্পর্কে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের খসড়া তৈরি করা হয়। দমদম জেলের মধ্যেই একটা পি-সি মিটিং হয়। এই মিটিং-কে ঐতিহাসিক জেল পি-সি মিটিং বলা হয়ে থাকে। জেলের ভেতর থেকেই বাইরের পার্টি কর্মীদের উদ্দেশ্যে সংগ্রামের নির্দেশ দেওয়া হতে থাকে। 'দেশহিতৈষী' পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে এবং অন্যান্য কাজেও জেল থেকে নির্দেশ যায়।

১৯৬৩ সালের শেষদিকে কম্যুনিষ্ট পার্টির বন্দী নেতারা একে একে মুক্তিলাভ করেন। সব চাইতে শেষে মুক্তি পান প্রমোদ দাশগুপ্ত। ১৯৬৪ সালের ২৬শে জানুয়ারী প্রমোদ দাশগুপ্ত মুক্তি পান। জেল থেকে মুক্ত হয়ে প্রমোদ দাশগুপ্ত দেখলেন পি ও-সি-র নেতারা পার্টি দখল করে আছে। পার্টি অফিসও তাঁদের দখলে। রাজ্য কমিটির সম্পাদক হিসাবে প্রমোদ দাশগুপ্ত ১৯৬৪ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী রাজ্য পরিষদের এক সভা ডাকলেন। সভা বসল ৬৪ নম্বর লোয়ার সার্কুলার রোডে। সভা সুরুর কয়েক মিনিটের মধ্যে পি-ও-সি-র ১৭ জন নেতা সভা ত্যাগ করে গেলেন। এই ১৭ জন নেতার বৈঠক ত্যাগ প্রকৃতপক্ষে পশ্চিম-বাংলায় পার্টি ভাগের সূচনা। এর পর দিল্লীতে বসল জাতীয় পরিষদের বৈঠক। ৮০ জন সদস্য নিয়ে কম্যুনিষ্ট পার্টির জাতীয় পরিষদ। এই বৈঠকে উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে ৩২ জন পার্টি নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রস্তাব তুললেন। এই বিদ্রোহী ৩২ জনের মধ্যে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুজফ্‌ফর আহমেদ, প্রমোদ দাশগুপ্ত, হরেকৃষ্ণ কোঙার, আব্দুল হালিম, সরোজ মুখার্জী ও জ্যোতি বসু। এই ৩২ জন জাতীয় পরিষদের সদস্য ১৯৬৪ সালের ১১ই জুলাই অন্ধ্র প্রদেশের তেনালীতে 'কনভেনশন' আহ্বান করল। তেনালী 'কনভেনশন'-এর আগে ৩২ জন সদস্যের নামে এক বিবৃতি প্রচারিত হয়। এই বিবৃতিতে কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বের এক অংশের দক্ষিণপন্থী ঝোঁক এবং পার্টিকে সংশোধনবাদের খোঁয়াড়ে নিয়ে যাবার অভিযোগ তুলে সংশোধনবাদীদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তেনালী কনভেনশন-এ সিদ্ধান্ত হয় ১৯৬৪ সালের

৩১শে অক্টোবর থেকে ৭ই নভেম্বর কলকাতায় কম্যুনিষ্ট পার্টির ৭ম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হবে।

১৯৬৪ সালের ৩১শে অক্টোবর কম্যুনিষ্ট পার্টির ৭ম পার্টি কংগ্রেস সুরু হবার মুখেই পুলিশ গ্রেপ্তার করল মুজফ্‌ফর আহমেদ, প্রমোদ দাশগুপ্ত, হরেকৃষ্ণ কোঙার প্রমুখকে। পার্টি নেতারা গ্রেপ্তার হলেও কলকাতার ত্যাগরাজ হলে পার্টি কংগ্রেসের অনুষ্ঠানে কোন বাধা হল না। পি সুন্দরাইয়া পার্টি কংগ্রেসে নতুন সম্পাদক হলেন। প্রমোদ দাশগুপ্ত এবং জ্যোতি বসু পলিটব্যুরোতে নির্বাচিত হলেন। ময়দানে পার্টি কংগ্রেসের প্রকাশ্য সমাবেশ হল। এই সমাবেশে সভাপতিত্ব করলেন জ্যোতি বসু। নতুন নামে কম্যুনিষ্ট পার্টির জন্ম হল—কম্যুনিষ্ট পার্টি (মার্ক্‌সবাদী)।

কম্যুনিষ্ট পার্টি (মার্ক্‌সবাদী) গঠিত হল। কিন্তু পশ্চিমবাংলার পার্টির বেশীর ভাগ নেতাই জেলে। মার্ক্‌সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির সেদিনের প্রথম কাজ ছিল বন্দীমুক্তির দাবীতে আন্দোলন গড়ে তোলা। বন্দীমুক্তির দাবীতে একটি মিছিল সংগঠিত হয়েছিল দেশবন্ধু পার্ক থেকে দমদম জেল পর্যন্ত। ১৯৬৫ সালে এই আন্দোলন, মিছিল প্রভৃতির নেতৃত্বে ছিলেন জ্যোতি বসু। ১৯৬৫ সালের জুলাই মাসে কম্যুনিষ্ট পার্টি (মার্ক্‌সবাদী)-র প্রথম ইংরেজী মুখপত্র প্রকাশিত হয়। সম্পাদক জ্যোতি বসু।

১৯৬৫ সালের আগস্ট মাসে রাজ্যসরকার ট্রামভাড়া বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে উঠল। এই প্রতিবাদ আন্দোলনে জ্যোতি বসু গ্রেপ্তার হন।

১৯৬৬ সাল। কম্যুনিষ্ট পার্টি (মার্ক্‌সবাদী) নেতারা বেশীর ভাগই জেলে। জেলের বাইরে থেকে বন্দীমুক্তি আন্দোলন গড়ে তোলার মতন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন না বললেই চলে। কিন্তু সেই দিন সি পি আই (এম)-এর নীতি ও কর্মসূচীকে আন্দোলনের মাধ্যমে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন পার্টির অতি সাধারণ স্তরের কর্মীরা। ১৯৬৫-৬৬ সালের সেই সব দিনগুলিতে দেশলাই কাঠির মতো বারুদের দুর্গে আগুন লাগাবার কাজ করেছিল গ্রামে ও সহরে এইসব কর্মীরা। এই ৮০-র এর দশকে রাজ্য সি পি আই (এম)-এর যে তরুণ নেতৃত্ব প্রভাবশালী ভূমিকায়, সেই বিমান বসু, অনিল বিশ্বাস, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, সুভাষ চক্রবর্তী, শ্যামল চক্রবর্তী দীনেশ মজুমদার (প্রয়াত) প্রমুখ সকলেই ৬৪ সালের পর

পার্টিতে এসেছেন। আরও অনেকে ছিলেন যাঁরা ছাত্র আন্দোলনে বিশেষভাবে যুক্ত থেকে পার্টি গড়ে তোলার কাজে বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাঁদের অনেকেই বসে পড়েছেন। অনেকেই সি পি আই (এম এল)-এ যোগ দিয়ে নেতৃস্থানীয় হয়েছেন। তবে এই সময়ে কলকাতায় বন্দীমুক্তি ও পার্টির কাজে একজনের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি হলেন সত্যানন্দ ভট্টাচার্য।

বিয়াল্লিশ

১৯৬৬ সালের পশ্চিমবাংলা। পশ্চিমবাংলার এই এক বছরের ইতিহাস সারা ভারতবর্ষের রাজনীতির মোড় ঘোরার ইতিহাস। জওহরলাল নেহরু প্রয়াত হয়েছেন। প্রয়াত হয়েছেন লালবাহাদুর শাস্ত্রী। ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীর আসনে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। পশ্চিমবাংলার প্রয়াত হয়েছেন বিধানচন্দ্র রায়। মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন প্রফুল্ল চন্দ্র সেন।

নেহরুর জীবিতকালেই সর্বভারতীয় কংগ্রেস দলে দুই মতের লড়াই সুরু হয়ে গিয়েছিল। নেহরুর মৃত্যুর পর তা' তীব্র হয়ে উঠল। কামরাজ পরিকল্পনার নামে এই মতবিরোধের একটা শক্তি পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে। সারা ভারতে কংগ্রেসের মধ্যে একটা নতুন করে ভাঙন দেখা দেবার মুখে।

কিন্তু তার আগেই দেখা দিল পশ্চিমবালার কংগ্রেস দলে ভাঙন। প্রবীণ গান্ধীবাদী নেতা অজয় মুখোপাধ্যায়কে কংগ্রেস থেকে বিতাড়ণের মধ্য দিয়ে রাজ্য কংগ্রেসে ভাঙন সুরু হয়।

১৯৬৫ সালের ২৫শে জুলাই তারিখের দৈনিক বসুমতী পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদে হতচকিত হয়েছিল পশ্চিমবাংলার মানুষ। তাদের কাছে এই সংবাদ অবিশ্বাস্য মনে হয়েছিল। তৎকালীন বাংলা কংগ্রেসের সম্পাদক সুশীল ধাড়া যখন এই সংবাদ এসপ্লানেড-এ কে সি দাশের দোকানে আনন্দবাজার, স্টেটস্‌ম্যান, অমৃতবাজার ও বসুমতীর সাংবাদিকদের কাছে বিবৃত করেছিলেন, তখন একমাত্র বসুমতী ছাড়া অন্য কোন পত্রিকাই বিশ্বাস করে এই সংবাদ প্রকাশ করতে পারেনি। সংবাদটি ছিল: ২৩শে জুলাই সোয়া এগারোটায় অজয় মুখোপাধ্যায়কে অভুক্ত অবস্থায় মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেস ভবন থেকে বের করে দিয়েছিলেন চারুচন্দ্র মহান্তি, সুবোধ মাইতি ও প্রবীর জানা।

২৭শে জুলাই একই ভাবে অভুক্ত অবস্থায় মেদিনীপুর থেকে সোজা রাইটার্স বিল্ডিংস-এ মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে ঢুকেছিলেন অজয় মুখোপাধ্যায় শেষ মীমাংসার প্রস্তাব নিয়ে। কিন্তু সেদিন একখানি দৈনিকপত্র মেলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন বলেছিলেন, "আপনার জন্য আমি কিছু করতে পারবো না। এই খবরের কাগজই আপনাকে দেখবে।" মুখ্যমন্ত্রীর পাশে বসে সেদিন কৌতুক দেখেছিলেন জগন্নাথ কোলে, তরুণকান্তি ঘোষ, বীজেশ সেন ও নির্মলেন্দু দে। নীরবে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন অজয় মুখোপাধ্যায়।

১৯৬৫ সালের ১লা সেপ্টেম্বর। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অজয় মুখোপাধ্যায় তাঁরই নিযুক্ত সাধারণ সম্পাদক নির্মলেন্দু দে-কে সম্পাদক পদ থেকে বরখাস্ত করলেন। কিন্তু আট ঘণ্টার মধ্যেই তাঁর সেই বরখাস্তের জবাবে নির্মলেন্দু দে সভাপতিকেই বরখাস্ত করলেন। অজয় মুখোপাধ্যায়কে তিনি চিঠি মারফত জানালেন যে, সভাপতির আদেশ তিনি মানবেন না, সম্পাদক হিসাবে কাজ করে যাবেন। এর আট ঘণ্টা পরে দৈনিক সংবাদপত্রের একজন সাংবাদিকের কাছ থেকে অজয় মুখোপাধ্যায় সংবাদ পেলেন যে, প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির অপর সম্পাদক সুহৃদ রুদ্র ১১ই সেপ্টেম্বর কুমারসিং হলে একটি 'রিকুইজিশন' সভার আয়োজন করেছেন। সেই সভায় অজয় মুখোপাধ্যায়কে কংগ্রেস সভাপতি পদ থেকে অপসারণ করা হবে। এই আট ঘণ্টার মধ্যেই ১১৪ জন সদস্য এই সভার আহ্বায়ক রূপে স্বাক্ষর দিয়েছিলেন। সারা পশ্চিমবঙ্গ থেকে আট ঘণ্টার মধ্যে এই ১১৪ জনের স্বাক্ষর সংগ্রহ কি করে সম্ভব হয়েছিল, তার উত্তর কে দেবে! এই স্বাক্ষরগুলির প্রথমটি ছিল প্রফুল্ল চন্দ্র সেনের এবং দ্বিতীয়টি অতুল্য ঘোষের। অতুল্য ঘোষ, নির্মলেন্দু দে, বীজেশ সেন, বীরেশ মৈত্র, বিভা মিত্র ও বিজয়ানন্দ চট্টোপাধ্যায় সেদিন যেন আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ হাতে পেয়েছিলেন! কিন্তু সেই আশ্চর্য প্রদীপও হার মানে। হার মেনেছিল অজয় মুখোপাধ্যায়ের কাছে!

১১ই সেপ্টেম্বর কুমার সিং হলে সভা বসল। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রস্তাব আনলেন, "প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির এই সভা পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করিতেছে ও তাঁহাকে অপসারণ করিতেছে।" সেদিন একজন মাত্র সদস্য এই প্রস্তাবের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করেছিলেন, তিনি হলেন ব্যারিষ্টার জি পি কর। শ্রীকর উঠে দাঁড়াতেই তাঁকে প্রথমে চীৎকার করে বসিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়। তিনি খদ্দর পরে সভায় আসেননি বলে সভানেত্রী লাবণ্যপ্রভা দত্ত তাঁকে সভা থেকে বের করে দেন। আর একজন

উঠে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি রাধারমণ কর। তাঁর মাইক কেড়ে নিয়ে তাঁকে টেনে বসিয়েছিলেন বীজেশ চন্দ্র সেন। রাধারমণ কর দাবী করেছিলেন, অনাস্থা প্রস্তাবের ভোট ব্যালটে নেওয়া হোক। সেই একজন মাত্র সদস্যই প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দিয়েছিলেন। পক্ষে ১৯০ জন সদস্য। সেদিন কুমার সিং হল থেকে একা বেরিয়ে এসেছিলেন অজয় মুখোপাধ্যায়।

কুমার সিং হলের সভার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে বিনয়কৃষ্ণ বাগ হাইকোর্ট-এ একটি মামলা করেন। মামলায় শ্রীবাগের জয় হয় এবং হাইকোর্ট-এর নির্দেশ অনুযায়ী কুমার সিং হলে আবার সভা ডাকা হয়। ঐদিন সভা পরিচালনা করেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী রামসুভগ সিং। সভার সুরুতে প্রদেশ কংগ্রেস সদস্য বিষ্ণু বন্দ্যোপাধ্যায় অনাস্থা প্রস্তাবটি অসমীচীন বলেন এবং রাধারমণ কর ও সুরেন্দ্রনাথ সরকার আবার বৈধতার প্রশ্ন তোলেন। কিন্তু বিচারের বাণী সেদিন নীরবে নিভৃতেই কেঁদেছিল। রবি সিকদার অনাস্থা প্রস্তাব পেশ করেন এবং সমর্থন করেন দুর্গাপদ সিংহ। এইদিন কিন্তু অনাস্থা প্রস্তাবের বিপক্ষে ৪০টি ভোট পড়ে। পক্ষে ২৯৬টি। তিনটি ভোট বাতিল।

অনাস্থা প্রস্তাবের আলোচনার সুরুতে অজয় মুখোপাধ্যায় কুমার সিং হল থেকে বেরিয়ে এলেন। সদস্যদের তিনি বলেছিলেন, "আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ কী তা জানতে পারলাম না, অথচ অনাস্থা ও অপসারণের প্রস্তাব পেশ হল। প্রস্তাব গৃহীত হলে আমার ৪৫ বছরের কংগ্রেসের কর্মক্ষেত্র সংকুচিত হয়ে যাবে। তা যদি করা ঠিক হয়, তবে আপনারা তাই করবেন।" সেই দিনই পথে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, "সামান্য কংগ্রেসকর্মীরূপে প্রদেশ কংগ্রেস থেকে দুর্নীতি ও এক-নায়কতন্ত্র উচ্ছেদের যে চেষ্টা করে আসছি তা অব্যাহত থাকবে।" কংগ্রেস থেকে একনায়কতন্ত্র নয়—পশ্চিমবঙ্গ থেকে এই কংগ্রেসকেই উচ্ছেদ করেছেন অজয় মুখোপাধ্যায়। তাঁর বিরুদ্ধে-অনাস্থা প্রস্তাবের 'রিকুইজিশন' সভার আহ্বায়কদের মধ্যে প্রথম দুই স্বাক্ষরকারী ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র সেন ও অতুল্য ঘোষ।

কংগ্রেস দলে যখন এই ভাঙন, তখন রাজ্যব্যাপী বাম-আন্দোলন দানা বেঁধে উঠল। ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে শুরু হল খাদ্য আন্দোলন খাদ্য ও কেরোসিন তেলের দাবী নিয়ে। ১৬ই ফেব্রুয়ারী বসিরহাটে কেরোসিন তেলের দাবীতে ছাত্র ও যুবরা আদালত ঘেরাও করল। পুলিশ লাঠি চালালো। গ্রেপ্তার হল

২০ জন ছাত্র। ৭ই ফেব্রুয়ারী স্বরূপনগরে পুলিশের গুলিতে নিহত হ'ল নুরুল ইসলাম নামে একজন ছাত্র। নুরুল ইসলামের মৃত্যুতে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ল সারা ২৪ পরগণায় এবং কলকাতায়। বসিরহাট, হাসানাবাদ, হিঙ্গলগঞ্জ, বাদুরিয়া, নৈহাটী ও কলকাতা সহ অসংখ্য স্থানে বিক্ষোভ-মিছিলের উপর পুলিশ লাঠি ও গুলি চালালো।

১১শে ফেব্রুয়ারী নিহত ছাত্র নুরুল ইসলামের মৃতদেহ নিয়ে শোকযাত্রা বেরোল বসিরহাটে। রাজ্য সরকার ২১শে ফেব্রুয়ারী থেকে রাজ্যের সব বিদ্যায়তন বন্ধ করে দিল। রাজ্য বিধানসভাতেও বাইরের আন্দোলনের প্রতিফলন ঘটে। বিধানসভার অভ্যন্তরেও সরকার এবং বিরোধী পক্ষের সদস্যদের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে। পুলিশ আমদানী করতে হয় বিধানসভার চত্বরে। ডাঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য ও সুনীল দাশগুপ্ত পুলিশের হাতে নিগৃহীত হন। ১০ই মার্চ বাংলা-বন্ধের ডাক দেওয়া হয়। স্কুল-কলেজ অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ করে দেন সরকার। বাংলা-বন্ধকে কেন্দ্র করে ১০ই মার্চ সারা পশ্চিমবাংলায় আগুন জ্বলে উঠে। গুলি চলে আগরপাড়ায়, বেহালায়, হাওড়ায়। অগণিত স্থানে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। বেশ কয়েকজন যুব ও ছাত্র নিহত হন। বামপন্থী দলগুলি ১৩ই মার্চ কলকাতা ময়দানে মৌন-মিছিলের ডাক দেন। ১৪৪ ধারা অমান্য করে এই মৌন-মিছিলে যোগ দেন অজস্র অসংখ্য মানুষ। দিল্লী থেকে ছুটে আসেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গুলজারিলাল নন্দা এবং খাদ্যমন্ত্রী সুব্রাহ্মনিয়ম্। বিরোধী দলের চারজন নেতাও কলকাতায় ছুটে আসেন। আন্দোলন এগিয়ে চলে। সংঘর্ষ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। কৃষ্ণনগরে পুলিশের গুলিতে মৃত্যু ঘটে আনন্দ হাইত নামে আর এক তরুণের।

এই আন্দোলনের কাছে অবশেষে সরকার বেশ কিছুটা নতি স্বীকার করে। আটক বন্দীদের মুক্তির দাবী মেনে নেয়। জ্যোতি বসু আগেই মুক্তি পেয়েছিলেন। প্রমোদ দাশগুপ্ত মুক্তি পেলেন ১৯৬৬ সালের ১৫ই মে। আন্দোলন এগিয়ে চলল ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত। গ্রামের ক্ষেত-মজুর থেকে সুরু করে শিক্ষক-অধ্যাপক পর্যন্ত সর্বস্তরের মানুষ এই আন্দোলনের সামিল হন।

তেতাল্লিশ

১৯৬৭ সাল এসে পড়ল। সেই সঙ্গে বেজে উঠল নির্বাচনী দামামা। কম্যুনিষ্ট পার্টির দুই শরিক সমান তৎপর। ফরওয়ার্ড ব্লক এবং আর-এস-পিও বেশ শক্তিশালী। বাংলা-কংগ্রেস গঠিত হয়েছে ১৯৬৬ সালের জুন মাসে। নিষ্ঠাবান কংগ্রেস নেতারা কংগ্রেস ত্যাগ করে বাংলা-কংগ্রেসে যোগদান করায় এক নতুন রাজনৈতিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয়। স্বর্ণ-নিয়ন্ত্রণ আইন, মিষ্টান্ন প্রস্তুত বিরোধী আইন জনজীবনকে সর্বস্তরে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল।

প্রমোদ দাশগুপ্ত সহ অন্যান্য সি-পি-এম নেতারা জেল থেকে মুক্ত হবার পর দলের প্রথম রাজ্যকমিটির বৈঠক বসে সি-পি-আই (এম) জেলাকমিটির সার্কুলার রোডের দপ্তরে। নির্বাচনী কথাবার্তার সুরুতেই রাজ্যকমিটির সম্পাদক প্রমোদ দাশগুপ্ত পরিষ্কার জানিয়ে দেন যে ডাঙ্গেপন্থী কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে (মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি এই সময় সি-পি-আই-কে এই নামেই অভিহিত করত) কোন নির্বাচনী সমঝোতা করবেনা এবং ১৯৬২ সালের নির্বাচনের ভিত্তিতে একটি আসনও ছাড়বেনা। জুন মাসের ২৪ তারিখে বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে নির্বাচনী সমঝোতা নিয়ে বামপন্থী দলগুলির আলোচনা সুরু হয়।

এই আলোচনা যত এগিয়ে চলে কংগ্রেস শিবিরে ততই ভাঙ্গন বৃদ্ধি পেতে থাকে। আগস্ট মাসে ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ বাংলা কংগ্রেসে যোগদান করেন। তেরোটি বামপন্থী দল এবং বাংলা-কংগ্রেসের মধ্যে নভেম্বর মাস পর্যন্ত আলোচনা চলে। ইতিমধ্যে, ৩০শে আগস্ট তেরটি বামপন্থী পার্টি যুক্তভাবে ঘোষণা করে যে রাজ্যের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিতে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তারা এক যোগে কাজ করবে।

১২ই অক্টোবর বাংলা-কংগ্রেস ও তেরোটি বাম-পার্টির মধ্যে একটি তালিকা বিনিময় হ'ল। এই তালিকায় প্রধানত বিরোধ ছিল দুই কম্যুনিষ্ট পার্টি এবং বাংলা-কংগ্রেসের মধ্যে আসন বণ্টন নিয়ে। বহুবার দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হ'ল। মোট ৭৬টি আসন নিয়ে বিরোধ। দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় সেই বিরোধ ২৩টি আসনে নেমে এল। ৪ঠা নভেম্বর তেরো পার্টির বৈঠকে জ্যোতি বসু বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা করলেন, দুই পার্টির মধ্যে ৪৬টি আসন নিয়ে বিরোধ। ন্যূনতম ক'টি আসন তাদের চাই-ই? বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় ২৩টি আসনের

দাবী জানালেন। ৪ঠা নভেম্বর সি-পি-আই (এম) রাজ্য কমিটির বৈঠকে সামগ্রিক পরিস্থিতি আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল—যে পরিমাণ আসন সি-পি-আই (এম)-কে ছাড়া হচ্ছে সেই আসনে কোন সমঝোতা হ'তে পারে না। ৬ই নভেম্বর জ্যোতি বসু তেরো-পার্টির বৈঠকে বললেন: সামগ্রিক ঐক্য হল না এবং হওয়া সম্ভব নয়। জনগণকে সেই কথা জানিয়ে দেওয়া হোক। অশোক ঘোষ এবং মাখন পাল বললেন: চেষ্টা চলুক। ৯ই নভেম্বর বৈঠকে বসে দেখা গেল, বিরোধ-মীমাংসার কোন আশা নেই। ১২ই নভেম্বর পর্যন্ত এই চেষ্টা চলল। কিন্তু ফল হল না। ১৯শে নভেম্বর তারিখে সি পি-আই (এম) এককভাবে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করল। প্রমোদ দাশগুপ্ত এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করলেন, সি-পি-আই (এম) বিধানসভায় ১২২টি এবং লোকসভায় ১৯টি আসনে প্রার্থী দেবে। প্রকৃতপক্ষে দুই কম্যুনিষ্ট পার্টির বিরোধ রাজ্যের সার্বিক ঐক্যের অন্তরায় হোল।

২০শে নভেম্বর সি-পি-আই ময়দানে এক সভা করল। সেই সভায় এস এ ডাঙ্গে সি-পি-আই (এম) সম্পর্কে বহু অপ্রয়োজনীয় কটূক্তি করলেন। সাতদিন পর ২৭শে নভেম্বর ময়দানে সি-পি-আই (এম)-এর পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিত এক সভায় কেন কংগ্রেস-বিরোধী ঐক্য হল না, তার ব্যাখ্যা করা হল। সেই সঙ্গে সি-পি-আই এবং বাংলা-কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করা হল। এই সভায় প্রমোদ দাশগুপ্তের একটি উক্তি পরবর্তীকালে খুবই আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তিনি বলেছিলেন: ঢাকুরিয়া কেন্দ্রে সোমনাথ লাহিড়ীর জামানত জব্দ করা হবে।

বাংলা-কংগ্রেসের সঙ্গে নির্বাচনী ঐক্য করার প্রশ্নে প্রমোদ দাশগুপ্ত বরাবরই একটু কঠোর মনোভাব অবলম্বন করেছিলেন। গত কয়েক মাস ধরে যে কয়টি বৈঠক হয়েছে, একটি বৈঠক ছাড়া আর কোন বৈঠকে তিনি উপস্থিত থাকেন নি। নির্বাচনী সমঝোতার বৈঠকে সি-পি-আই (এম)-এর প্রতিনিধিত্ব করতেন জ্যোতি বসু, নিরঞ্জন সেন ও সরোজ মুখোপাধ্যায়। দলের সাধারণ সম্পাদক হয়েও প্রমোদ দাশগুপ্ত মাত্র একটি বৈঠকে হাজির ছিলেন। বৈঠকটি হয়েছিল ২৪৯/বি বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীটে। ইণ্ডিয়ান জার্নালিস্ট এসোসিয়েশনের হলে। তিন ঘণ্টা বৈঠক চলেছিল। এই তিন ঘণ্টার মধ্যে প্রমোদ দাশগুপ্ত কোন কথা বলেন নি। শুধু চুরুটটা নিভে গেলে একবার হরেকৃষ্ণ কোঙারের দিকে হাত বাড়িয়ে বলেছিলেন: দেশলাইটা দিন তো।

কংগ্রেস-বিরোধী সার্বিক ঐক্যের আরও চেষ্টা হয়েছিল। বিশ্বনাথ মুখার্জীর চেষ্টায় এস এ ডাঙ্গে, রাজেশ্বর রাও ও ভূপেশ গুপ্ত কলকাতায় এসে ডাক্তার মনি বিশ্বাসের বাড়িতে সি-পি-আই (এম) নেতাদের সঙ্গে এক গোপন বৈঠকে বসেছিলেন। কিন্তু সেই বৈঠকেও কোন ফল হলো না।

শেষ পর্যন্ত গঠিত হ'ল ছু'টি ফ্রন্ট। 'ইউ-এল-এফ' এবং 'পি-ইউ-এল-এফ।' দুই ফ্রন্টের একদিকে 'ইউ-এল-এফ'-এ সি-পি-আই (এম), আর-এস-পি, এস-এস-পি, আর-সি-পি-আই, ওয়ার্কাস্ পার্টি, এস-ইউ-সি ও মার্ক্সবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক; অপর ফ্রন্টে অর্থাৎ 'পি-ইউ-এল-এফ'-এ বাংলা কংগ্রেস, সি-পি-আই, ফরওয়ার্ড ব্লক ও বলশেভিক পার্টি। 'ইউ-এল-এফ' নেতারা 'পি-ইউ-এল-এফ'-কে বলতেন কংগ্রেসের 'বি' টিম। পি-ইউ-এল-এফ নেতারা 'ইউ-এল-এফ'-কে বলতেন চীনাপন্থী ও দেশদ্রোহী। দুই ফ্রন্টের নেতারাই নিজেদেরকে কংগ্রেসের একমাত্র বিকল্প বলে দাবী করলেন। সেই সঙ্গে একে অপরকে কবর দেবার আহ্বান জানাতে লাগলেন। নির্বাচনে 'ইউ-এল-এফ' ১৯১টি আসনে এবং 'পি-ইউ-এল-এফ' ১৮০টি আসনে প্রার্থী দিল। দুই কম্যুনিষ্ট পার্টির একের বিরুদ্ধে অপরের জেহাদ নির্বাচনী পরিবেশকে খুবই জটিল করে তুলল।

দুই ফ্রন্ট গঠিত হলেও অশোক ঘোষ এবং মাখন পাল দুই ফ্রন্টের মধ্যে সমঝোতার একটা শেষ চেষ্টা করেছিলেন। ২৮শে ডিসেম্বর থেকে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সমানে এই চেষ্টা চলেছিল। কিন্তু সেই চেষ্টাও ফলপ্রসূ হয় নি। কোন চেষ্টাই যে সফল হল না তার প্রধান কারণ—কম্যুনিষ্ট পার্টি ভাগ হবার পর বিভক্ত দুই কম্যুনিষ্ট পার্টিই পশ্চিমবঙ্গে নিজেকে প্রধান প্রমানিত করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল।

কিন্তু রাজ্যের জনগণ নির্বাচনে অঘটন ঘটিয়ে দিলেন। দুই কম্যুনিষ্ট পার্টির পৃথক নেতৃত্বে দুই ফ্রন্টের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্ত্বেও কংগ্রেস পরাজিত হ'ল। ১৯৬৭ সালের নির্বাচন ভারতের রাজনীতির ইতিহাসে এক স্মরণীয় অধ্যায় হিসাবে চিহ্নিত হ'ল। ভারতবর্ষের আটটি রাজ্যের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গেও কংগ্রেস পরাজয় বরণ করল।

পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস পরাজিত হবে এই কথা কংগ্রেস-বিরোধী দুই ফ্রন্টের নেতাদের অনেকেই কল্পনা করতে পারেন নি। ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের চাইতে দুই কম্যুনিষ্ট পার্টির মধ্যেকার লড়াই অনেক বেশী জোরদার

ছিল। সি-পি-আই নেতারা। জানতেন পশ্চিমবঙ্গ সি-পি-আই (এম)-এর শক্ত ঘাঁটি। সেই ঘাঁটিতে আঘাত হানবার প্রথম সুযোগ এই নির্বাচন। তাই সি-পি-আই দলের সর্বভারতীয় নেতারা পশ্চিমবঙ্গে মাটি কামড়ে পড়েছিলেন। সি-পি-আই (এম), বিশেষ করে প্রমোদ দাশগুপ্তের কৌশলও ছিল অনুরূপ। প্রমোদ দাশগুপ্ত জানতেন, অবিভক্ত কম্যুনিষ্ট দলের কর্মীরা সকলেই তাঁর সঙ্গে আছে। সি-পি-আই-কে বাঁচিয়ে রেখেছে শুধু কয়েকজন শীর্ষ নেতা। সি-পি-আই (এম) দল গঠিত হবার পর এই প্রথম নির্বাচন। এই নির্বাচনে সি-পি-আই (এম)-কে জয়ী করে একমাত্র কম্যুনিষ্ট দল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। একই কারণে, সি-পি-আই-এর প্রতিটি শীর্ষ নেতার বিরুদ্ধেই সি-পি-আই (এম)-এর প্রার্থী দেওয়া হয়েছিল। দুই কম্যুনিষ্ট পার্টির লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে সি-পি-আই (এম) যাতে প্রকৃত কম্যুনিষ্ট পার্টি হিসাবে রাজ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে, প্রমোদ দাশগুপ্ত রাজ্যের নির্বাচন পরিচালনায় সেই সার্বিক কৌশলই গ্রহণ করেছিলেন।

নির্বাচনী ফলে দেখা গেল, পশ্চিমবঙ্গের জনগণ দুই ফ্রন্টের কোন আলাদা অস্তিত্ব স্বীকার করেনি। দুই ফ্রন্টেরই উপযুক্ত ও যোগ্য প্রার্থীদের জয়যুক্ত করেছে। ভরাডুবি ঘটিয়েছে কংগ্রেস দলের।

চুয়াল্লিশ

১৯৬৭ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী, বুধবার। রাইটার্স বিল্ডিংস্-এ তাঁর ঘরে বসে আছেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন। কয়েক ঘণ্টা আগে ভোট-গণনা সুরু হয়েছে। আরামবাগ থেকে টেলিফোনে প্রতি ঘণ্টায় ভোটের ফলাফল জানানো হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীকে। প্রফুল্লচন্দ্র সেন একখানা আলাদা প্যাড এবং লাল-নীল পেন্সিল নিয়ে টেলিফোনে পাওয়া সংবাদের নোট নিচ্ছেন। কেউ ঘরে এলে কাগজ-পেন্সিল আড়াল করছেন। বেলা চারটায় খবর এল ইলেকট্রিক ফেল করেছে। আলো নিভে গিয়েছে। ভোট গণনা বন্ধ। প্রফুল্লচন্দ্র সেন নিজের ঘরের আলোর দিকে তাকিয়ে কাগজখানি ভাঁজ করে তুলে রাখলেন। না, তাঁর ঘরে আলো জ্বলছে। আজকে যে দু'চারটে বুথ গোনা হয়েছে তাতে তিনি এগিয়ে আছেন।

২৩ তারিখ বৃহস্পতিবার। সকাল ৯টায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন রাইটার্স বিল্ডিংস্-এ

প্রবেশ করে নিজের ঘরে নিজের চেয়ারটিতে বসলেন। এই চেয়ারখানি তৈরি হয়েছে শিরদাঁড়ার ব্যথার জন্য একান্তভাবে তাঁরই জন্য। যে চেয়ারে একদা ফজলুল হক, নাজিমুদ্দীন, সুরাবর্দী, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, বিধান রায় বসে গিয়েছেন, এটি সে চেয়ার নয়। ঘরেরও অনেক পরিবর্তন করেছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র সেন। ১৯৬২ সালের জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে এই ঘরটি কখনও এক সপ্তাহের বেশী ছেড়ে থাকেন নি। ভোটের খবর মুখ্যমন্ত্রীর স্বপক্ষে, কিন্তু অগ্রগতি আশাপ্রদ নয়। অনেকক্ষণ ধরে ভাবছেন বাড়ি চলে যাবেন, আবার পরবর্তী টেলিফোনের জন্য বসে থাকছেন। সাড়ে এগারোটায় খবর এল মুখ্যমন্ত্রী আঠার শো ভোটে অজয় মুখোপাধ্যায়ের চাইতে এগিয়ে আছেন। এখন যে বুথগুলি গোনা হচ্ছে সেগুলি নিশ্চয়ই মুখ্যমন্ত্রীর স্বপক্ষে যাবে। কাজেই কিছুটা শান্ত ও নিশ্চিন্তমনে দুপুরের খাবারের জন্য রাজভবনের পথে রওনা হলেন। লিফ্‌ট্ দিয়ে নামতেই পুলিশ ও 'এস-বি'-র লোকেরা ধড়মড়িয়ে উঠে স্যালুট করল। অন্যদিনের তুলনায় মুখ্যমন্ত্রী একটু আগেই বেরিয়ে এসেছেন। রাইটার্স থেকে রাজভবন সামান্য পথ। তবুও শরীর এলিয়ে দিলেন পেছনের গদিতে।

রাজভবনে পৌঁছে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছেন, এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল। আরামবাগের ফোন: ভোট কমে আসছে। মাত্র ১৯ ভোটে তিনি এগিয়ে আছেন। নোতুন বাক্স খোলা হচ্ছে। অবস্থা ভাল নয়। টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন। মাত্র উনিশ ভোট! রাইটার্স থেকে রাজভবনে আসবার এই পথে সামান্য সময়ের মধ্যে অজয় মুখোপাধ্যায় এগিয়ে গেছেন আঠার শো ভোটে। সামনের ঘরে খাবার তৈরী। মুখ্যমন্ত্রী খাবার ঘরে না ঢুকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন। গাড়ির কাছে এসে নিজেই দরজা খুললেন। আসনে বসে পড়ে ড্রাইভারকে বললেন: কংগ্রেস-ভবন। ড্রাইভার একটু দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকালো। অন্যদিনের মতো এই সময়ে সিকিউরিটির লোকেরাও খেতে গিয়েছে। তারা ভাবেনি যে হঠাৎ মুখ্যমন্ত্রী নেমে আসতে পারেন। ড্রাইভার একটু দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রীর আদেশের অপেক্ষা করল। তারপর জিজ্ঞাসা করল: সিকিউরিটি ছাড়াই কি গাড়ি যাবে? মুখ্যমন্ত্রী বললেন: চলো। সিকিউরিটি ছাড়াই মুখ্যমন্ত্রীর গাড়ি এগিয়ে চলল রেড রোড ধরে কংগ্রেস-ভবন।

কংগ্রেস-ভবনের তিন তলায় উঠে সোজা ঢুকলেন বড়বাবুর ঘরে। কংগ্রেস ভবনে অতুল্য ঘোষের ঘর হল বড়বাবুর ঘর। তখন সে ঘরে বসে আছেন অতুল্য ঘোষ, সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, বিজয়ানন্দ চট্টোপাধ্যায়। অন্য ঘরে বসে আছেন

নির্মলেন্দু দে, রবীন্দ্রলাল সিংহ, বিজয়সিং নাহার, শৈল মুখোপাধ্যায়। নির্মলেন্দু দে-র সামনে বিরাট একটা চার্ট। হাতে লাল ও নীল পেন্সিল। জয়-পরাজয়ের হিসাব করছেন। অশোককুমার সেন এলেন। তিনিও অতুল্য ঘোষের ঘরে ঢুকলেন।

প্রফুল্লচন্দ্র সেন ঘরে ঢুকে দেখেন, অতুল্য ঘোষ হাতের কলমটা মুখে চুরুটের মতো ধরে আছেন। প্রফুল্ল সেন ঘরে ঢোকার পর দরজা বন্ধ হয়ে গেল। তিনি এতক্ষণ শুধু আরামবাগের কথাই ভেবেছেন। তাঁর মনে পড়েনি, আজ বাঁকুড়াতেও ভোট গণনা হচ্ছে। সেখানে অতুল্য ঘোষের প্রতিদ্বন্দ্বী জে এম বিশ্বাস। প্রফুল্লচন্দ্র সেন যে দুঃসংবাদের বোঝা বুকে নিয়ে রাজভবন থেকে কংগ্রেস-ভবনে ছুটে এসেছেন, সেখানে আরও বড় দুঃসংবাদ অপেক্ষা করছে, এটা তাঁর ধারণায় ছিল না। অতুল্য ঘোষ বাঁকুড়াতে হেরে যাচ্ছেন, বলা যায় হেরে গিয়েছেন। জে এম বিশ্বাস অনেক বেশী ভোটে এগিয়ে আছেন। বেলা দেড়টায় শেষ খবর এল: আরামবাগে প্রফুল্লচন্দ্র সেন ৮৮১ ভোটে পরাজিত হয়েছেন। বেলা ৫টায় সরকারীভাবে ঘোষণা করা হল: অতুল্য ঘোষ হেরে গিয়েছেন।

প্রফুল্লচন্দ্র সেন এই সময় থেকে হঠাৎ অস্বাভাবিক রকমের উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। প্রয়োজন নেই তবু হাসছেন। সবাইকে ডাকছেন। চীৎকার করে বলছেন, "ওহে শুনছ, আমি হেরে গেছি। শুনেছ আরামবাগে অজয় জিতেছে। বাঁকুড়ায় অতুল্য হেরেছে।" যারা শুনছে, তারা কেউ সামনে থেকে সরে যাচ্ছে, কেউ মুখ নীচু করে থাকছে। কাউকে বা নীরব থাকতে দেখে বলেছেন, "তুমি কি 'আন্‌নার্ভড্‌' হয়ে গেলে?" নির্মলেন্দু দে-র ঘর থেকে একের পর এক খবর আসছে, শচীন চৌধুরী হেরে গিয়েছেন, পাতিল হেরে গিয়েছেন, সঞ্জীবায়া হেরে গিয়েছেন। কামরাজ হেরে গিয়েছেন।

রাত নয়টা। প্রফুল্লচন্দ্র সেন অতুল্য ঘোষকে ডেকে বললেন, "চলো বাড়ি যাই। ন'টা বেজে গেছে।" হ্যাঁ নয়টা বেজে গিয়েছে। সকাল ন'টা থেকে রাত ন'টা। বারো ঘণ্টা কেটে গিয়েছে। এই বারো ঘণ্টায় লেখা শুরু হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের নতুন ইতিহাস। অতুল্য ঘোষ বললেন, "না, ১৪০ না হওয়া পর্যন্ত আমি বাড়ি যাবোনা।" প্রফুল্লচন্দ্র সেন পাশে দাঁড়ানো যুগান্তরের জনৈক সাংবাদিককে বললেন, "ওহে, চলো আমরা বাড়ি যাই। অতুল্যর আর কোন

দিন বাড়ি যাওয়া হবেনা। কংগ্রেস আর কোনদিন ১৪০ পাবেনা-পাবেনা-পাবেনা।"

প্রফুল্লচন্দ্র সেন গাড়িতে উঠলেন। মুখ্যমন্ত্রীর গাড়ির সামনে পুলিশের লাল পাইলট ভ্যান। গাড়িতে উঠে বসলেন প্রফুল্লচন্দ্র সেন। পাইলট ভ্যান-এ সাইরেন বেজে উঠল: রাস্তা পরিষ্কার কর, মুখ্যমন্ত্রী যাচ্ছেন। বেলা পাঁচটায় সরকারী ভাবে আরামবাগের ফল ঘোষণার পরই প্রফুল্লচন্দ্র সেন টেলিফোনে রাজ্যপাল পদ্মজা নাইডুকে জানিয়ে দিয়েছেন: 'আমি পদত্যাগ করছি।' আগামী কাল থেকেই প্রফুল্লচন্দ্র সেন আর মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন না। গাড়ির সামনে এই পাইলট ভ্যান থাকবে না। তার সাইরেন কখনও আর পথচারীকে জানিয়ে দেবেনা— পথ পরিষ্কার কর, প্রফুল্লচন্দ্র সেন যাচ্ছেন। রাজ্যপালের অনুমতি নিয়ে মন্ত্রিসভার প্রবীনতম সদস্য খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে জরুরী খবর দেওয়া হয়েছে কলকাতায় ফিরে এসে অস্থায়ীভাবে মুখ্যমন্ত্রীর কাজ চালিয়ে যাবার জন্য। কংগ্রেস-ভবনে রাত একটায় খবর এল তরুণ কান্তি ঘোষ পরাজিত। অতুল্য ঘোষ ও নির্মলেন্দু দে রাত একটার পর বাড়ি ফিরলেন। সরকারীভাবে ঘোষণা করা হল, কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস পরাজিত।

ঐদিনই রাত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের হোস্টেল-এ হুমায়ুন কবীরের কক্ষে মিলিত হলেন রাজ্যের বামপন্থী নেতৃবৃন্দ। গভীর রাত পর্যন্ত চলল বৈঠক। কংগ্রেস পরাজিত। কিন্তু তারপর? স্থির হল পরদিন এখানেই বৈঠক বসবে। অজয় মুখোপাধ্যায় সেদিন কলকাতায় এসে পৌঁছবেন। কথা হল কবীর, অশোক ঘোষ, মাখন পাল, সুকুমার রায়ের মধ্যে। টেলিফোনে কথা হ'ল জ্যোতিবাবুর সঙ্গে, সোমনাথ লাহিড়ীর সঙ্গে। ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষকে বৈঠকে থাকতে বলা হল।

২৪শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার। রাজ্যপাল পদ্মজা নাইডু এক জটিল সমস্যার সম্মুখীন হলেন। সংসদীয় গণতান্ত্রিক নীতি অনুসারে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে কংগ্রেসকেই প্রথমে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আহ্বান জানানো উচিত। কিন্তু সেন্ট্রাল ইনটেলিজেন্স-এর খবর: কংগ্রেসকে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আহ্বানের অর্থ দেশব্যাপী অরাজকতা। পরামর্শে বসলেন চীফ সেক্রেটারী ও ইলেকশন কমিশনার এস দত্তমজুমদার। এই সমস্যা থেকে পার পাবার একমাত্র উপায় হ'ল প্রফুল্লচন্দ্র সেন আটটায় পদত্যাগ পত্র পেশ করতে এলে তাঁর কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়ে নেওয়া যে কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গে মন্ত্রিসভা গঠন

করতে চায়না। প্রফুল্লচন্দ্র সেন পদত্যাগ পত্র পেশ করলেন এবং প্রত্যাশিত প্রতিশ্রুতিও দিলেন।

পদত্যাগ পত্র পেশ করে প্রফুল্লচন্দ্র সেন রাজভবনে তাঁর সরকারী ফ্ল্যাট-এ ফিরলেন। রাইটার্স বিল্ডিংস্-এ আর যাবেন না। ফাইল-পত্র সব নিয়ে আসা হয়েছে রাজভবনে। দ্রুত সই করে চললেন একটার পর একটা ফাইল।

সকাল ১০টায় টেলিফোন বেজে উঠল। ফোন করছেন পুলিশ কমিশনার পি কে সেন। অজয় মুখোপাধ্যায় আরামবাগ থেকে হাওড়া স্টেশনে এসে নেমেছেন। প্রায় দশহাজার লোক শোভাযাত্রা করে অজয় মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে কলকাতার পথে এগিয়ে আসছেন।

অজয় মুখোপাধ্যায় একটি খোলা জিপ-এর উপর দাঁড়িয়ে। পাশে সুকুমার রায়। জনসমুদ্র রচনা করে অজয় মুখোপাধ্যায় এগিয়ে চললেন কলকাতার পথে। শোভাযাত্রা প্রবেশ করল ব্রাবোর্ণ রোড-এ। আবার টেলিফোন বেজে উঠল: 'স্যার, শোভাযাত্রা রাইটার্স বিল্ডিংস-এর দিকে এগিয়ে চলেছে। ওখানে ১৪৪ ধারা। কী করব?' উত্তর দিলেন: 'প্রণব, অজয়বাবুই ইলেক্‌টেড মেম্বার। তুমি পুলিশ সরিয়ে নাও।' রাইটার্স বিল্ডিংস্-এর সামনে ১৪৪ ধারা মিলিয়ে গেল লক্ষ জনতার পদচারণায়। শোভাযাত্রা এগিয়ে চলেছে। আবার টেলিফোন: 'স্যার, শোভাযাত্রা রাজভবনের দিকে চলেছে।' উত্তর: 'আসুক'। সামনের ফাইল বন্ধ করলেন প্রফুল্লচন্দ্র সেন। সিঁড়ি দিয়ে নেমে গাড়িতে উঠলেন। দরজা বন্ধ করে বললেন: কংগ্রেস ভবন। কংগ্রেস ভবনে পৌঁছে প্রায় শিশুর মতো আনন্দ প্রকাশ করে অতুল্য ঘোষকে বললেন: 'অজয়কে নিয়ে কত বড় শোভাযাত্রা বেরিয়েছে জানো অতুল্য?'

শোভাযাত্রা কলকাতার রাজপথ দলিত মথিত করে নতুন প্রাণবন্যার জোয়ার তুলে রাইটার্স বিল্ডিংস্, রাজভবন পেরিয়ে এগিয়ে চলেছে দক্ষিণ কলকাতার দিকে। বড়বাবুর ঘরে বসে আছেন অতুল্য ঘোষ ও প্রফুল্লচন্দ্র সেন। টেলিফোন বেজে উঠল। অতুল্য ঘোষ রিসিভার এগিয়ে দিলেন প্রফুল্লচন্দ্র সেনের দিকে। প্রফুল্লচন্দ্র সেনের গলায় আর্তরব: 'এঁ্যা, শোভাযাত্রা কংগ্রেস ভবনের দিকে আসছে? বোমা ফাটাচ্ছে?' টেলিফোন রেখে দিয়ে অতুল্য ঘোষকে বললেন, 'অতুল্য, অজয়ের শোভাযাত্রা কংগ্রেস ভবনের দিকে আসছে। ওরা বড় বড় বোমা ফাটাচ্ছে।' তিনি সোজা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। দরজা খুলে

বেরিয়ে তরতর করে নেমে এলেন। সঙ্গে সাংবাদিক। কংগ্রেস ভবনের সামনে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন। পুলিশ অফিসার এ্যাটেনশন হয়ে স্যালুট করল। সেদিকে তাকালেন না তিনি। ড্রাইভারকে বললেন, 'ডান দিকে চলো।' বাঁদিকে চৌরঙ্গী রোড ধরে অজয় মুখোপাধ্যায় শোভাযাত্রা করে আসছেন। ডান দিকে লোয়ার সার্কুলার রোড ধরে প্রফুল্লচন্দ্র সেন চলে গেলেন। রাস্তার সব আলো লাল কাগজে মুড়ে দেওয়া হয়েছে। আজ রাতে আলো জ্বললে সারা কলকাতা লাল দেখাবে।

কংগ্রেস পরাজিত। কিন্তু ভবিষ্যত সরকার সম্পর্কে অবস্থা অনিশ্চিত। কংগ্রেস ১২৭টি আসন পেয়েছে। আর, দুই ফ্রন্ট মিলিত ভাবে পেয়েছে ১৫৩টি আসন। দুই ফ্রন্টের মধ্যে আসনের তফাত ছিল মাত্র একটি। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশের দিনই কেন্দ্রীয় সরকারের হোস্টেলে বৈঠক হয়েছিল। আরও অনেক বৈঠক হল। শেষ পর্যন্ত ঐকমত্য হ'ল যুক্তফ্রন্ট সরকার হবে। অজয় মুখোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী, জ্যোতি বসু উপ-মুখ্যমন্ত্রী।

২রা মার্চ ১৯৬৭ সাল। যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হ'ল। মাত্র ২৭ দিন অতিক্রান্ত হতেই এল প্রথম আঘাত। নতুন মন্ত্রীরা তখনও দপ্তর চিনতে পারেন নি। চিনতে পারেন নি আমলাদের আর ষড়যন্ত্রকারীদের। ২৯শে মার্চ অত্যন্ত অভাবনীয়ভাবে পাঞ্জাবী আর বাঙ্গালীদের মধ্যে বাধল দাঙ্গা। পাঞ্জাব এবং বাংলা চিরদিন মনের যোগসূত্রে আবদ্ধ। স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা ও পাঞ্জাব বরাবর হাতে হাত মিলিয়ে লড়াই করেছে। সেই বাঙ্গালী ও পাঞ্জাবীর দাঙ্গা কলকাতায়! আর, সেই দাঙ্গার অস্ত্র আঘাত হানল যুক্তফ্রন্ট সরকারেরই বুকে! যুক্তফ্রন্টের দুই মন্ত্রী জ্যোতি বসু এবং বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় জীবন বিপন্ন করে ঐক্য ফিরিয়ে আনলেন হিন্দু আর শিখদের মধ্যে।

বাগমারীর পর ২২শে মে হাওড়ায় পুলিশ বিদ্রোহ। পুলিশকে দিয়ে সরকার-বিরোধী ধ্বনি তোলানো হ'ল এবং যুক্তফ্রন্ট সরকারের এক মন্ত্রী পুলিশের হাতে লাঞ্ছিত হলেন। এর এক সপ্তাহের মধ্যেই ২৮শে মে শুরু হল এন্টালীতে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা। এখানেও জ্যোতি বসু এবং সোমনাথ লাহিড়ী নিজেদের প্রাণ বিপন্ন করে কয়েক ঘন্টার মধ্যেই দাঙ্গা থামালেন। প্রথমে হিন্দু-শিখ, তারপর হিন্দু-মুসলমান এবং শেষে ভাটপাড়ায় বাঙ্গালী-বিহারী দাঙ্গা। শেষের দাঙ্গাটিতে বেশ কিছু প্রাণহানি ঘটে। নবগঠিত সরকারের কার্যভার গ্রহণের তিন মাসের

মধ্যে এক একটি দাঙ্গা সরকারকে ক্রমশ দুর্বল করে দিচ্ছিল। যদিও প্রতিটি ক্ষেত্রেই সরকার পুলিশের উপর নির্ভর না করে যথেষ্ট তৎপরতার সঙ্গে শান্তি ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু এই অবস্থায় সব চাইতে বড় আঘাত হ'ল নকশালবাড়ি সমস্যা।

পঁয়তাল্লিশ

নকশালবাড়ি। নামটি শুধু ভারতে নয়, ভারতের বাইরেও আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। ২২শে মে হাওড়ায় পুলিশ-বিদ্রোহ। ২৮শে মে এণ্টালীতে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা। ঠিক তার মাঝখানে ২৪শে মে নকশাল বাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটল। নকশালবাড়ি আন্দোলন কি কৃষক-আন্দোলন, না, রাজনৈতিক আন্দোলন? অথবা উভয়ই? এই প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে সেই সময়ে সংঘটিত ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ করলে।

উত্তরবঙ্গের তরাই অঞ্চলে নেপাল ও তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানের সীমান্তে অবস্থিত শিলিগুড়ি মহকুমার তিনটি থানা—নকশালবাড়ি, খড়িবাড়ি ও ফাঁসিদেওয়া। তিনটি থানার মোট আয়তন ২৭৪ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা দেড়লক্ষ। এখানে ৩২টি চা-বাগান ছিল। চা-বাগানের শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল পঞ্চাশ হাজার। অধিবাসীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ রাজবংশী ও মেচ। সাঁওতাল, ওঁরাও ইত্যাদির সংখ্যাও অনেক। এ ছাড়া বেশ কিছু নেপালী এবং ফাঁসিদেওয়া থানার চটের হাটের দিকে বেশ কিছু মুসলমানও আছে। বনজঙ্গলে ঘেরা, নদীনালায় ভরা, চা-বাগান অধ্যুষিত এই অঞ্চল নানা দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতীয় অঞ্চলের দৈর্ঘ এখানে মাত্র চৌদ্দমাইল। কোন ক্রমে এই শীর্ণ অঞ্চলটি অপরের দখলে চলে গেলে উত্তরবঙ্গ, আসাম তথা সমগ্র পূর্ব-ভারত দেশের অবশিষ্ট অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। চীনও খুব দূরে নয়। ভারত সীমান্তের কালিম্পং থেকে মাত্র পঞ্চাশ মাইল। বাগডোগরা ও জাংডুবির সৈন্য ঘাঁটিও নকশালবাড়ি থেকে মাত্র সাত-আট মাইল দূরে।

নকশালবাড়ির কৃষি-সমস্যাও বেশ জটিল। প্রধানতঃ চারটি কারণে। প্রথমতঃ, এই জায়গাটি আগে 'নন্-রেগুলেটেড' অঞ্চল ছিল। অর্থাৎ এখানে জমির দলিল-

পত্র বিশেষ কিছু রাখা হতনা। ফলে গরীব কৃষককে তাদের অধিকার থেকে সহজেই বঞ্চিত করা যেত। দ্বিতীয়তঃ, এটি মূলতঃ উপজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চল। উপজাতি কৃষকদের হাতে কোন জমি নেই বললেই চলে। এক সময়ে অন্ত প্রদেশ থেকে এসে বনজঙ্গল পরিষ্কার করে এরা চাষের উপযুক্ত জমি তৈরি করেছে। কিন্তু কৃষক-বিরোধী ভূমি ব্যবস্থার ফলে জমির অধিকার জোতদারদের হাতে চলে গিয়েছে। তৃতীয়তঃ, এখানে অনেকগুলি চা-বাগান আছে যার মালিকরা ভবিষ্যতে চায়ের চাষ করবে বলে জমি নিয়ে ধান-পাটের চাষ করে। এইভাবে জমিদারী দখল আইন ফাঁকি দিয়ে চা-বাগানের মালিকরা কৃষকদের ফাঁকি দিচ্ছে। চতুর্থতঃ, বিহারের যে অংশ ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের সময় পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তার কিছুটা এই এলাকায় রয়েছে। বিহারে থাকা কালে এখানে কোন সেট্‌ল্‌মেণ্ট হয়নি এবং আশ্চর্যের বিষয়, পশ্চিমবঙ্গে যুক্ত হওয়ার পরও এখানে কোন সেট্‌ল্‌মেণ্ট হয়নি। এবং এই সুযোগ নিয়ে ভূমি-শোষণ ছিল অব্যাহত। এই সব অন্যায়ের বিরুদ্ধে স্বাভাবিক ভাবেই কৃষকদের মধ্যে বিক্ষোভ ছিল এবং যুক্তফ্রণ্ট সরকার গঠিত হবার পর কৃষকরা যখন ন্যায্য দাবী পূরণের আশ্বাস পেল, তখন তাদের বিক্ষোভ আরও জোরদার হয়ে উঠল। নকশালবাড়ির কৃষকদের ন্যায্য দাবীর আন্দোলন শুধু কৃষক-আন্দোলনেই সীমাবদ্ধ রইল না। এই এলাকার নেতাদের পরিকল্পনা ছিল সশস্ত্র শক্তির জোরে রাজনৈতিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা এবং মুক্তাঞ্চল সৃষ্টি করা। এক নতুন রাজনৈতিক মতাদর্শও এর মধ্য থেকে আত্মপ্রকাশ করে।

তীর-ধনুক, টাঙ্গি-বন্দুক নিয়ে চার পাঁচ জন লোক একত্র হয়ে জোর করে জমি দখল করত। জোর করে চাষ করা ফসল কেটে নিত। এই ভাবেই এই আন্দোলন সুরু হল। পরিণতি হল নকশাল পন্থা নামে নতুন মতবাদের উদ্ভব, যা শেষ পর্যন্ত চীনের মাও-সে-তুঙের সমর্থন লাভ করে। পিকিং রেডিও ঘোষণা করে, মাং-সে-তুঙের প্রদর্শিত পথে এখানে বিপ্লব সুরু হয়ে গিয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পোষ্টার পড়ল: "নকশালবাড়ির আগুন ভারতের গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে দাও।"

নকশালবাড়ির আন্দোলনের সুরু ১৯৬৬ সালের ধানকাটার মরশুমে। আর, ১৯৬৭ সালে এই আন্দোলন বিস্ফোরণের আকার নেয়। এই বছর মার্চ মাসে চারটি ঘটনার কথা শোনা যায়। একটি নকশালবাড়িতে এবং বাকি তিনটি

খড়িবাড়ি এলাকায়। এপ্রিল মাসে দশটি ঘটনা ঘটে। আটটি নকশালবাড়িতে আর একটি করে খড়িবাড়ি ও ফাঁসিদেওয়াতে। মে মাসের হিসাব ৪৬টি ঘটনার। নকশালবাড়িতে নয়টি, খড়িবাড়িতে ২৬টি, ফাঁসিদেওয়া থানায় আটটি এবং শিলিগুড়ি থানায় একটি। ২২শে মে পর্যন্ত মোট ২৭১ টি ঘটনার কথা জানা যায়।

এর পরে ঘটনার সংখ্যা হ্রাস পেলেও ঘটনাগুলির চরিত্রের পরিবর্তন ঘটে। ২২শে মে'র পরবর্তী ঘটনাগুলি দুঃসাহসী ও সশস্ত্র সংঘর্ষে উদ্দীপ্ত। ২৩শে মে তিনটি থানা এলাকায় ১৪৪ ধারা জারী করা হয়। ২২শে মে পর্যন্ত ৬০টি ঘটনার চরিত্র ছিল লুঠ। জবরদস্তি ধান চাল অপহরণের অভিযোগ সাতটি ক্ষেত্রে। অপরের জমিতে জবরদস্তি চাষ করার অভিযোগ ৪১টি ক্ষেত্রে, জবরদস্তি জমি দখলের অভিযোগ নয়টি ক্ষেত্রে, জখম ও ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগ তিনটি ক্ষেত্রে। ২৩শে মে'র পরবর্তী ঘটনাগুলি সংঘর্ষে জটিল হয়ে ওঠে। এই সময় থেকেই ১৪৪ ধারা জারী করা অঞ্চলে পুলিশ ক্যাম্প বসানো হয়; কৃষকদের ছত্রভঙ্গ করতে বল প্রয়োগ ও অত্যাচার সুরু হয়। আন্দোলনকারীরাও রসদ ও অস্ত্র সংগ্রহের জন্য দুঃসাহসিক পথে লুঠতরাজ সুরু করে। আন্দোলন ক্রমশই রহস্যময় ও রোমাঞ্চকর হয়ে ওঠে।

২৮শে মে, বুধবার নকশালবাড়ি থানার হাতিঘিষার কাছে ঝাড়ুগাঁও গ্রামে তীর, ধনুক প্রভৃতি মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত এক জনতার সঙ্গে সংঘর্ষে চারজন পুলিশ অফিসার আহত হয়। সকাল আটটায় এই ঘটনা ঘটে। কয়েকটি ফৌজদারী মামলার আসামীদের গ্রেপ্তার করার জন্য পুলিশ হাতিঘিষায় গিয়েছিল। একদল জনতা পুলিশের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সশস্ত্র জনতার আক্রমণে ইনস্পেক্টর এস ওয়াংদি, নকশালবাড়ি থানার ও-সি এস মুখার্জী, এস-আই নারায়ণ চৌধুরী আহত হন। ওয়াংদিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পুলিশ-সুপার, ডেপুটি কমিশনার, অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার দ্রুত ঘটনা স্থলে উপস্থিত হন। হাসপাতালে ওয়াংদির দেহ থেকে তীর বের করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু সম্ভব হয়না।

২৫শে মে সকালে নকশালবাড়ির কাছে পুলিশ প্রসাদজোত ও ডাকুয়াজোতে এক বিরাট জনতার মুখোমুখি হয়। পুলিশ কয়েক রাউণ্ড গুলি চালায়। গুলিতে দু'জন নারী, একজন পুরুষ ও দুটি শিশু নিহত হয়। এই দিনই আহত পুলিশ-

অফিসার ওয়াংদি শিলিগুড়ি হাসপাতালে মারা যায়। এই দিন পুলিশ একশো জনকে গ্রেপ্তার করে। তার মধ্যে ছিলেন পঞ্চানন সরকার।

২৭শে মে, শুক্রবারের সংবাদপত্রে পুলিশের গুলিতে নিহত হওয়ার বিবরণ প্রকাশিত হয়। নকশালবাড়ি সংবাদপত্রের শিরোনামে চলে আসে। নকশালবাড়ি এলাকার আন্দোলনের বিবরণ দিয়ে বলা হয়, এখানে মাসাধিক কাল অনেক বে-আইনী কাজ চলছিল। মার্কস্‌বাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির একটি উগ্রপন্থী অংশ দ্বারা চালিত কিছু সংখ্যক আদিবাসী সমানে লুঠতরাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। চাষীদের জমি জবর-দখল করছিল। ক্ষেতের ফসল লুঠ করছিল। আরও অভিযোগ, উগ্রপন্থীদের দলে যোগদানের জন্য জোর-জুলুম চালানো হচ্ছিল। এই সব ঘটনা সম্পর্কে পুলিশ মোট সাতটি কেস করে, কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি। কিছুদিন আগে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অবস্থা বিস্তারিত ভাবে জানানো হয় এবং তাঁর নির্দেশ চাওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রী কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। সেই নির্দেশ অনুযায়ী পুলিশ বিভিন্ন স্থানে ক্যাম্প বসায় এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা সুরু করে। বৃহস্পতিবার এস-ডি-পি-ও এবং এস-ডি-ও-র নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করতে অগ্রসর হলে সশস্ত্র নারী-পুরুষের একটি দল পুলিশকে আক্রমণ করে। নারীরা ছিল দলের পুরোভাগে। তাদের হাতেও ছিল তীর-ধনুক।

মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায় শনিবার নকশালবাড়ি যাত্রা করলেন। দার্জিলিং-এ পৌঁছে তিনি বললেন, "উত্তরবঙ্গের আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখবার সব ব্যবস্থা করতে হ'বে।" মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন দেওপ্রকাশ রাই, কমল গুহ, সুনীল দাসগুপ্ত। রবিবার সকালে দার্জিলিং থেকে শিলিগুড়ি আসার পথে সেবক রোডে এক দুর্ঘটনায় সুনীল দাশগুপ্ত, কমল গুহ ও সাংবাদিক বরুণ সেনগুপ্ত আহত হন। মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং আহতদের উদ্ধার করেন। এই দুর্ঘটনার পরে দীর্ঘদিন অসুস্থ থেকে বিধানসভার প্রাক্তন তরুণ সদস্য সুনীল দাশগুপ্তের মৃত্যু হয়।

২৮শে মে মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায় নকশালবাড়িতে ঘোষণা করেন: "কেউ অন্যায় করলেই বা আইন ভাঙলেই সাজা পেতে হবে। পার্টির বিচারে ও আইনের বিচারে তারতম্য ঘটবে না।" কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতা প্রমোদ দাশগুপ্ত নকশালবাড়ির ঘটনা সম্পর্কে আগের দিন মন্তব্য করেন, "নকশালবাড়ির

ঘটনায় কেন্দ্রের ষড়যন্ত্র আছে।" প্রমোদ দাশগুপ্তের এই উক্তির উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "ওঁরা সব কিছুতেই ষড়যন্ত্র দেখতে পান।"

নকশালবাড়িতে গুলি-চালনার দিন প্রমোদ দাশগুপ্ত শিলিগুড়ি ছিলেন। তিনি সেদিন মন্তব্য করেছিলেন, প্যারি কমিউন মার্ক্স্ প্রথমে মেনে নেন নি, কিন্তু পরে নিয়েছিলেন। শিলিগুড়ি থাকাকালে এই অর্থপূর্ণ মন্তব্যের পর তিনি কলকাতায় পৌঁছে কিন্তু বলেছিলেন, নকশাল আন্দোলনের পেছনে কে আছে কে জানে। এই প্রসঙ্গে তিনি সি-আই-এ'র কথাও বলেছিলেন।

২৮শে মে তারিখের সি-পি-আই (এম)-এর মুখপত্র 'দেশহিতৈষী' পত্রিকায় 'নকশালবাড়ি' ঘটনার মূলে কী?' শীর্ষক এক দীর্ঘ প্রবন্ধে বলা হয় যে, বুদ্ধিমান তির্কি নামে এক জোতদার দলবল সহ সরকারী জমির ঠিকা প্রজা বিগলকিষণকে জমি আবাদের সময় প্রহার করে। এই প্রহারই হ'ল সংঘর্ষের মূলসূত্র। এই জোতদারের দল সরকারের জমিবন্টন নীতি অমান্য করায় এই অঞ্চলে গোলমালের উৎপত্তি হয়। তারপর সেচ ও ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী হরেকৃষ্ণ কোঙারের হস্তক্ষেপের ফলে একটা মীমাংসা সূত্রের উদ্ভব হয়। এক বৈঠকে উভয় পক্ষই সরকারীনীতি কার্যকরী করতে রাজী হয়। যাঁদের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আছে, তাঁরা আত্মসমর্পণ করলে জামিনের ব্যবস্থা করতে এস-পি-রাজী হন। কিন্তু মীমাংসার এই সুযোগ অবহেলা করে পুলিশ কর্তৃপক্ষ গ্রামে পুলিশী ফৌজ পাঠাতে নির্দেশ দেয়। ফলে ঘটনার দ্রুত অবনতি ঘটে। প্রমোদ দাশগুপ্ত এই হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করে বিচার-বিভাগীয় তদন্ত দাবী করেন।

৩০শে মে নকশালবাড়ি ঘটনা সম্পর্কে কম্যুনিষ্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী)-র রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করে:

"নকশালবাড়িতে আদিবাসী নারী, শিশু ও পুরুষদের নৃশংসভাবে হত্যা করায় কম্যানিষ্ট পাটির সম্পাদকমণ্ডলী স্তম্ভিত হয়েছে। সম্পাদকমণ্ডলীর দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছে যে নকশালবাড়িতে কৃষক বিক্ষোভের পেছনে রয়েছে এক গভীর সামাজিক ব্যাধি। জমির বে-আইনী হস্তান্তর, জমি থেকে উচ্ছেদ, জোতদার ও চা-বাগান মালিকদের জনস্বার্থবিরোধী কার্য সেই সামাজিক ব্যাধির মূল কথা। এই রকম পবিস্থিতিতে নকশালবাড়ির কৃষক বিক্ষোভকে সাধারণ আইন ও শৃঙ্খলার সমস্যা হিসাবে দেখলে এবং পুলিশী ব্যবস্থা দিয়ে তার সমাধানের চেষ্টা করলে সর্বনাশা

পরিণতি ঘটবে এবং যুক্তফ্রন্ট সরকারের মূলে কুঠারাঘাত হানা হবে। এই ধারণার উপর ভিত্তি করেই হরেকৃষ্ণ কোঙার পরিস্থিতিতে হস্তক্ষেপ করেছিলেন এবং সমস্যা সমাধানের অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিলেন। সকলের গ্রহণযোগ্য একটি সমাধানসূত্রও উদ্ভাবিত হয়েছিল। এই সূত্রকে মোটামুটিভাবে কার্যকরী করে দেখবার জন্য যথেষ্ট সময় ও নমনীয় কৌশল ছিল অপরিহার্য। কিন্তু মনে হচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের এবং প্রশাসন-ব্যবস্থার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের এই ব্যবস্থা মনঃপূত ছিল না। হাওড়ার ঘটনার পর নকশালবাড়ির ঘটনা ঘটায় এক অশুভ লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠল। সকলের গ্রহণযোগ্য যে চুক্তি করা হয়েছিল তাকে কার্যকরী না করে হরেকৃষ্ণ কোঙারের কলকাতা প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পরেই কেন সেখানে পুলিশ-ক্যাম্প বসানো হ'ল তা সম্পাদকমণ্ডলী বুঝতে অক্ষম। এটা দুঃখজনক যে একজন পুলিশ-অফিসার নিহত হয়েছিলেন। কিন্তু সেই ঘটনা দিয়ে পুলিশের পরের দিনের কার্যকলাপের ন্যায্যতা প্রতিপন্ন করা যায় না। পুলিশের পরের দিনের কার্যকলাপের ফলেই এতগুলি মানুষের মৃত্যু ঘটেছে। পুলিশের কার্যকলাপ দেখে মনে হয় যে তারা প্রতিশোধ নেবার ব্যবস্থা হিসেবেই এই কাজ করেছিল।"

২রা জুন, 'দেশহিতৈষী' পত্রিকার সম্পাদকীয়তে বলা হল :

"নকশালবাড়িতে যুক্তফ্রন্ট সরকারের কলঙ্কময় অধ্যায় রচিত হয়েছে। সেখানে পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছে সাতজন কৃষক-রমণী, দুটি শিশু এবং একজন কৃষক। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের আমরা তীব্র নিন্দা করছি। পুলিশের এই গুলিবর্ষণের তীব্র প্রতিবাদ করছি।

"কিন্তু এই কৃষক হত্যার বিরুদ্ধে নিন্দা আর প্রতিবাদই যথেষ্ট নয়, এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে আরও অনেক প্রশ্ন জড়িত। কাদের ইঙ্গিতে কংগ্রেস সরকারের মতো যুক্তফ্রন্ট সরকারের হস্তও শিশুর রক্তে রঞ্জিত হল? এই প্রশ্ন যুক্তফ্রন্ট সরকার সমর্থকদের মন নাড়া দিল। প্রকাশ, ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী ঐ অঞ্চল পরিদর্শন করে এসে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এক দীর্ঘ রিপোর্ট দিয়েছিলেন। সেই রিপোর্ট কি মন্ত্রি-সভায় আলোচিত হয়েছিল? যদি আলোচিত হয়ে থাকে তবে নকশালবাড়ি সম্পর্কে মন্ত্রিসভার কী সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল? আর যদি মন্ত্রিসভায় আদৌ তা না আলোচিত হয়ে থাকে তবে কেন তা হয়নি, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আজ আমরা এই প্রশ্নের জবাব চাই। এইখানেই প্রশ্নের শেষ নয়—নকশালবাড়ির

ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী কাদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন ? তিনি কি মন্ত্রিসভার দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন, না তিনি পুলিশের অধিকর্তার দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন ?"

৪ঠা জুন সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় মার্কস্‌বাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির পক্ষ থেকে এই নকশালবাড়ি হত্যাকাণ্ডের এক বিচার-বিভাগীয় তদন্তের দাবী করা হয়। এই সভায় বক্তা ছিলেন জ্যোতি বসু ও প্রমোদ দাশগুপ্ত। প্রমোদ দাশগুপ্ত এই জনসভায় বলেন, "খাদ্যমন্ত্রী ডঃ ঘোষের যদি তর্কের সমালোচনা পছন্দ না হয় তবে তিনি মন্ত্রিদপ্তর পালটাতে পারেন। কংগ্রেসকে পুনর্জীবিত করার জন্য যুক্তফ্রণ্ট সরকারের বিরুদ্ধে যে চক্রান্ত চলছে আমরা তার সম্পর্কে জনগণকে ওয়াকিবহাল রাখতে চাই। কারণ, যুক্তফ্রণ্টকে দিয়ে পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষা হচ্ছেনা। তাই পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় পুলিশ বাহিনী গঠন করা হচ্ছে মালিকদের স্বার্থরক্ষা করতে।" জ্যোতি বসু বললেন, "গত তিন মাসে রাজ্যের ভিতর যা ঘটে গেল তা স্বতঃস্ফূর্ত নয়, তার পেছনে কংগ্রেসীদের হাত রয়েছে।" তিনি বলেন, নকশালবাড়িতে পুলিশের গুলিচালনার প্রয়োজন ছিল না। তিনি একজন বিচারপতি দিয়ে বিচার-বিভাগীয় তদন্তের দাবী জানান। নকশালবাড়ির ঘটনা সম্পর্কে কৃষক-সভার সহ-সভাপতি আব্দুল্লা রসুলও এক বিবৃতি দেন। সেই বিবৃতিতে তিনি বলেন যে, নকশালবাড়ির কৃষক-বিক্ষোভ এবং নৃশংসভাবে শিশু-নারী-কৃষক হত্যা বর্তমান সমাজ-জীবনের ও শাসন ব্যবস্থার এক দূষিত ব্যাধিকে খুলে ধরেছে। জমিদার, জোতদার ও চা-বাগান মালিকের বে-আইনী কার্যকলাপ, অবাধ জুলুম ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে মেহনতী মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে। অন্যদিকে সেই বিক্ষোভকেই আইন-শৃঙ্খলার নামে রক্তের বন্যায় ডুবিয়ে দেবার চেষ্টা হয়েছে।

৭ই জুন যুক্তফ্রণ্টের সভায় সর্বপ্রথম নকশালবাড়ি পরিস্থিতির পূর্ণাঙ্গ আলোচনা হল। এই সভায় স্থির হয় যে, ১১ই জুন মন্ত্রিসভার একদল সদস্য নকশালবাড়ি গিয়ে সরেজমিনে তদন্ত করবেন। যুক্তফ্রণ্টের এই সিদ্ধান্ত ৮ই জুন মন্ত্রিসভার বৈঠকে আলোচিত হয় এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে পূর্ণক্ষমতাসম্পন্ন ছয়জন মন্ত্রীর একটি প্রতিনিধিদল নকশালবাড়ি যাবেন এবং সেখানকার সমস্যাবলী সামগ্রিক-ভাবে উপলব্ধি করে সমাধানের উপায় নির্ধারণ করবেন। মন্ত্রীদের হাতে সমস্যার পর্যালোচনার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের পূর্ণক্ষমতা দেওয়া হল।

প্রতিনিধি দলের এই ছয়জন মন্ত্রী হলেন হরেকৃষ্ণ কোঙার, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, সুশীল ধাড়া, ননী ভট্টাচার্য, অমর চক্রবর্তী ও দেওপ্রকাশ রাই।

ঐদিন আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটল। মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি দার্জিলিং-এর জেলা কমিটি ভেঙ্গে নতুন জেলা কমিটি গঠন করে দিলেন। সম্পাদকমণ্ডলীর সিদ্ধান্তে বলা হল যে, দার্জিলিং-এ পার্টি সংগঠন ও গণ-আন্দোলন পরিচালনায় কিছু ত্রুটি লক্ষ্য করা গিয়েছে। গণ-আন্দোলনের ক্ষেত্রে জেলা-পার্টির ব্যর্থতার কথা স্বীকার করা হল। জেলা কমিটির ২৫ জন সদস্য ছাঁটাই করে নয় জন সদস্যের এক কমিটি গঠন করা হল। রতনলাল ব্রাহ্মণ কমিটির আহ্বায়ক হলেন। শিলিগুড়ি মহকুমা কমিটিও ভেঙ্গে দিয়ে বীরেন বসুকে সম্পাদক করা হ'ল। সৌরীন বসুকে সরানো হ'ল।

ঐদিন কলকাতায় খবর এল, খয়রাজোড় গ্রামে দুই হাজার লোক তীর-ধনুক নিয়ে এক ব্যক্তির বাড়ি আক্রমণ করে লুঠ করেছে। ঐ দিনই কোইরিঝাড় গ্রামে দুই হাজার লোক হানা দিয়ে এক ব্যক্তির বাড়ি লুঠ করে। ১০ই জুন খবর এল বাদবগুনি গ্রামে এক সশস্ত্র জনতা নগেন চৌধুরীর বাড়ি লুঠ করে নগেন চৌধুরীকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। ১১ই জুন একদল উগ্রপন্থী হাতিঘিষা অঞ্চল পঞ্চায়েত-এর সম্পাদককে জানিয়ে দেয় যে, এটা মুক্ত অঞ্চল। এই দিনই শিলিগুড়ি থেকে এক তারবার্তায় রাজ্যপাল, রাষ্ট্রপতি ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে সব অবস্থা জানিয়ে অবিলম্বে প্রতিকার প্রার্থনা করা হয়।

১২ই জুন মন্ত্রী-মিশন নকশালবাড়ি পৌঁছল। মুখ্যমন্ত্রী কলকাতায় বললেন নকশাল-বাড়িতে সন্ত্রাসের রাজত্ব চলছে। নকশালবাড়ির সমস্যা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং আইন-শৃঙ্খলার।

১৪ই জুন মন্ত্রী-মিশনের সদস্যরা বললেন, "ভয়ে ত্রাসে পালিয়ে যাবেন না, অরাজকতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান।" এইদিন হরেকৃষ্ণ কোঙার বিদ্রোহী উগ্রপন্থী নেতাদের সঙ্গে দেখা করলেন। বিদ্রোহীরা কোঙারকে বললেন, তিনি একদা বাংলার কৃষক আন্দোলনের নেতৃত্ব করেছেন, আর, আজ মন্ত্রী হয়ে অন্য কথা বলছেন কেন। হরেকৃষ্ণ কোঙার উত্তর দিয়েছিলেন, অরাজকতা আন্দোলন নয়। অরাজকতা দমনে সব ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কানু সান্যালদের সঙ্গে সুখনা বাংলোতে হরেকৃষ্ণ কোঙারের সভার একদিন আগে

একটি বৈঠক হয়। এই বৈঠকে দার্জিলিং জেলার সি-পি-আই (এম) নেতাদের সঙ্গে কোঙার মিলিত হয়েছিলেন। এই সভার শেষে বেরিয়ে আসবার সময় কোঙার কানু সান্যালের হাতে একটা চাপ দিয়ে বলেছিলেন : 'কানু তুমি ধরা দিও না।' পরের দিন সভায় কোঙার যখন কথা বলেন, তখন কানু সান্যাল একটি কথাও বলেন নি। কোন কথা মেনেও নেন নি, প্রতিবাদও করেন নি।

হরেকৃষ্ণ কোঙার শিলিগুড়ি জেলে বিদ্রোহী নেতা পঞ্চানন সরকার ও বুধন টুডুর সঙ্গে দেখা করলেন। বিদ্রোহী নেতারা জানিয়ে দিলেন যে যুক্তফ্রন্ট সরকার শ্রেণী-সংগ্রামের মৌল চরিত্র পরিবর্তনের চেষ্টা করছেন এবং শোধনবাদ প্রবর্তন করছেন। এই প্রথম মার্ক্‌স্‌বাদী কম্যুনিষ্ট নেতাকে শোধনবাদী বলা হল। এই দিন, মন্ত্রীদের এক জনসভায় গোলমাল করা হয় এবং এস-এস-পি নেতা সম্পত রায় বলেন যে, মন্ত্রীদের ধাপ্পাবাজী চলবে না।

১৫ই জুন উগ্রপন্থীরা তীর-ধনুক নিয়ে ধাপাগাছিতে নরেশ কুজুর বাড়ি আক্রমণ করলে কুজুর বাড়ি থেকে গুলি চালানো হয়। দু'জন আক্রমণকারী নিহত হয়। পরিস্থিতির ক্রমাবনতিতে মন্ত্রী-মিশন আরও কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেন এবং তাঁরা কানু সান্যাল ও জঙ্গল সাঁওতাল পরিচালিত সশস্ত্র হানাদারদের শেষবারের মতো সতর্ক ও হুঁশিয়ার করে দেন। এই প্রথম খবর প্রকাশ হল যে নকশালবাড়ি আন্দোলনের পেছনে আছেন কানু সান্যাল ও জঙ্গল সাঁওতাল। পরে কানু সান্যাল একটি রোমাঞ্চ-কাহিনীতে পরিণত হন। জঙ্গল সাঁওতাল পরে পুলিশের হাতে ধরা পড়েন এবং তাঁর জেল হয়।

১৬ই জুন ফাঁসিদেওয়া থানার সাহাবাদ চা-বাগানের কাছে দু'টি গ্রামে আগুন দেওয়া হয়।

২১শে জুন মন্ত্রিসভার বৈঠকে বলা হয় যে, মন্ত্রী-মিশনের আবেদনে সাড়া না দিলে, আন্দোলনকারীরা শান্ত না হলে, কারও উপর অত্যাচার হলে পুলিশ প্রয়োগ করা হবে।

২১শে জুন প্রথম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে পোস্টার দেখা যায় : নকশালবাড়ির আগুন ভারতের গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে দাও। এই আহ্বান শুধু গ্রামে নয়, ভারতের সহরে, গ্রামে, সর্বত্র ছড়িয়ে যায়। নকশালবাড়ির নামে নতুন আদর্শবাদ সৃষ্টি হয়।

২৭শে জুন কলকাতায় প্রথম নকশালবাড়ির সমর্থনে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়।

২৮শে জুন নিউ চায়না নিউজ এজেন্সী খবর দেয়, ভারত সরকারের বিরুদ্ধে কৃষক-সংগ্রাম পরিচালনার জন্য ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টি দার্জিলিং জেলায় একটি ঘাঁটি গড়ে তুলেছে। চীন নকশালবাড়ি আন্দোলন সম্পর্কে এই প্রথম অভিযান সুরু করে। এর পরেই পিকিং রেডিও বলে, "বিদ্রোহীরা নিজস্ব রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং এইভাবে ভারতের প্রতিক্রিয়াশীল সরকার ও জমিদার শ্রেণীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন। মাও-সে-তুঙের পরিচালনায় ভারতের জনগণ কর্তৃক বিদ্রোহ সুরু হয়েছে।"

১৯৬৭ সালের ৫ই জুলাই তারিখের পিকিং রিভিয়্যু-এ এক দীর্ঘ নিবন্ধে বলা হয়:

"প্রচণ্ড গর্জনে ভারতের বুকে ধ্বনিত হয়েছে বসন্তের বজ্র নির্ঘোষ। দার্জিলিং অঞ্চলের বিপ্লবী কৃষকেরা বিদ্রোহে ফেটে পড়েছেন। ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির একটি বিপ্লবী অংশের নেতৃত্বে গ্রামাঞ্চলে বিপ্লবী সশস্ত্র সংগ্রামের এক লাল এলাকা ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভারতীয় জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামের পক্ষে এটা একটা প্রচণ্ড তাৎপর্যপূর্ণ বিকাশ।

"গত কয়েকমাসে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির বিপ্লবী অংশের নেতৃত্বে এই অঞ্চলের কৃষক জনতা ছিঁড়ে ফেলেছেন আধুনিক সংশোধনবাদের বন্ধন, চূর্ণ বিচূর্ণ করেছেন তাদের পায়ের শৃঙ্খল, তাঁরা জমিদার ও বাগিচা মালিকদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছেন শস্য, জমি ও অস্ত্রশস্ত্র। শাস্তি দিয়েছেন স্থানীয় উৎপীড়ক ও বদমাস বাবুদের, অতর্কিত আক্রমণ চালিয়েছেন তাঁদের দমন করার জন্য প্রেরিত প্রতি-ক্রিয়াশীল বাহিনী ও পুলিশের উপর এবং এভাবে প্রমাণ করে দিয়েছেন কৃষকের বিপ্লবী সশস্ত্র সংগ্রামের প্রচণ্ড শক্তির। সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী, সংশোধনবাদী, দুর্নীতিবাজ কর্মচারী, স্থানীয় উৎপীড়ক ও বদবাবুরা, প্রতিক্রিয়াশীল বাহিনী ও পুলিশেরা বিপ্লবী কৃষকদের কাছে তুচ্ছ হয়ে গেছে। এদের ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়ার জন্য তারা দৃঢ়সংকল্প হয়েছেন। ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির বিপ্লবী অংশের কর্মীরা পুরোপুরি সঠিক কাজ করেছেন, এবং এটা করেছেন সঠিকভাবে। সারা দুনিয়ার মার্ক্সবাদী ও বিপ্লবী জনগণের সঙ্গে সঙ্গে চীনের জনগণও দার্জিলিং অঞ্চলের ভারতীয় কৃষকদের এই বিপ্লবী ঝড়কে উৎসাহের সঙ্গে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। ভারতীয় কৃষকদের বিদ্রোহ ও ভারতীয় জনগণের বিপ্লব হচ্ছে

অনিবার্য। ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীল কংগ্রেসী শাসন এ ছাড়া আর কোন বিকল্প রাখেনি, কংগ্রেস-শাসনাধীন ভারত নামে স্বাধীন হলেও বাস্তবে একটি আধা-উপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক দেশ, কংগ্রেস সরকার ভারতীয় রাজা-মহারাজা, বৃহৎ জমিদার এবং আমলাতান্ত্রিক মুৎসুদ্দি পুঁজিপতিদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করছে। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সে ভারতীয় জনগণের উপর নির্মম নির্যাতন ও নির্মম শোষণ চালাচ্ছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সে তার পুরানো প্রভু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভরশীল থেকেই তার নতুন প্রভু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার একনম্বর সহযোগী সোভিয়েত সংশোধনবাদী চক্রের কোলে নিজেকে সঁপে দিয়েছে। এইভাবে সে ভারতের জাতীয় স্বার্থকে ব্যাপকভাবে বিকিয়ে দিয়েছে। কাজেই ভারতীয় জনগণের, বিশেষতঃ শ্রমিক ও কৃষক জনতার পিঠের উপর বিরাট পাহাড়ের মত চেপে আছে সাম্রাজ্যবাদ, সোভিয়েত সংশোধনবাদ, সামন্ততন্ত্র ও আমলাতান্ত্রিক মুৎসুদ্দি পুঁজিবাদ। গত কয়েক বছরে কংগ্রেস সরকার অনেক বেশী তীব্রভাবে ভারতীয় জনগণের উপর তার নির্মম নির্যাতন ও শোষণ বাড়িয়েছে এবং জাতীয় বিশ্বাসঘাতকতার নীতি অনুসরণ করছে। ফলতঃ বছরের পর বছর ধরে দেশে নেমে এসেছে দুর্ভিক্ষ। জনগণের অনাহারে মৃত্যু হ'য়ে দাঁড়িয়েছে একটি অতি সাধারণ দৃশ্য, ভারতীয় জনতার, বিশেষ করে কৃষক জনতার বেঁচে থাকাটাই অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। দার্জিলিং অঞ্চলের বিপ্লবী কৃষকরা ফেটে পড়েছেন বিপ্লবে, হিংসাত্মক বিপ্লবে। এটা সারা ভারত জুড়ে কোটি কোটি জনতার হিংসাত্মক বিপ্লবেরই সূচনা। ভারতের জনগণ সুনিশ্চিত ভাবে তাদের পিঠ থেকে ছুঁড়ে ফেলবেন এই পাহাড়গুলিকে, অর্জন করবেন চূড়ান্ত মুক্তি। এটাই হচ্ছে ভারতের ইতিহাসের সাধারণ ধারা। সারা দুনিয়ায় কোনও শক্তিই তাকে বাধা দিতে বা ঠেকাতে পারবে না।

"ভারতীয় বিপ্লব কোন পথে এগোবে এই মৌলিক প্রশ্নটির উপরই নির্ভর করছে বিপ্লবের চূড়ান্ত সাফল্য বা ব্যর্থতা এবং ৫০ কোটি জনতার ভবিষ্যৎ। ভারতীয় বিপ্লবকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে কৃষকদের উপর নির্ভর করার, গ্রামাঞ্চলে ঘাঁটি এলাকা স্থাপন করার, গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার এবং সবশেষে শহর দখল করার পথ। এটাই হচ্ছে মাও-সে-তুঙের পথ, যে পথ চীন বিপ্লবকে সাফল্যের দিকে নিয়ে গেছে। যে পথ নিপীড়িত জাতিসমূহ ও জনগণের বিজয়ের একমাত্র পথ।

"আজ থেকে দীর্ঘ চল্লিশ বছর আগে আমাদের মহান নেতা চেয়ারম্যান মাও-সে-

তুঙ বলেছিলেন, 'চীনের মধ্যে দক্ষিণ ও উত্তর অঞ্চলের প্রদেশগুলিতে কোটি কোটি কৃষক জেগে উঠবেন বিরাট এক ঝড়ের মতো, তুফানের মতো এত দ্রুত ও ধ্বংসাত্মক হবে তার শক্তি যে, কোন শক্তিই, তা' যত বড়ই হোক না কেন, তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। তাদের বন্ধনকারী সমস্ত শৃঙ্খলকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে তারা দ্রুত এগিয়ে যাবে মুক্তির পথ ধরে। সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ, যুদ্ধবাজ, দুর্নীতিগ্রস্থ কর্মচারী, স্থানীয় উৎপীড়ক এবং বদবাবুদের তারা ছুঁড়ে ফেলবে কবরের মধ্যে।

"দীর্ঘদিন আগেই চেয়ারম্যান স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে, জনগণের বিপ্লবে কৃষক সমাজের রয়েছে এক প্রচণ্ড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। সাম্রাজ্যবাদ ও তার দালালদের বিরুদ্ধে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মূল শক্তি কৃষকরাই। তারাই হচ্ছে সর্বহারা শ্রেণীর সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য এবং সংখ্যাবহুল মিত্র। ভারত আধা-উপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক একটি বিরাট দেশ। ৫০ কোটি মানুষের বাসভূমি। যাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই হচ্ছে কৃষক। একবার জেগে উঠলে এই কৃষকরাই হয়ে উঠবেন ভারতীয় বিপ্লবের এক অপ্রতিরোধ্য শক্তি। কৃষকের সাথে ভারতীয় সর্বহারা সমর্থ হবেন বিশাল গ্রামাঞ্চলে দুনিয়া কাঁপানো সব পরিবর্তন আনতে, হৃদয় কাঁপিয়ে জনযুদ্ধে যে কোন শত্রুকে পরাজিত করতে।

"আমাদের মহান নেতা চেয়ারম্যান শিখিয়েছেন, 'সশস্ত্র বাহিনীর সাহায্যে ক্ষমতা দখল এবং যুদ্ধের মাধ্যমে সে প্রশ্নের মীমাংসাই হচ্ছে বিপ্লবের মূল কর্তব্য ও সর্বোচ্চ রূপ।' বিপ্লবের এই মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব চীন এবং অন্যান্য সমস্ত দেশের ক্ষেত্রে সার্বজনীনভাবে প্রযোজ্য।

চীন বিপ্লবের মতো ভারতীয় বিপ্লবের বৈশিষ্ট হচ্ছে, সশস্ত্র বিপ্লব সশস্ত্র প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে লড়ছে। সশস্ত্র বিপ্লবই একমাত্র সঠিক পথ। এ ছাড়া অন্য কোনও পথ নেই। "গান্ধীবাদ" পার্লামেণ্টারী পথ, প্রভৃতি আবর্জনাগুলি হচ্ছে ভারতীয় জনতাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখার জন্য ভারতীয় শাসকশ্রেণীগুলি কর্তৃক ব্যবহৃত যন্ত্র। কেবলমাত্র হিংসাত্মক বিপ্লবের উপর নির্ভর করেই এবং সশস্ত্র সংগ্রামের পথ ধরেই বাঁচানো যায় ভারতকে। সম্পূর্ণ মুক্তি অর্জন করতে পারেন ভারতীয় জনগণ। নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে এর অর্থ হচ্ছে: কৃষক জনতাকে বলিষ্ঠ-ভাবে জাগিয়ে তোলা, বিপ্লবী সশস্ত্র ফৌজ গড়ে তোলা এবং সম্প্রসারিত করা। সামরিকভাবে বিপ্লব বাহিনীর চেয়ে বেশী শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল

বাহিনী। সেই বাহিনীর মোকাবিলা করার জন্য চেয়ারম্যান মাও কর্তৃক প্রণীত জনযুদ্ধের নমনীয় রণনীতি ও রণকৌশলের সমগ্র শিক্ষাকে প্রয়োগ করা, দীর্ঘস্থায়ী সশস্ত্র যুদ্ধের পথে অবিচল থাকা এবং ক্রমাগত পদক্ষেপে বিজয় অর্জন করা। চীনা বিপ্লবের বৈশিষ্টগুলির আলোকে আমাদের মহান নেতা চেয়ারম্যান মাও আমাদের শিখিয়েছেন দীর্ঘস্থায়ী সশস্ত্র যুদ্ধে অবিচল থাকতে হলে এবং সাম্রাজ্যবাদ ও তার দালালদের পরাজিত করতে হলে বিপ্লবী কর্মীদের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে পিছিয়ে থাকা গ্রামগুলিকে অগ্রসর ও সুসংবদ্ধ ঘাঁটি এলাকায় পরিণত করা, বিপ্লবের দুর্ভেদ্য সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দুর্গে পরিণত করা। সেখান থেকেই লড়াই চালাতে হবে সেইসব ঘৃণ্য শক্তির বিরুদ্ধে যারা গ্রামাঞ্চলে আক্রমণ চালাবার জন্য শহরগুলিকে ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করে। দীর্ঘস্থায়ী লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে এভাবেই ক্রমান্বয়ে বিপ্লবের সম্পূর্ণ বিজয় অর্জন করতে হবে।

"ভারত একটি বিশাল দেশ। গ্রামাঞ্চলে প্রতিক্রিয়াশীল শাসকশ্রেণী দুর্বল। সেখানেই বিপ্লবীরা অবাধে কৌশলী অভিযান চালাতে পারে। মার্ক্সবাদ লেনিনবাদ-মাও সে তুঙ চিন্তাধারার বিপ্লবী লাইন অনুসরণ করলে এবং তাদের প্রধান মিত্র কৃষকদের উপর নির্ভর করলে ভারতের সর্বহারা শ্রেণীর পক্ষে পিছিয়ে থাকা বিশাল গ্রামাঞ্চলে একের পর এক অগ্রসর বিপ্লবী গ্রামীন ঘাঁটি এলাকা প্রতিষ্ঠা করা এবং নতুন ধরনের এক গণ-ফৌজ গড়ে তোলা সম্পূর্ণভাবেই সম্ভব। এ ধরনের বিপ্লবী ঘাঁটি গড়ে তুলতে গিয়ে ভারতীয় বিপ্লবীরা যত রকমের অসুবিধা, বাঁক ও মোড়ের সম্মুখীন হোন না কেন, কালক্রমে তাঁরা সেগুলির বিকল্প ঘটাতে পারবেন বিচ্ছিন্ন অঞ্চল থেকে বিরাট এলাকায়, ছোট এলাকা থেকে বিস্তৃত এলাকায়। ঢেউয়ের মতো বিস্তৃতিতেই এভাবে ভারতীয় বিপ্লবের পথে শহরগুলিকে গ্রামাঞ্চল দিয়ে ঘিরে ফেলার অবস্থা ধীরে ধীরে সৃষ্টি হবে। শহরগুলিকে চূড়ান্তভাবে দখল করার এবং দেশজুড়ে বিজয় অর্জন করার পথ পরিষ্কার হবে।

"ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীলরা দার্জিলিংয়ের গ্রামাঞ্চলে সশস্ত্র সংগ্রামের বিকাশ দেখে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। আসন্ন বিপর্যয়ের ইঙ্গিত পেয়ে তাঁরা সাবধানী কাঁদুনী গাইতে সুরু করেছে যে সেখানকার কৃষক বিদ্রোহ জাতীয় বিপর্যয়ে পরিণত হবে। সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীলরা অসংখ্য পদ্ধতিতে দার্জিলিংয়ের

কৃষকদের এই সশস্ত্র সংগ্রামকে দমন করার এবং অঙ্কুরেই একে বিনষ্ট করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। তাছে দলত্যাগী চক্র এবং ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির বিপ্লবীদের এবং দার্জিলিংয়ের কৃষকদের নির্মমভাবে দমন করার ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের তথাকথিত "অ-কংগ্রেসী সরকার" প্রকাশ্যেই প্রতিক্রিয়াশীল ভারত সরকারের পক্ষ নিয়েছে। এইসব দলত্যাগীরা এবং সংশোধনবাদীরা যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েত সংশোধনবাদের পদলেহী কুকুর এবং ভারতের বৃহৎ জমিদার ও বুর্জোয়াদের দালাল এটা তারই একটা নতুন প্রমাণ। তারা যাকে "অকংগ্রেসী সরকার" বলে বর্ণনা করেছে তাও ঐ জমিদার ও বুর্জোয়াদের হাতিয়ার মাত্র।

"কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীরা, ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীলরা ও আধুনিক সংশোধনবাদীরা তাদের অন্তর্ঘাতমূলক ও দমনমূলক কাজ কারবারে পরস্পরের সঙ্গে যতই সহযোগিতা করুক না কেন, ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির বিপ্লবীদের এবং দার্জিলিংয়ের বিপ্লবী কৃষকদের দ্বারা প্রজ্বলিত সশস্ত্র সংগ্রামের মশালকে নেভানো যাবে না। 'একটি স্ফুলিঙ্গ দাবানল জ্বালাতে পারে।'

"দার্জিলিংয়ের স্ফুলিঙ্গ দাবানল জ্বালিয়ে দেবে এবং সুনিশ্চিত ভাবেই ভারতের বিশাল এলাকায় আগুন ছড়িয়ে দেবে। কালক্রমে বিপ্লবী সশস্ত্র সংগ্রামের একটি বিরাট ঝড় যে ভারতের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়বে এটা সুনিশ্চিত। যদিও ভারতের বিপ্লবী সংগ্রামের পথ হবে সুদীর্ঘ ও আঁকাবাঁকা, তবুও মহান মার্কস্‌বাদ-লেনিনবাদ-মাও-সে-তুং চিন্তাধারার পরিচালনায় ভারতীয় বিপ্লব সুনিশ্চিত ভাবেই চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করবে।"

২৭শে জুন নকশালবাড়ির সমর্থনে প্রথম পোস্টার পড়ল। পিকিং রেডিওতে প্রচার হল। সেই সঙ্গে, ২৮শে জুন একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটল। সি পি আই-(এম)-এর অভ্যন্তরে নকশালবাড়ি আন্দোলনের সমর্থক পাটির একাংশের আয়ত্বে তখন 'দেশব্রতী' পত্রিকা। সেই পত্রিকার ৬ই জুলাই সংখ্যায় একটি সংবাদ প্রকাশিত হ'ল: "২৮শে জুন বুধবার রাজ্য কমিটির সম্পাদক (মার্কস্‌বাদী কম্যুনিষ্ট পাটির) প্রমোদ দাশগুপ্তের পরিকল্পনা অনুসারে 'দেশহিতৈষী' পত্রিকার অফিসে হামলা করা হয়। হামলা হয় দুই দফায়। প্রথম দফায় হামলা হয় ঐদিন দুপুর বেলা ২টা নাগাদ, দ্বিতীয় হামলা হয় রাত্রি সাড়ে ৯টা নাগাদ। রাতের হামলায় হামলাকারীরা দেশহিতৈষী অফিসে প্রবেশ করে দরজার তালা

ভেঙে অফিস জবরদখল করে।" আর, 'দেশহিতৈষী'র ৬ই জুলাই সংখ্যায় লেখা হয়, "পার্টি বিরোধী চক্রের হাত থেকে 'দেশহিতৈষী' ও 'দেশহিতৈষী' অফিস উদ্ধার করা হয়েছে।" উল্লেখ করা যেতে পারে যে পার্টির মুখপত্র 'দেশহিতৈষী' পত্রিকাটিও নকশালবাড়ি সমর্থক গোষ্ঠী কুক্ষিগত করার চেষ্টা করে।

এই সময় মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির রাজ্য কমিটির সুশীতল রায় চৌধুরীকে হটকারী কার্যকলাপ ও দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে জেলা পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হয়। এই বহিষ্কারের অভিযোগপত্রে আট দফা অভিযোগের শেষ অভি-যোগে প্রমোদ দাশগুপ্ত উল্লেখ করেন, "গত ২৪ ও ২৫শে মে নকশালবাড়ি ঘটনার সময় আপনাকে শিলিগুড়িতে দেখা গেছে। ঐ সময় আপনি চারু মজুমদার ও সমমনোভাবসম্পন্ন কমরেডদের সঙ্গে দেখা করেছেন। কিন্তু রাজ্য-কমিটির সেক্রেটারীও সেখানে ছিলেন। অথচ কৃষক নারী শিশু হত্যার সংকটজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি সম্পর্কে সেক্রেটারীর সঙ্গে আলোচনার প্রয়োজন বোধ করেন নি। রাজ্য কমিটির সভার আগেই ১৮ই জুন আপনাকে অভিযোগগুলি সম্পর্কে জবাব দিতে হবে।" এই অভিযোগ পত্রে স্বাক্ষর করেন প্রমোদ দাশগুপ্ত, সম্পাদক রাজ্য কমিটি সি পি আই (এম)। তারিখ ৬-৬-৬৭।

এর পরের ইতিহাস, সি-পি-আই (এম) ভেঙ্গে চারু মজুমদারের নেতৃত্বে সি-পি-আই (এম-এল) গঠনের ইতিহাস। তারও পরের ইতিহাস যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গে যাবার ইতিহাস।

যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গে যাবার আগে ১৯৬০ থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে সি-পি-আই (এম)-এর নানা ঘাত-প্রতিঘাতের একটি বিবরণ তুলে ধরা হচ্ছে প্রমোদ দাশগুপ্তের জবানীতে। ১৯৭৪ সালে শারদীয় 'দেশহিতৈষী' পত্রিকাতে প্রমোদ দাশগুপ্তের রাজনৈতিক বিশ্লেষণযুক্ত লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু বিশেষ কারণে এই লেখাটি প্রচারিত হয় নি। যদিও এই লেখাটির মধ্যে সি-পি-আই (এম) ভাঙ্গার একটি তথ্য-নির্ভর ছবি পাওয়া যায়। প্রমোদ দাশগুপ্ত পার্টির ভেতরের অবস্থা অত্যন্ত খোলাখুলিভাবে এই প্রবন্ধে আলোচনা করেছিলেন। প্রবন্ধটি এখানে হুবুহু উদ্ধৃত করা হচ্ছে: "পার্টি নেতৃত্বের মধ্যে মতাদর্শগত পার্থক্য সুরু হয়েছিল পালঘাট কংগ্রেস থেকে। এই মতাদর্শগত পার্থক্যের চরম অভি-ব্যক্তি ঘটল ১৯৬২ সালের অক্টোবর-নভেম্বরে জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে। সেই অধিবেশনে গৃহীত সংখ্যা-

পরিষদের প্রস্তাবের সঙ্গে আমাদের বিরাট মতপার্থক্য ছিল। সেদিন আমরা উপলব্ধি করেছিলাম যে সংশোধনবাদীদের বিরুদ্ধে আমাদের পার্টির ভেতর থেকেই কঠোর সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে এবং এই সংগ্রামের মধ্য দিয়েই শেষ পর্যন্ত হয়তো সংশোধনবাদীদের সঙ্গে আমাদের পার্টি-সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। এই সংগ্রামের জন্য আমরা পশ্চিমবঙ্গে গোপন সংগঠনের ব্যবস্থা করেছিলাম। কেন না, আমরা এ কথাও বুঝেছিলাম যে জাতীয় পরিষদের প্রস্তাবের সঙ্গে আমাদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকার ফলে দমননীতির খড়্গ আমাদের উপরই নেমে আসবে। ঘটনাও তাই ঘটল—২১শে নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গের পার্টি নেতৃত্ব ও অনেক কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হল। আর সেই সুযোগে ডাঙ্গেপন্থী ভবানী সেন সোমনাথ লাহিড়ী চক্র পার্টি দপ্তরে, পার্টি পত্রিকা দপ্তরে জেঁকে বসলো। তখন সাধারণ পার্টি কর্মীরা তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলো—এই সব পার্টি কর্মীদের বিক্ষোভকে সংগঠিত রূপ দিয়ে নতুনভাবে পার্টিকে প্রকৃত মার্ক্‌স্‌বাদী-লেনিনবাদী পার্টি হিসাবে গড়ে তোলার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন পার্টির গোপন কেন্দ্র। সেদিনকার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অনেকেরই বিপ্লবী চরিত্র যাচাই হয়েছিল।

"নকশালবাড়ি সহায়ক সমিতির অন্যতম নেতা হলেন পরিমল দাশগুপ্ত। সেদিন তাঁর ভূমিকা কী ছিল? সংশোধনবাদীদের বিরুদ্ধে গোপন পার্টি কেন্দ্রের নেতৃত্বে পরিচালিত সংগ্রামে কিন্তু তিনি যোগদান করেন নি। তখন থেকেই তিনি তাঁর পৃথক রূপ বজায় রাখছিলেন। গোপন পার্টি কেন্দ্র থেকে তখন রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে পৃথ্বীরাজের নামে এক দলিল প্রকাশিত হয়েছিল। পরিমল-বাবুরা বের করেছিলেন কৌটিল্যের নামে এক পৃথক দলিল। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে পরিমলবাবুদের ভূমিকা কি ছিল? পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন পরিমলবাবু। তখন ঐ ইউনিয়নের পক্ষ থেকে জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে শ্রমিকদের মুক্তহস্তে অর্থ দান করার জন্য যে ইস্তাহার প্রকাশিত হয় তাতেই পরিমলবাবুর গ্রুপের সুবিধাবাদী রাজনীতির স্বরূপ উদ্ঘাটিত। এই ইস্তাহারে বলা হয়েছে: 'চীনের ভারত আক্রমণের ফলে দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। এ হানাদারীর মোকাবিলা করিবার জন্য অর্থ সাহায্যের আবেদন জানাইয়াছেন ভারত সরকার। দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসাবে বোর্ডের প্রতিটি কর্মীর মহান কর্তব্য সেই আবেদনে সাড়া দেওয়া এবং মুক্ত হস্তে সাহায্য প্রদান।' শুধু প্রতিরক্ষা তহবিলে মুক্ত হস্তে সাহায্যের আবেদনই নয়, এই ইস্তাহারে আরও বলা হয়েছে: 'একই সঙ্গে ইউনিয়ন সমস্ত

ডিভিশনাল কমিটির ও স্টেশন সমূহের সভ্যগণকে আপৎকালীন অবস্থা উপযোগী প্রচার দ্বারা কর্মীগণকে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার উপযোগী মানসিক প্রস্তুতি ও দায়িত্বসচেতন করিবার নির্দেশ দিতেছে।' এই ইস্তাহারে প্রথম স্বাক্ষরকারী কামাখ্যা প্রসাদ দত্ত এখন নকশালবাড়ি কৃষক সংগ্রাম সহায়ক কমিটির সদস্য। আরও লক্ষ্য করবার বিষয় যে, পরিমলবাবু ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে এই ইস্তাহারের কোন প্রতিবাদ করেন নি।

"সুশীতল রায় চৌধুরী, সরোজ দত্ত, চারু মজুমদার এখন হটকারী গ্রুপের নেতা হিসাবে পরিচিত। তাঁদের এই ঝোঁক ১৯৬৩ সালেই দমদম জেলে প্রকাশ পায়। আমরা গ্রেপ্তার হয়েছিলাম ১৯৬২ সালের ২১শে নভেম্বর। ১৯৬৩ সালের মে মাস পর্যন্ত জেলে আমাদের মধ্যে বিশেষ কোন মতপার্থক্য ছিল না। মে মাসের পরে মতপার্থক্য দেখা দিল কলম্বো প্রস্তাব ও পারমানবিক অস্ত্র পরীক্ষা নিষিদ্ধ করার চুক্তি সম্পর্কে এবং বাইরের গোপন কেন্দ্রের পৃথ্বীরাজের দলিল সম্পর্কে। এই মতপার্থক্য এত তীব্র হয়ে উঠলো যে তখন জেল কমিটি ভেঙে দিতে হল এবং দু'টি গ্রুপ গঠিত হল—একটিকে বলা হত জ্যোতির গ্রুপ আর একটিকে বলা হত প্রমোদের গ্রুপ।

"প্রমোদের গ্রুপে যাঁরা ছিলেন তাঁদের সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমত ছিল যে, জ্যোতির গ্রুপ সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী হবে যে রাজনীতি ক্ষেত্রে কোন রকম আপোষ না করে সাংগঠনিক ক্ষেত্রে আমরা ঐ গ্রুপের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হবো ডাঙ্গেপন্থীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য। কিন্তু সুশীতলবাবু, সরোজবাবু ও চারুবাবুর অভিমত ছিল যে জ্যোতিবাবু আর তার গ্রুপ যত তাড়াতাড়ি ভবানী সেনের গ্রুপের সঙ্গে যোগ দেয় ততই মঙ্গল। কিন্তু সে সময় কানু সান্যাল ও সৌরীন বোস এই মতের সমর্থক ছিলেন না।

"বাইরে আসার পর অর্থাৎ ১৯৬৪ সালের প্রথম দিকে এই দুই গ্রুপের অস্তিত্ব বজায় থাকে। জানুয়ারীর মধ্যভাগে আমাদের কেন্দ্রীয় নেতাদের প্রচেষ্টায় এই দুই গ্রুপের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের কাজ বেশ কিছুটা অগ্রসর হয়—স্থির হয় যে ডাঙ্গেপন্থীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য কর্মসূচীর ভিত্তিতে আমরা ঐক্যবদ্ধ হবার চেষ্টা করবো। কিন্তু রাজ্যসভায় ভূপেশ গুপ্তর নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এই দুই গ্রুপের মধ্যে তিক্ততা বৃদ্ধি পায়—ভূপেশ গুপ্তকে পার্টির প্রার্থী মনোনয়ন করার পক্ষে জ্যোতি বসুর প্রস্তাব ডাঙ্গেপন্থীদের সমর্থনে গৃহীত হয়। ফলে পার্টি

সদস্যদের মধ্যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দেয়। কিন্তু জাতীয় পরিষদের ৩২ জন সদস্যের বিবৃতি প্রকাশিত হবার পর অবস্থা ভালোর দিকে যেতে থাকে। সে সময়ে নয়াদিল্লীতে কমরেড সুন্দরাইয়ার সাহায্যে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, এই ৩২ জনের বিবৃতির ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গে আমরা অর্থাৎ দুটি গ্রুপ একত্রে কাজ করবো। কমরেড সুন্দরাইয়া আরও প্রস্তাব করেন যে 'দেশহিতৈষী' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীতে জ্যোতির গ্রুপ থেকে দু'জন কমরেড নেওয়া হোক। আমরা এ প্রস্তাবে সম্মত হই। কলকাতায় ফিরে এসে কমরেডদের আমি যখন প্রস্তাব ব্যাখ্যা করি তখন সুশীতল রায়চৌধুরী, সরোজ দত্ত ও নিরঞ্জন বসু এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। অবশ্য এ প্রস্তাব কার্যকরী করার প্রচেষ্টা হয়নি, কেননা জ্যোতির গ্রুপ এ ব্যাপারে কোন চাপ দেয়নি।

"খসড়া কর্মসূচী আলোচনার সময়ই বিভিন্ন রাজনৈতিক ঝোঁকের পরিচয় পাওয়া যায়। আলোচনার মাধ্যমে কিছু কিছু ঝোঁকের কমরেড তাঁদের ভুল উপলব্ধি করতে পারেন, কিন্তু কিছু কিছু কমরেড তাঁদের বিশিষ্ট মতই আঁকড়ে ধরে থাকেন।

"আমাদের তখন ধারণা ছিল যে একবার পার্টি কর্মসূচী চূড়ান্ত ভাবে গৃহীত হলে পর এই সব কমরেড পার্টি কর্মের মধ্যে কর্মসূচী মেনে কাজ করবেন।

"পার্টির প্রাদেশিক সম্মেলনে দেখা গেলো যে সুশীতল রায়চৌধুরী, পরিমল দাশগুপ্ত, লতিফ, কানাই (রহমান বলে পরিচিত) উপদল হিসাবে কাজ করতে থাকেন। তাঁরা কর্মসূচীর বিভিন্ন সংশোধনী উত্থাপন করেন, অবশ্য তাঁরা দু'টির বেশী ভোট পাননি। তাঁরা ১৯৫১ সালের কর্মসূচীকে সমর্থন করলেন। বিশেষ জোর দিয়ে বললেন যে ভারত একটি আধা উপনিবেশ, ভারতের বৈদেশিক নীতি সাম্রাজ্যবাদের হুকুমে পরিচালিত।

"এই সম্মেলনেই 'দেশহিতৈষী' সাপ্তাহিক পত্রিকাকে পার্টির মুখপত্র হিসাবে ঘোষণা করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। সুশীতলবাবু, সরোজ দত্ত, নিরঞ্জন বসু এবং আরো কয়েকজনের এ প্রস্তাব মনঃপূত হয়নি। যাতে 'দেশহিতৈষী' মারফত নিজেদের চিন্তাধারা প্রচার করা যায় তার জন্য তাঁরা 'দেশহিতৈষী'কে পার্টির কর্তৃত্বের বাইরে রাখার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করলেন। কিন্তু যখন তাঁরা দেখলেন যে তাঁদের প্রকাশ্য প্রচেষ্টা একটার পর একটা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে তখন তাঁরা কৌশল পরিবর্তন করে গোপনে গ্রুপ সংগঠিত করার পন্থার উপরই বিশেষ জোর দিলেন।

উপদলীয় চক্রের যারা উপাসক তারা দেশে দেশে কমিউনিষ্ট পার্টির অভ্যন্তরে এই পন্থাই গ্রহণ করে থাকে।

"পার্টির খসড়া কর্মসূচীর আলোচনার সময়ই দেখা গিয়েছিল যে বিভিন্ন ঝোঁকের লোকেরা বিভিন্ন গ্রুপকে কেন্দ্র করেই জোট বাঁধছে। পার্টি কংগ্রেসের অব্যবহিত পরেই এ রকম একটি গ্রুপ নিজের নামকরণ করল 'বিপ্লবী পরিষদ' বলে। পরিমল দাশগুপ্ত, লতিফ, কানাই, সুভাষ বোস, আজিজুল ও শৈবাল মিত্র প্রমুখ সদস্যরা এই গ্রুপের সঙ্গে ছিলেন। সুশীতলবাবু তাঁর নিজের গ্রুপই অটুট রাখলেন। সুশীতলবাবুর গ্রুপের মধ্যে দু'টি নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—একটি হ'ল সুধীর ভট্টাচার্য, অপরটি হল অমূল্য সেন। সুধীর ভট্টাচার্যের একটি পার্টি রেকর্ড আছে—কীর্তির নয়, কুকীর্তির। পার্টি তহবিলের মোটা টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগে তিনি ১৯৫১ সালে পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হন। আর অমূল্য সেন তো কলকাতা জেলা সম্মেলনে ১৯৫১ সালের কর্মসূচীর সমর্থনে জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন এবং পার্টির খসড়া কর্মসূচীকে সংশোধনবাদী দলিল বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। পার্টি কংগ্রেসে সুশীতলবাবুর প্রস্তাব পরাস্ত হবার পর তাঁর গ্রুপের এই দুই ব্যক্তি নিজেদের মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে বের করলেন 'চিন্তা' নামে একটি গোপন পত্রিকা। এর দুটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। 'চিন্তা'য় পার্টির কর্মসূচীকেই চ্যালেঞ্জ করা হয় এবং একে সংশোধনবাদী কর্মসূচী বলে অভিহিত করা হয়।

"অন্যদিকে পার্টি কংগ্রেসের ঠিক পরেই বিপ্লবী পরিষদের পার্টি-বিরোধী কার্যকলাপ সুস্পষ্ট রূপ নিতে আরম্ভ করে। ১৯৫৪ সালের ৫-৮ ডিসেম্বরের রাজ্য কমিটির সভায় এদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে তদন্ত করার জন্য যখন একটি কমিশন গঠিত হয়, তখন সুশীতলবাবু এর বিরোধিতা করেন। তিনি সেদিন এ কথাই ঘোষণা করেছিলেন যে, পার্টি সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার পরিবর্তে সর্বত্র কেবল পার্টি বিরোধী ব্যক্তি খুঁজে বেড়াচ্ছে এবং এ ভাবে পার্টি সদস্যদের জঙ্গী মনোভাবকে ভোঁতা করে দিচ্ছে। সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হ'ল সপ্তম পার্টি কংগ্রেস। সেই কংগ্রেসের পরই সুশীতলবাবুর উক্তি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। যেহেতু সুশীতলবাবুদের কর্মসূচী বিরোধী প্রস্তাব পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত হয় নি, সেহেতু সুশীতলবাবু আবিষ্কার করে ফেললেন যে পার্টি সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে না, পার্টি কর্মীদের জঙ্গী মনোভাবকে ভোঁতা করে দিচ্ছে।

"সুশীতলবাবুদের পরবর্তীকালের কাজের মধ্যে এই অভিযোগই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সেদিন সুশীতলবাবু পার্টি সদস্যদের জঙ্গী মনোভাবের দোহাই দিয়ে যে জিনিষটা আড়াল করে রাখার চেষ্টা করেছিলেন সেটি হল: পার্টির কর্মসূচীর বিরুদ্ধে, পার্টি নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অধিকারের দাবী। এবং এই দাবী আদায়ের জন্য তাঁরা পার্টির মধ্যেই গ্রুপ সৃষ্টি করেছিলেন এবং সেই গ্রুপের কাজ ছিল সম্পূর্ণভাবে পার্টি কর্মসূচী বিরোধী, পার্টির রণকৌশলগত লাইন বিরোধী। তা তাঁদের পরবর্তীকালের কাজের ধারায়ই সুপ্রমাণিত হয়েছে।

"বিপ্লবী পরিষদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার জন্য যে কমিশন গঠিত হয়েছিল, সেই কমিশনের যে দু'জন সদস্য বিপ্লবী পরিষদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে সব চেয়ে বেশী ওয়াকিবহাল ছিলেন তাঁরা দু'জনই কমিশন গঠিত হবার পর তিনদিনের মধ্যে ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার হয়ে যান। স্বভাবতঃ এটা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার।

"এ প্রসঙ্গে মার্ক্‌স্‌-এঙ্গেলস্‌ ইনস্টিটিউটের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। মার্ক্‌স্‌বাদ-লেনিনবাদের শিক্ষা বিস্তারের জন্য এই প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়েছিল ১৯৬৪ সালের ২২শে এপ্রিল তারিখে লেনিনের জন্মদিবসে। এর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল সুশীতল রায়চৌধুরীর উপর।

"১৯৬৪ সালের পার্টি কংগ্রেসের পূর্বাহ্নে বাংলাদেশের নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয় ১৯৬৪ সালের ৩০শে ডিসেম্বর এবং তার পরের কয়েকদিনে।

"বাইরে তখন 'চিন্তা'কে কেন্দ্র করে যে গ্রুপ গড়ে উঠেছিল সেই গ্রুপ আর বিপ্রবী পরিষদ পুস্তিকা, ইস্তাহার প্রকাশ করে পার্টির কর্মসূচীর বিরোধিতা করতে থাকে। শিলিগুড়িতে এই সময় চারু মজুমদার বেশ সক্রিয় হয়ে ওঠেন—সাইক্লো-স্টাইল ইস্তাহার প্রকাশ করে তিনি সশস্ত্র সংগ্রামের ডাক দিতে থাকেন। তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নন্দা আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার সময় এই সাইক্লো ইস্তাহারের উল্লেখ করেছিলেন।

"এই সময়েই মার্ক্‌স্‌-এঙ্গেলস্‌ ইনস্টিটিউটকে কেন্দ্র করে যে চক্রটি গড়ে ওঠে তারা নিজেদের বুলেটিন প্রকাশ করতে আরম্ভ করে।

"১৯৬৬ সালের মে মাসে জেল থেকে যখন সবাই মুক্ত হয়ে আসে, তখন বামপন্থী সুবিধাবাদীরা তাদের বিভিন্ন গ্রুপের কাজ সুসংবদ্ধ ও সুনিয়ন্ত্রিত করার জন্য সচেষ্ট

হয়ে ওঠে। পার্টির অভ্যন্তরে যাতে নিজেদের শক্তিকে সুসংগঠিত করা যায় তার জন্য তাঁরা আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকেন। অর্থাৎ এতদিন যেটা ছিল ঝোঁক তখন সেটা পরিণত হল চক্রে, উপদলে। তারা প্রথমে ব্যবহার করতে আরম্ভ করে মার্ক্‌স্‌-এঙ্গেলস্‌ ইনস্টিটিউটকে—তারা তখন যে সব বুলেটিন বের করেছিল তার মধ্যে 'অনশনের দর্শন' শীর্ষক বুলেটিনেই তাদের পথের ধারা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই বুলেটিনে লেখা হল, 'জনগণের জন্য আর কতকাল অপেক্ষা করা যায়? জনগণ তো কোন কিছু নির্ধারণ করে না, দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ মুষ্টিমেয় অল্প কয়েকজনই সব কিছু নির্ধারণ করে।'

"নির্বাচনে পার্টি কি লাইন গ্রহণ করবে, কাদের সঙ্গে সংযুক্ত ফ্রন্ট করা হবে —এ বিষয়ে পার্টির ঊর্ধ্বতন কমিটির আলাপ আলোচনার পূর্বেই এদেরই একটি অংশ পুস্তিকা মারফত এ সম্বন্ধে লাইন দিতে থাকে—সে লাইনের মূলকথা হল: নির্বাচন বয়কট করতে হবে আর যদি নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে হয় তবে একলা চলতে হবে। কোন পার্টির সঙ্গেই মোর্চা গঠন করা চলবে না। এই পুস্তিকার প্রকাশক ছিল 'দেশহিতৈষী'র ডেসপ্যাচ বিভাগের জনৈক কর্মী আর লেখক হিসাবে যাঁর নাম প্রচারিত তিনি মার্কিন সংস্থা 'এম-আর-এ'-র লোক। ঐ ব্যক্তি দিতেন অর্থ।

"পার্টির মধ্যে এই সংকীর্ণতাবাদী ঝোঁকের অস্তিত্ব ও তার ব্যাপ্তির কথা বিবেচনা করে ১৯৬৬ সালের জুন মাসে রাজ্য কমিটির সভায় স্থির হয় যে, এই ঝোঁকের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ক্যাম্পেন পরিচালনা করতে হবে সাধারণ সভার মাধ্যমে আর দেশহিতৈষী পত্রিকার মাধ্যমে। সেই সভায় এটাও স্থির হয় যে যারা পার্টি কর্ম মেনে চলবে তাদের নিজেদের ভুল কাটিয়ে ওঠার সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে। এমন কি পার্টির কর্মসূচী সম্বন্ধেও তারা নিজেদের অভিমত নিজেদের ইউনিটে ব্যক্ত করতে পারবে, তবে প্রকাশ্যে নয়। এখানেও সুশীতল-বাবু এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন এবং বিপ্লবী পরিষদের কার্যকলাপ তদন্তের যে যুক্তি তিনি দিয়েছিলেন, এখানেও সেই যুক্তি দিলেন। বললেন: 'সংশোধন-বাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পরিবর্তে পার্টি এখন সভ্যদের জঙ্গী মনোভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে।'

"রাজ্য কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দেশহিতৈষী পত্রিকায় যখন ধারাবাহিকভাবে 'সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও সংকীর্ণতাবাদী ঝোঁক' শীর্ষক প্রবন্ধ বের হচ্ছে

থাকে, তখন সেই প্রবন্ধের প্রতিবাদ জানান সুশীতল রায়চৌধুরী, আর, মার্ক্‌স্‌-এঙ্গেল্‌স্‌ ইনস্টিটিউটের অসিত সেন।

"তাঁরা এ কথাও বলেন যে, প্রকাশ্যে দেশহিতৈষীর পাতায় এই প্রবন্ধের সমালোচনা লেখার অধিকার দেওয়া হোক। অর্থাৎ পার্টি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী লিখিত প্রবন্ধের প্রকাশ্য সমালোচনার অধিকারই তাঁরা দাবী করলেন। তাঁদের বলা হ'ল যে তাঁদের বক্তব্য রাজ্যকমিটিকে লিখিতভাবে জানাতে পারেন। কিন্তু তাতে তাঁরা গোপনে গোপনে বিভিন্ন পার্টি বিরোধী গ্রুপগুলিকে নিয়ে গঠন করলেন 'আন্তঃপার্টি সংশোধনবাদ বিরোধী কমিটি'। এই কমিটির বক্তব্য ইস্তাহার, পার্টি চিঠি, পুস্তিকা প্রকাশিত হতে থাকল। সেই ইস্তাহার, পুস্তিকায় নির্বাচনের সময় নির্বাচনে পার্টির অংশগ্রহণের বিরোধিতা করা হল, আর নির্বাচনের পরে মন্ত্রিসভা গঠনের সময় মার্ক্‌স্‌বাদী কমিউনিষ্টদের মন্ত্রিসভায় যোগদানের বিরোধিতা করা হল। সুশীতলবাবু রাজ্যকমিটির সেক্রেটারিয়েটের কাছে মন্ত্রিসভায় যোগদানের বিরোধিতা করে যে নোট দিয়েছিলেন, সেই নোটের ভাষা ও যুক্তির সঙ্গে হুবহু মিল ছিল আন্তঃপার্টি সংশোধনবাদ বিরোধী কমিটির ২নং পার্টির চিঠির। নির্বাচনের সময় তাঁরা 'কমিউন' 'ছাত্রফৌজ', 'সন্ত্রাস', 'দক্ষিণ দেশ' নামে কয়েকখানি পত্রিকাও সাময়িকভাবে বের করেছিলেন। এগুলির মূল বক্তব্য ছিল, সশস্ত্র সংগ্রামই একমাত্র পথ, পার্লামেন্টে অংশগ্রহণ করা জনগণের সংগ্রামের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা।

"অন্যদিকে শিলিগুড়ি অঞ্চলে চারু মজুমদারের গ্রুপ তাদের হটকারী লাইন সুপরিকল্পিত ভাবেই চালিয়ে যেতে থাকে। তারা প্রথমে বলতো যে, তারা পার্টি কর্মসূচী মানে তবে পার্টি কর্মসূচী সম্পর্কে কেন্দ্রীয় কমিটির ব্যাখ্যা মানে না। তবে ১৯৬৬ সালের জুলাই মাসে পার্টি নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনায় তারা এ বিষয়ে সম্মত হয়েছিল যে তারা পার্টি সিদ্ধান্ত মেনে চলবে এবং তাদের মতপার্থক্য তারা প্রকাশ্যে ব্যক্ত করবেনা। কিন্তু এই আলোচনার ঠিক পরেই ৩০শে আগষ্ট তারিখে তারা ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি (মাও গ্রুপ)-র নামে 'আপোষহীন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে প্রকৃত বিপ্লবী পার্টি গড়ে তোলা' শিরোনামায় এক ইস্তাহার বিলি করল। এই ইস্তাহারে তারা ঘোষণা করল যে, সহকর্মী তো দূরের কথা, বর্তমান পার্টিনেতৃত্ব তাদের মিত্রও নয়। তারা লাগাতার ধর্মঘটকে পেটিবুর্জোয়া হটকারী শ্লোগান বলে অভিহিত করে তার বিরোধিতা করল। পার্টি কর্ম ভাঙার জন্য পার্টি সভ্যদের কাছে আহ্বান জানাল এবং ঘোষণা করল যে পার্টি কর্ম ভেঙেই

প্রকৃত বিপ্লবী পার্টি গড়ে তোলা যেতে পারে। তারা বলল যে পার্টি কর্ম মেনে চলা হচ্ছে সংশোধনবাদীদের সঙ্গে সহযোগিতা করা। তারা ৬ মাসের মধ্যে গেরিলা যুদ্ধের আহ্বান জানালো, আহ্বান জানালো মুক্ত অঞ্চল সৃষ্টি করার। সাধারণ নির্বাচনকে তারা বিরাট ধাপ্পাবাজি বলে অভিহিত করল। যদিও তারা শিলিগুড়ি ও ফাঁসিদেওয়া কেন্দ্রে নিজেদের প্রার্থী দিল। আর কলকাতা ও শিল্পাঞ্চলে তাদের সমগোত্রীয়রা চণ্ডীতলা কেন্দ্রে পার্টির প্রার্থীর বিরুদ্ধে নিজেদের প্রার্থী লতিফকে দাঁড় করাল।

"যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হবার পর এদের কার্যকলাপ প্রকাশ্য রূপ পরিগ্রহ করল। নকশালবাড়ির ঘটনা, নকশালবাড়ি-সহায়ক সমিতি নামে নিজেদের প্রকাশ্য প্লাটফর্ম গঠন, দেশহিতৈষী দখলের চক্রান্ত এবং সে চক্রান্ত ব্যর্থ হয়ে যাওয়ায় 'দেশব্রতী'কে নিজেদের সাপ্তাহিক মুখপত্র হিসাবে প্রকাশ করা প্রভৃতি সেই প্রকাশ্য রূপেরই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

"এই হটকারী গ্রুপদের মূল বক্তব্য হল যে ভারতে এখন বিপ্লবী পরিস্থিতি বিরাজ করছে। তাই এক্ষুণি সশস্ত্র সংগ্রামের ডাক দিতে হবে। কৃষক এলাকায় মুক্ত অঞ্চল সৃষ্টি করতে হবে। শিলিগুড়ি গ্রুপের একখানা ইস্তাহারে (৯ই এপ্রিল, ১৯৬৫) বলা হয়েছে, 'ভারতে যে স্বতঃস্ফূর্ত বিপ্লবী বিস্ফোরণ ঘটছে তার অর্থ কি ?······দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে আসা প্রয়োজন এবং জনসাধারণকে বেশ জোরের সঙ্গেই বলা প্রয়োজন যে, এলাকাগত ভাবে ক্ষমতা দখল করাই আমাদের পথ।··· কৃষি বিপ্লবের মাধ্যমে মুক্ত কৃষি এলাকা গড়ে তুলে আসুন আমরা নতুন জনগণতান্ত্রিক ভারত গড়ার ভিত্তি স্থাপন করি।'

"এ কথাগুলি তাঁরা বলেছিলেন ১৯৬৫ সালের এপ্রিল মাসে। তাহলে দু'বছর আগেই দেশে বিপ্লবী পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। এবং দু'বছরে তাদের মতে বিপ্লবী পরিস্থিতি আরও তীব্র হয়েছে, তাই তারা ১৯৬০ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর 'নির্বাচনের শিক্ষা ও প্রকৃত মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদীদের কর্তব্য' শীর্ষক এক ইস্তাহারে ঘোষণা করল, 'শ্রমিক শ্রেণীর এবং অন্যান্য বিপ্লবী শ্রেণীগুলির প্রধান কর্তব্য হচ্ছে কৃষকদের গ্রামগুলিকে মুক্ত এলাকা গড়ে তোলা।

"কিন্তু বিপ্লবী পরিস্থিতি বলতে কী বোঝায় এবং বিপ্লবী পরিস্থিতি থাকলেই কি বিপ্লব হয় ? লেনিনের কথায় : একজন মার্ক্সবাদীর কোন সন্দেহই থাকতে পারে না যে, বিপ্লবী অবস্থা ছাড়া বিপ্লব অসম্ভব; উপরন্তু সমস্ত অবস্থাই বিপ্লব

সংঘটিত করে না। সাধারণভাবে বলতে গেলে বিপ্লবী অবস্থার লক্ষণ কী কী? আমরা যদি নিম্নে প্রদত্ত তিনটি প্রধান লক্ষণকে দেখাই তাহলে আমরা নিশ্চয়ই ভুল করবো না। (১) যখন শাসক শ্রেণীর পক্ষে তাদের শাসনকে অপরিবর্তিত অবস্থায় রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে। যখন 'উচ্চশ্রেণীর' পক্ষে তাদের শাসনকে অপরিবর্তিত অবস্থায় রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে। 'উচ্চ শ্রেণীর' মধ্যে একক ভাবে বা অন্যভাবে সংকট দেখা দেয়। যখন শাসক শ্রেণীর মধ্যে এমন সংকট দেখা দেয়, যে সংকট ফাটলের সৃষ্টি করে, যার ভিতর দিয়ে নিপীড়িত শ্রেণীর অসন্তোষ ও ঘৃণা মিশ্রিত ক্রোধ ফেটে পড়ে। সাধারণতঃ বিপ্লব সংঘটিত হবার পক্ষে 'নিচু শ্রেণীগুলির' পুরাণো পন্থায় বাঁচার 'অনিচ্ছা'ই যথেষ্ট নয়, 'উঁচু শ্রেণী'কেও পুরাণো ধাঁচে বাঁচতে অক্ষম হওয়া চাই; (২) যখন নিপীড়িত শ্রেণীর অভাব ও কষ্টবোধ সাধারণের চেয়ে তীব্র হয়ে উঠবে; (৩) যখন উল্লিখিত কারণগুলির পরিণাম হিসাবে জনগণের কর্মতৎপরতা বেশ কিছু বাড়বে—যারা 'শান্তির' সময়ে শান্ত ভাবে নিজেদের লুণ্ঠিত হতে দেয় কিন্তু প্রচণ্ড আলোড়নের সময়ে সংকটকালীন অবস্থার চাপে এবং 'উচ্চশ্রেণীর' চাপেও স্বাধীন ঐতিহাসিক সংগ্রামের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

"বাস্তব পরিবর্তন শুধুমাত্র বিভিন্ন দল বা উপদলের ইচ্ছা-নিরপেক্ষ তাই নয়, এগুলি বিভিন্ন শ্রেণীর ইচ্ছা-নিরপেক্ষ—এই সব বাস্তব পরিবর্তন ছাড়া সাধারণ নিয়ম হিসাবে বিপ্লব অসম্ভব। এই সব বাস্তব পরিবর্তনের সমষ্টিকে বিপ্লবী অবস্থা বলা হয়। এই ধরনের অবস্থা ১৯০৫ সালে রাশিয়াতে এবং সমস্ত বিপ্লবী যুগে পশ্চিমেও ছিল; এই অবস্থা বিগত শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে জার্মানীতে ছিল এবং ১৮৫৯-৬১ ও ১৮৭৯-৮০ সালে ছিল রাশিয়াতে, যদিও এই সব ক্ষেত্রে কোন বিপ্লব হয়নি। কেন? কারণ সব বিপ্লবী অবস্থাতে বিপ্লব হয় না; বিপ্লব একমাত্র সেই অবস্থাতেই হয় যখন উল্লিখিত বাস্তব বা বিষয়গত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে একটি বিষয়ীগত (সাবজেকটিভ) পরিবর্তন যুক্ত হয়। সেই সঙ্গে চাই বৈপ্লবিক শ্রেণীর পক্ষে পুরাণো সরকারকে ভাঙবার (বা স্থানচ্যুত করবার) মতো যথেষ্ট শক্তিশালী বৈপ্লবিক গণসংগ্রাম পরিচালনা করার সক্ষমতা, কেননা আপনা থেকে কখনো সরকারের 'পতন হয় না' তার 'পতন ঘটাতে হয়।' (দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পতন)।

"আমাদের বামপন্থী সুবিধাবাদীরা যে লেনিনের এই বিপ্লবী থিওরী মানতে রাজী নয়, তা' তাদের গণসংগ্রাম গড়ে তুলতে অস্বীকৃত সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়া সংগ্রামের

অন্যান্য রূপকে বাতিল করে দেবার মনোবৃত্তিতেই পরিস্ফুট। যে বিষয়ীগত (সাবজেকটিভ) কারণে পরিবর্তনের কথা লেনিন বলেছেন তার জন্য তাঁরা কাজ করতে নারাজ, তারা সর্বক্ষেত্রে সহজ বাংলায় বাঁধাধরা ছককাটা ফরমুলা প্রয়োগ করে সব জটিল সমস্যার রাতারাতি সমাধান করতে চায়, তাদের কাছে 'পাহাড় পর্বতই হচ্ছে এক একটি পদক্ষেপ' (ডিমট্রভ)।

"এই বামপন্থী সুবিধাবাদীরা কিছুতেই বুঝবে না, জনগণের সংগ্রামে কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্ব আপনা থেকে প্রতিষ্ঠিত হয় না। কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হলে শুধু সংগ্রামে বড় বড় উন্মত্ত মন্ত্র আওড়ালেই চলবে না—এর জন্য প্রয়োজন হচ্ছে সঠিক কর্মনীতির ভিত্তিতে জনগণের মধ্যে দৈনন্দিন কাজের দ্বারা জনগণের সংগ্রাম পরিচালনার দ্বারা তাদের আস্থা অর্জন করা। এ কাজ সম্ভব হতে পারে যদি আমরা কমিউনিষ্টরা আমাদের রাজনৈতিক কার্যকলাপে জনগণের শ্রেণী চেতনার বাস্তব মান গভীরভাবে বিচার করি। বিচার করি তাদের বিপ্লবী মনোভাবের ডিগ্রী। আর তাদের সঙ্গে যদি, আমাদের মনোগত বাসনার ভিত্তিতে নয়, ঘটনার বাস্তব ভিত্তিতে আমরা বাস্তব পরিস্থিতির মূল্যায়ন করি। এই ভিত্তিতেই আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ভারতের বর্তমান 'নতুন পরিস্থিতি'-র মূল্যায়ন করে···'পার্টির কর্তব্য' নির্দেশ করেছেন।

"বামপন্থী সুবিধাবাদীদের কাছে মূল্যায়নের কোন মূল্য নেই। কারণ তারা যখন আমাদের পার্টির কর্মসূচীকেই চ্যালেঞ্জ করে তখন তারা রণকৌশলগত লাইনকেও যে চ্যালেঞ্জ করবে তা তো অবধারিত।

"তবে প্রতি দেশের কমিউনিষ্ট আন্দোলনের অগ্রগতির ফলে দক্ষিণপন্থী এবং বামপন্থী, উভয় ধরনের সুবিধাবাদীই দেখা দেয়। স্তালিনের কথায়ঃ 'এ কথা ভুললে চলবে না যে, দক্ষিণপন্থীরা ও অতিবামপন্থীরা প্রকৃতপক্ষে যমজ এবং উভয়েই সুবিধাবাদী পথ গ্রহণ করে। কিন্তু উভয়ের মধ্যে তফাৎ হচ্ছে এই যে, দক্ষিণপন্থীরা সর্বদা তাদের সুবিধাবাদকে লুকিয়ে রাখে না। কুৎসারটনাকারীরা এবং অর্বাচীনেরা আমাদের সম্বন্ধে যাই বলুক না কেন তাদের সেই কথা দিয়ে আমাদের কর্মনীতি নির্ধারিত হতে কিছুতেই আমরা দিতে পারি না। আমাদের সম্বন্ধে অলস মস্তিষ্কের লোকেরা যা-ই আবিষ্কার করুক না কেন, তার দিকে কোন ভ্রূক্ষেপ না করেই আমরা আমাদের পথে দৃঢ়ভাবে এবং বিশ্বাসের সঙ্গে এগিয়ে যাব" (স্তালিন রচনাবলী—অষ্টম খণ্ড, পৃঃ ৯)।

"দুই ফ্রণ্টের সংশোধনবাদ এবং সংকীর্ণতাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই গভীর আত্মবিশ্বাস নিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে আমাদের পার্টিনির্দেশিত পথেই এগিয়ে যাব। কিন্তু চলার পথে কোন সময়েই আমাদের এ কথা ভুললে চলবে না যে, সংশোধনবাদ এখনো আমাদের প্রধান বিপদ।"

ছেচল্লিশ

পশ্চিমবঙ্গের শাসক ১৪ দলের যুক্তফ্রণ্ট দলগুলির মধ্যে মতাদর্শগত ঐক্য ছিল না। তেমনই বহু বৎসর যাবত বিরোধী দলের সদস্য হিসাবে থাকায় দায়িত্বশীল মন্ত্রী ও যোগ্য প্রশাসক রূপে মন্ত্রীরা অনেকেই তাল মেলাতে পারছিলেন না। যুক্তফ্রণ্টের দলগুলির মধ্যে কিছু দল যেমন ছিলেন মার্ক্সবাদে বিশ্বাসী, কিছু দল ছিল ঘোরতর মার্ক্সবাদ-বিরোধী। কিছু দলের ছিল শ্রমিক-কৃষক-ক্ষেতমজুরদের স্বার্থরক্ষার ঝোঁক, কিছু দলের ছিল ব্যবসায়ী জোতদার প্রভৃতির প্রতি বেশী সহানুভূতি। এই সব বিপরীত মত ও চিন্তার প্রতিফলন অহরহ ঘটতে লাগল। পুলিশ সহ অন্যান্য পদস্থ আমলারা তাঁদের দীর্ঘদিনের অভ্যাস ও রীতি-নীতির পরিবর্তনে অপারগ হয়ে পড়ছিলেন। একদল অফিসার রাতারাতি নিজেদের বামপন্থী প্রতিপন্ন করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলেন। এই সমস্ত অফিসাররাও অনেকে নিজেদের আখের গোছাবার জন্য মন্ত্রীদের কাছে নানারকম ভুল, বিকৃত ও মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করে ভুল বোঝাবুঝি বাড়িয়ে তুলতেন। একজন অফিসার একদা জ্যোতি বসুর কাছে পুলিশের ইনফরমার বা তথ্য সরবরাহকারীর তালিকা পেশ করেছিলেন। সেই তালিকায় জ্যোতিবাবু দেখেছিলেন, অন্য দল তো বটেই, তাঁর দলেরও অনেকের নাম এই তালিকায় আছে। দুই একজন মন্ত্রীর নামও আছে। এই সব অফিসার যুক্তফ্রণ্ট শরিকদলের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল।

১৯৬৭ সালের জুলাই মাসে বামফ্রণ্টের আভ্যন্তরীণ সংকট বেশ জটিল হয়ে উঠল। মন্ত্রিসভার মধ্যে মন কষাকষি, নকশালবাড়িতে উগ্রপন্থীদের কার্যকলাপ, পিকিং রেডিও থেকে নকশালপন্থীদের পক্ষে উন্মাদ প্রচার—সব মিলিয়ে মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায়ের মনকে বেশ বিষিয়ে তুলল। শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী প্রমুখ কংগ্রেস নেতারা অজয় মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং

শ্রী মুখোপাধ্যায়কে কংগ্রেসে ফিরিয়ে নেবার জন্য টোপ ফেলতে থাকেন। এই সময়েই ঝানু আই-সি-এস শ্রীধরমবীর রাজ্যে রাজ্যপাল হয়ে এলেন। যুক্তফ্রন্টের যে আভ্যন্তরীণ বিরোধ ও সংকট সুরু হয়েছিল, তাকে শ্রীধরমবীর অতি কৌশলে যুক্তফ্রন্ট বিরোধী চক্রান্তে পরিণত করার মদত দিতে থাকেন। যুক্তফ্রন্টের খাদ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ নিজের খেয়ালখুশিতে খাদ্যনীতিকে এমন জায়গায় নিয়ে গেলেন যে চালের দাম পাঁচ টাকায় উঠল। এই খাদ্য সংকট সম্পর্কে প্রায় সম্পূর্ণ নির্বিকার থেকেই ডঃ ঘোষ অন্য খেলায় মাথা ঘামাতে লাগলেন। প্রমোদ দাশগুপ্ত এই সমস্ত পরিস্থিতি সম্পর্কে খুবই সচেতন ছিলেন। রাজ্যের যুক্তফ্রন্ট সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল স্বচ্ছ। ডঃ ঘোষ বা অজয় মুখোপাধ্যায় সম্পর্কেও প্রমোদ দাশগুপ্তের কোন মোহ ছিল না। বিভিন্ন 'জেনারেল বডি' মিটিং-এ যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা সম্পর্কে তিনি স্পষ্টই বলতেন যে, এই সরকারের মাধ্যমে চারটি কাজ করা যেতে পারে। সি পি-আই (এম) কেন্দ্রীয় কমিটি যখন বলল 'এই মন্ত্রিসভা আগামী বিপ্লবের ভবিষ্যত নির্ধারণ করবে এবং ক্রমে ক্রমে কেন্দ্রেও যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা হবে', তখন প্রমোদ দাশগুপ্ত কোন বড় কথার মধ্যে না গিয়ে বললেন, এই মন্ত্রিসভার মাধ্যমে চারটি কাজ করার চেষ্টা করতে হবে : (১) গণ-আন্দোলনে পুলিশ না লাগানো—পুলিশকে আটকে রাখতে হবে; (২) গণ-সংগ্রামে সাহায্য করতে হবে; (৩) জনসাধারণকে 'রিলিফ' দিতে হবে এবং (৪) আমলাতান্ত্রিক শাসনযন্ত্রকে শিথিল করে দিতে হবে।

যুক্তফ্রন্ট গঠিত হবার পর রাজ্যের শ্রমিক-কৃষক-সাধারণ মানুষ আশান্বিত হল। নিজের নিজের ক্ষেত্রে সংগ্রাম সুরু করল। এরই একটা বহিঃপ্রকাশ নকশাল-বাড়িতে আগেই ঘটে গিয়েছে! কারখানায় কারখানায় ঘেরাও-এর ঘটনা ঘটতে সুরু করল এবং আরও বেশ কিছু ঘটনা ঘটতে লাগল যেগুলি আপাত-দৃষ্টিতে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির বিঘ্নস্বরূপ প্রতিভাত হতে লাগল।

১৯৬৭ সালের ১১শে জুলাই প্রমোদ দাশগুপ্ত নকশালবাড়ি-আন্দোলন সম্পর্কে স্পষ্ট করেই বললেন যে, এই আন্দোলন জমির লড়াই; উচ্ছেদের বিরুদ্ধে ক্ষুধার্ত চাষীদের লড়াই। দীর্ঘদিনের দুর্দশাগ্রস্ত কৃষক সমাজের সঙ্গত দাবী পূরণ করেই এই সমস্যার সমাধান করতে হ'বে। তিনি একথাও স্পষ্ট করে বললেন যে, নকশালবাড়িতে যে-সমস্ত মারাত্মক পুলিশী জুলুম চলছে, তার ব্যক্তিগত দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্রীর। কিন্তু একই সঙ্গে প্রমোদ দাশগুপ্ত কিছু ব্যক্তিকে হতাশাগ্রস্ত বামপন্থী সুবিধাবাদী বলতে পিছ-পা হননি। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "যুক্তফ্রন্টে

সি পি আই (এম)-এর অবস্থান বিপন্ন করবার জন্য কিছু ব্যক্তি শত্রুকে সাহায্য করছে।" প্রমোদ দাশগুপ্ত স্পষ্টভাবে তখনই বলতে সুরু করেন, "যুক্তফ্রণ্টের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকার ও কায়েমী ষড়যন্ত্র সুরু হয়েছে। নকশালবাড়ি আন্দোলনে যাঁরা ক্ষমতা দখলের কথা বলছেন তাঁরা উগ্রপন্থী হটকারী। কার্যত তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রতিক্রিয়াশীল শত্রুদের সাহায্য করছেন।"

এই সময় গণশক্তি পত্রিকার প্রকাশ সুরু হয়েছে। নতুন সান্ধ্য দৈনিকটিকে স্বয়ম্ভর করে তোলার জন্য প্রমোদ দাশগুপ্ত গভীরভাবে মনোনিবেশ করলেন। চালের দর প্রায় ছ'টাকায় উঠে গেল। দমদমে পুলিশ গুলি চালালো। নিহত হল উমাশঙ্কর পাণ্ডে নামে একজন শ্রমিক। প্রমোদ দাশগুপ্ত প্রকাশ্যেই খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের সমালোচনা করলেন। বেলঘরিয়ায় এক প্রকাশ্য জনসভায় খাদ্যমন্ত্রীর ভূমিকার সমালোচনা করে তিনি বললেন, "ডঃ ঘোষ পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে না পারলে মন্ত্রিসভা ত্যাগ করুন বা খাদ্যদপ্তর ছেড়ে দিন।"

জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রমোদ দাশগুপ্ত গৌহাটি গেলেন। সেখান থেকে এলেন কুচবিহার। গৌহাটিতে যুক্তফ্রণ্টের আভ্যন্তরীণ সংকট সম্পর্কে বললেন (২রা জুলাই, ১৯৬৭), পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্টকে হেয় করার জন্য, রাষ্ট্রপতি শাসন প্রবর্তনের জন্য এক গভীর চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর। সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীকে তারা ব্যবহার করছে। এদেরই কিছু লোক ন্যায়সঙ্গত জমির লড়াইয়ের মধ্যে প্রবেশ করছে এবং তাদের বিপথে চালিত করার চেষ্টা করছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্টকে ভেঙ্গে দেবার চেষ্টা করছে। এর বিরুদ্ধে সংগ্রামের একমাত্র পথ হল নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের রায় নেওয়া। তিনি নকশালবাড়ি প্রসঙ্গে বলেন যে, জমির ক্ষুধা থেকেই আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছে। প্রত্যেক মার্ক্সবাদী জানেন যে কৃষকদের প্রকৃত সমস্যার সমাধান বর্তমান সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে সম্ভব নয়। কিছু কিছু পার্টি সদস্য পার্টির কর্মসূচী ও কৌশল ত্যাগ করে হটকারী পথ গ্রহণ করেছে। এই সব সদস্যদের পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হবে।

প্রমোদ দাশগুপ্ত রাজ্যের কয়েকটি জেলা সফর করে কলকাতায় ফিরে এলেন। কলকাতায় সি-পি আই (এম) রাজ্য কমিটির বৈঠক হল। এই বৈঠকের পর প্রথম জনসভা করতে গেলেন কামারহাটিতে। ৮ই আগস্ট কামারহাটি টাউন হলে অনুষ্ঠিত এক সভায় তিনি বললেন: রাজ্যে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার স্বরাষ্ট্র ও

খাদ্যদপ্তরের কাজ দেখলে মনেই হয় না যে এই দু'টি দপ্তরের কাজের ধারাবাহিকতার কোন পরিবর্তন ঘটেছে। তিনি খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের উক্তি উল্লেখ করে বলেন যে ডঃ ঘোষ বলেছেন যে জোতদারদের গায়ে হাত পড়লে দেশে গণযুদ্ধ হবে। কিন্তু সাধারণ মানুষ কি না খেয়ে মরবেন? প্রমোদ দাশগুপ্ত কামারহাটি জনসভাতেই প্রথম মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায়ের কিছু উক্তিরও সমালোচনা করেন। তিনি বলেন জোতদার-মজুতদার চক্র ধ্বংস না হলে রাজ্যের মানুষের মুক্তি নেই।

৪ঠা আগস্ট সি-পি-আই (এম) রাজ্য কমিটির বৈঠক হল। এই বৈঠকে প্রথম অন্তর্বর্তী নির্বাচনের দাবী জানানো হল। প্রমোদ দাশগুপ্ত বললেন: যুক্তফ্রণ্টের স্বরাষ্ট্র ও খাদ্যদপ্তর ফ্রণ্টের ১৮ দফা কর্মসূচী পালন করছে না। এই দপ্তর রাজ্যে সংকটজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে।

১০ই আগস্ট মহাকরণে বেশ কিছু কর্মচারীর হাতে মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায় নিগৃহীত হলেন। ১৪ই আগস্ট কলকাতার একটি হোটেলের 'বয়'-রা মুখ্যমন্ত্রীকে খাদ্য পরিবেশনে অস্বীকার করল। মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায় যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভা সম্পর্কে বেশ হতাশ হয়ে পড়লেন।

সেপ্টেম্বর মাসে যুক্তফ্রণ্ট নিয়ে চক্রান্ত দানা বেঁধে উঠল। আসরে নামলেন প্রফুল্লচন্দ্র সেন ও রাজ্যপাল ধরমবীর। প্রফুল্লচন্দ্র সেন ও অজয় মুখার্জীর সঙ্গে যোগাযোগ হল। ১৬ই সেপ্টেম্বর রাজ্যপাল ধরমবীর প্রফুল্লচন্দ্র সেন এবং অজয় মুখোপাধ্যায়কে এক নৈশ ভোজে আপ্যায়িত করে রাজ্যে একটা অ-কম্যুনিষ্ট মন্ত্রিসভা গঠনের ভিত্তি রচনা করিয়ে নিলেন। ডঃ ঘোষও বসেছিলেন না। তিনি দিল্লী গিয়ে সুচেতা কৃপালনীর বাড়িতে হুমায়ুন কবীর ও সুরেন্দ্রমোহন ঘোষের সঙ্গে এক বৈঠকে রাজ্যের যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভাকে ভাঙবার শলা-পরামর্শ করলেন।

প্রফুল্লচন্দ্র সেন এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চাইলেন। ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে অতুল্য ঘোষের সম্পর্কের কথা অজানা ছিল না। শ্রীমতী গান্ধী অজয় মুখার্জীর সর্ত অনুযায়ী রাজ্য কংগ্রেস থেকে অতুল্য ঘোষ পন্থীদের হটিয়ে এ্যাড হক কমিটি গঠনে উৎসাহী হয়ে উঠলেন। ঘোরতর অতুল্য ঘোষ বিরোধী গুলজারিলাল নন্দাকে তিনি পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের সংস্কারের জন্য কলকাতায় পাঠালেন। শ্রী নন্দার কলকাতায় আসবার খবর পেয়ে প্রফুল্লচন্দ্র সেন একদিকে কংগ্রেস

সংগঠনের উপর তাঁর নিজস্ব প্রভাব দেখাবার জন্য, অন্যদিকে অজয় মুখার্জীকে সাহস যোগাবার জন্য ১৮ই সেপ্টেম্বর 'খাদ্য অভিযান' সংগঠিত করলেন। অতুল্য ঘোষের অনুচরদের অধিকাংশই বোধগম্য কারণেই এই অভিযানে অংশ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকেন।

অতঃপর ২৪শে সেপ্টেম্বর শ্রী নন্দা পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের অ্যাড হক কমিটি গঠনের কথা ঘোষণা করেন। অতুল্য ঘোষ দিল্লী থেকে এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন যে, শ্রী নন্দার কাজ কংগ্রেসের সাংগঠনিক ধারার বিরোধী। কারণ, এই ধরনের এ্যাড হক কমিটি গঠনের ঘোষণার ক্ষমতা একমাত্র ওয়ার্কিং কমিটি-র অথবা কংগ্রেস সভাপতিরই আছে। অন্য কারও নেই।

এদিকে শ্রী নন্দা ও প্রফুল্লচন্দ্র সেনের মধ্যে কথাবার্তার পর স্থির হয় যে, ২রা অক্টোবর গান্ধীজীর জন্মদিনে অজয় মুখার্জী পদত্যাগ করবেন। ইতিমধ্যে শ্রী নন্দা মাদ্রাজে কংগ্রেস সভাপতির সঙ্গে দেখা করে তাঁকে অ্যাড হক কমিটি গঠনের আদেশ জারি করতে রাজী করালেন।

২৫শে সেপ্টেম্বর অজয় মুখার্জী দিল্লী গেলেন। সেখানে প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্যরা তাঁকে এই চক্রান্তের জালে আরও নিবিড় করে জড়িয়ে ফেললেন। ২০শে সেপ্টেম্বর অজয় মুখার্জী কলকাতায় ফিরলেন। সারা সহরে একটা থমথমে ভাব; অজয় মুখার্জী পদত্যাগ করতে চলেছেন—এই গুজব সহরে রটে যায়। কিন্তু কোথায়ও এর সমর্থন পাওয়া যায় না। অজয় মুখার্জী এ সম্বন্ধে হ্যাঁ-না, ভাল-মন্দ কিছুই বলতে রাজী হলেন না।

১৬ই সেপ্টেম্বর রাজ্যপাল ধরমবীর প্রফুল্লচন্দ্র সেন ও অজয় মুখার্জীকে নিয়ে নৈশ ভোজ করলেন। সেই দিনই প্রমোদ দাশগুপ্ত বললেন (অবশ্য এই নৈশভোজের কথা তিনি জানতেন না), শোষক শ্রেণীগুলির মুখ্য রাজনৈতিক দল কংগ্রেস যুক্তফ্রন্টের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা এবং সরকারের খাদ্য ও পুলিশ বিভাগের ব্যর্থতার সুযোগ নিয়ে পশ্চিমবাংলার মানুষকে বিভ্রান্ত করে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চায়; কৃষক ও মেহনতী মানুষের ঐক্যকে দুর্বল করাই শোষক শ্রেণীর প্রধান উদ্দেশ্য। তাই প্রমোদ দাশগুপ্ত স্পষ্টভাষায় প্রতিরোধ গড়ে তুলবার আবেদন জানান।

১৮ই সেপ্টেম্বর কংগ্রেস মিছিল সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে প্রমোদ দাশগুপ্ত গণশক্তির প্রতিনিধিকে বলেন, যে-কোন দলের শান্তিপূর্ণভাবে মিছিল করে

সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করবার অধিকার আছে। তিনি বলেন, বর্তমান সংকটের জন্য মূলতঃ দায়ী মিলমালিক, মজুতদার ও মুনাফাখোর। এদের রাজনৈতিক প্রতিনিধি হল কংগ্রেস। শোষকদের আক্রমণ বেড়েছে, কৃষকদের আন্দোলনও তীব্রতর হয়ে উঠেছে। কংগ্রেস বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে বলতে চায় যে আইন-শৃঙ্খলা ভেঙ্গে গিয়েছে, সুতরাং রাষ্ট্রপতি শাসন কায়েম করতে হবে।

১৯৬৭ সালের ৫ই অক্টোবর প্রমোদ দাশগুপ্ত রুমানিয়া ওয়ার্কার্স পার্টি কংগ্রেসে যোগদানের জন্য আমন্ত্রিত হয়ে ইউরোপ যাত্রা করেন। যাত্রার প্রাক্কালে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন যে, ১৮-দফা কর্মসূচী রূপায়ণ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্ম পদ্ধতির উপর ভিত্তি করেই যুক্তফ্রণ্টের আভ্যন্তরীণ সংকট ফুটে ওঠে। একমাত্র গণসংগ্রাম ও আন্দোলনের মাধ্যমেই সে সংকট কাটিয়ে ওঠা সম্ভব। এক বিবৃতিতে তিনি বলেন : কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য কংগ্রেস ও কায়েমী স্বার্থ যুক্তফ্রণ্ট সরকারের উৎখাতের জন্য গভীর চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে। আর, এই চক্রান্তে যোগ দিয়েছে ফ্রণ্টের অন্তর্ভুক্ত একটি গোষ্ঠী। কায়েমী স্বার্থের চক্রান্তের ফলে যুক্তফ্রণ্টে সংকট একটানা ভাবেই চলেছে। কখনও এই চক্রান্ত চরমে পৌঁছেছে কখনও বা সাময়িকভাবে স্তব্ধ থেকেছে। এই সংকটময় পরিস্থিতিতে আমরা আদৌ বিস্মিত হইনা। নির্বাচনে কংগ্রেসের বিপর্যয়ের পর জনগণের ইচ্ছা অনুযায়ী ১৪ পার্টি নিয়ে আইনসভার নির্বাচিত সদস্যগণ ১৮ দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে সরকার গঠন করেন। এই ১৮ দফা কর্মসূচীর মূল্য কথা ছিল শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত এবং মেহনতী মানুষের গণ-আন্দোলনে সাহায্য করা। এই ১৮ দফা কর্মসূচীর সার্থক রূপায়ণ এবং জনসাধারণের আন্দোলন ও সংগ্রামকে সর্বপ্রকার সাহায্যদানের মাধ্যমেই কংগ্রেস ও কায়েমী স্বার্থযুক্ত দলগুলির চক্রান্ত বানচাল করে যুক্তফ্রণ্ট সরকারকে টিকিয়ে রাখতে হবে। তিনি বলেন : শ্রেণী সংগ্রাম যত তীব্র হচ্ছে, যুক্তফ্রণ্ট সরকারের বিরুদ্ধে চক্রান্তও তত গভীর হচ্ছে। কেন্দ্রের কংগ্রেসী সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের নেতৃত্বে এই চক্রান্ত পরিচালিত। এই চক্রান্তে প্রকাশ্যেই সহযোগিতা করছেন যুক্তফ্রণ্ট সরকারের অন্তর্ভুক্ত কায়েমী স্বার্থের পরিপোষক একটি গোষ্ঠী। এই সংকটের হাত থেকে ত্রাণের একমাত্র রাস্তা—১৮ দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে গণ-আন্দোলন এবং গণ-সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

প্রমোদ দাশগুপ্ত বলেন : যুক্তফ্রণ্টের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত পার্টিকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করতে হ'বে—তাঁরা ১৮ দফা কর্মসূচী কার্যকর করার জন্য প্রস্তুত আছেন

কিনা। প্রমোদ দাশগুপ্ত আরও বলেন: এ কথা সবাইকে বুঝতে হবে যে, কেন্দ্রীয় সরকার, প্রদেশ কংগ্রেস ও কায়েমী স্বার্থের মিলিত চক্রান্ত কম্যুনিষ্ট পার্টি (মার্ক্সিস্ট) ও অন্যান্য সাচ্চা, সংগ্রামী বামপন্থী পার্টিগুলিকে যুক্তফ্রণ্টের অন্যান্য দলগুলি থেকে পৃথক করে আক্রমণ করছে কেন। এই পার্টিগুলি কায়েমী স্বার্থের কাছে নতিস্বীকার না করে শ্রমিক, কৃষক এবং মধ্যবিত্ত মেহনতী মানুষের বাঁচার দাবীর সংগ্রামের সাথী বলেই তাঁদের বিরুদ্ধে এই আক্রমণ। প্রমোদ দাশগুপ্ত ঘোষণা করেন: যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভা থাক আর নাই থাক, কম্যুনিষ্ট পার্টি (মা:) মেহনতী মানুষের সংগ্রামের শরিক হয়ে থাকবে। যুক্তফ্রণ্টের অন্তর্ভুক্ত পার্টিগুলির প্রতি আবেদন জানিয়ে তিনি বলেন: আগামী দিনে বৃহত্তর সংগ্রাম আসছে। ছাঁটাই, বেকারী, কারখানা বন্ধ প্রভৃতির বিরুদ্ধে শ্রমিক সংগ্রাম তীব্রতর ও ব্যাপকতর হতে হবে। কৃষকরা উচ্ছেদের বিরুদ্ধে ফসল রক্ষার আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। সামনে রয়েছে আমন ফসল সংগ্রহ, বণ্টন ও মজুত উদ্ধার অভিযান। এই সমস্ত আন্দোলনকে সমর্থন করুন। কংগ্রেস ও কায়েমী স্বার্থের চক্রান্তকে চূর্ণ করে যুক্তফ্রণ্ট সরকারকে বাঁচিয়ে রাখাই একমাত্র রাস্তা, আর কোন রাস্তা নেই।

'৬৭ সালের ১৮ই অক্টোবর প্রমোদ দাশগুপ্ত বিদেশ যাওয়ার আগে জেলা সম্পাদকদের সঙ্গে যে বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন, সেখানে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বর্তমান গভীর সংকটজনক পরিস্থিতিতে পার্টির বিরুদ্ধে চক্রান্তের মোকাবিলায় সংগঠনকে মজবুত করতে হবে। অর্থ সংগ্রহ করতে হবে। পার্টির কাগজপত্র ও পুস্তিকা প্রচার করতে হবে। প্রত্যেক জেলা কমিটিকে দায়িত্ব দেওয়া হয় প্রতিটি পার্টি কর্মীকে দু'টি কাজে নিয়োগ করতে হবে এবং স্কোয়াড করে তহবিল সংগ্রহ করতে হবে। প্রতিটি কমরেডকে এই কাজে অংশ গ্রহণ করতে হবে।

এদিকে অজয় মুখোপাধ্যায় ২রা অক্টোবর মুখ্যমন্ত্রীত্ব ত্যাগের সিদ্ধান্তে অনড়। অজয় মুখোপাধ্যায়কে দলে পাচ্ছে, যুক্তফ্রণ্ট সরকার ভেঙে যাচ্ছে, এই আনন্দে কংগ্রেস দল বিভোর। কেন্দ্রীয় সরকারের ঘনিষ্ট যোগাযোগে পরিপুষ্ট কংগ্রেসী চক্রান্ত সম্বন্ধে প্রমোদ দাশগুপ্তের একটি উক্তি সেই সময় বিশেষ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। রাজ্য সরকার ভাঙার চক্রান্তে কেন্দ্রীর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াই বি চ্যবন কলকাতায় আসছেন এই সংবাদে প্রমোদ দাশগুপ্ত বলেছিলেন 'চ্যবন কলকাতায়

এলে তাকে গ্রেপ্তার করা উচিত।' এই কথা কাগজে বেরুতেই চারদিকে হৈ-চৈ পড়ে যায়।

অজয় মুখোপাধ্যায়কে ২রা অক্টোবর পদত্যাগ থেকে নিরস্ত করার জন্য শেষ চেষ্টা সুরু হয়। অশোক ঘোষ এবং বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় প্রবীণ বর্ষীয়ান নেতা হেমন্ত বসুকে অজয় মুখোপাধ্যায়ের কাছে পাঠান। হেমন্ত বসু অজয় মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলেন।

২রা অক্টোবর। পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতির ক্ষেত্রে বিশেষ চিহ্নিত দিন। চারদিকে চাপা উত্তেজনা। অজয় মুখোপাধ্যায় আজ পদত্যাগ করবেন।
২রা অক্টোবর। মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন। লালবাহাদুর শাস্ত্রীর জন্ম-জয়ন্তী উৎসব। সারাদিন ধরে চারিদিকে রামধুনের সুর ধ্বনিত হচ্ছে। কিন্তু 'গান্ধী-প্রাণ' কংগ্রেস নেতাদের এতে কোন উৎসাহ বা আকর্ষণ নেই।

কোচিনে নৌ-বাহিনীর বার্ষিক মহড়ার অনুষ্ঠানে যোগদানের কর্মসূচী বাতিল করে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী চ্যবন। এক বিশেষ সংবাদের অপেক্ষায় তিনি রেডিও খুলে বসে আছেন। গুজরাটে সফররত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী কান পেতে আছেন আকাশবাণী থেকে একটি বিশেষ ঘোষণার জন্য। সদাচারী শ্রীনন্দ টেলিফোনের সামনে অপেক্ষমান। কলকাতায় জরুরী পি-পি লাইন 'বুক' করা হয়েছে প্রফুল্ল সেন ও ডঃ প্রফুল্ল ঘোষের নামে।

এদিকে কলকাতায় রাজ্যের সংসদীয় কংগ্রেস দলের এক জরুরী বৈঠক ডাকা হয়েছে চৌরঙ্গীর কংগ্রেস-ভবনে সন্ধ্যা ৭টায়। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেনের ঠাণ্ডা ঘরে কংগ্রেস নেতাদের জটলা জমে উঠেছে। কেউ কেউ ইতঃস্তত ঘর বার করছেন।

৮টা ৫ মিনিট। বিজয় সিং নাহার উত্তেজিতভাবে প্রফুল্ল সেনের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ঘোষণা করলেন: 'মুখ্যমন্ত্রী রাজভবনে প্রবেশ করেছেন।' পরক্ষণেই ক্ষিপ্রবেগে সভাকক্ষের দিকে চলে গেলেন। প্রফুল্ল সেন অপেক্ষমান সাংবাদপত্র প্রতিনিধিদের বললেন, 'একটু পরেই খবর দিচ্ছি'। জরুরী বৈঠক উপলক্ষে যে খানাপিনার ব্যবস্থা হয়েছিল, ইতিমধ্যেই সংসদীয় সদস্যরা তার সদ্ব্যবহার সুরু করে দিয়েছেন, যে কোন মুহূর্তে 'খবর' আসবে। কংগ্রেস-ভবনে চাপা উল্লাসের আবহাওয়া।

'খবর' এল। রাত ১০টা ৫ মিনিটে। পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন তথ্যমন্ত্রী বিজয় সিং নাহার প্রফুল্ল সেনের ঘর থেকে বিরস মুখে বেরিয়ে এলেন। হতাশার সুরে সাংবাদিকদের বললেন 'মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করেন নি'। আকাশবাণীতে বিশেষ সংবাদ প্রচারিত হল না। নেতারা রেডিও বন্ধ করে দিলেন।

সাংবাদিকরা প্রফুল্ল সেনের কাছে ছুটলেন। তিনি বললেন, 'আমার কাছে কোন খবর নেই।' ইতিমধ্যে দিল্লী থেকে নন্দাজীর টেলিফোন এসে গিয়েছে। প্রফুল্ল সেনের কাছ থেকে তিনি 'খবর' পেলেন। কিছু কড়া কথাবার্তারও আদান-প্রদান হল। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল ক্লান্ত বিমর্ষতায় প্রফুল্ল সেন ও তরুণকান্তি ঘোষ ঠাণ্ডা ঘরের চেয়ারে গা এলিয়ে বসে আছেন। অন্যেরা একে একে বিষণ্ণ মুখে সভাকক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সাংবাদিকরা রাত ১১টা পর্যন্ত রাজভবনের ফটকে অপেক্ষা করছেন। হঠাৎ খবর এল মুখ্যমন্ত্রী পেছনের দরজা দিয়ে বাড়ি চলে গিয়েছেন। সাংবাদিকরা বেলভেডিয়ারে। মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে। অজয় মুখার্জী সহাস্যে জানালেন, 'না, জনসাধারণের কাছে আমি আমার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিনি, আমি পদত্যাগ করিনি।'

সাতচল্লিশ

ষড়যন্ত্রের এক অধ্যায়ের উপর এই ভাবেই যবনিকা পড়ল। অজয় মুখোপাধ্যায় পেছিয়ে গেলেন। কিন্তু পেছিয়ে গেলেন না ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও হুমায়ুন কবীর। হুমায়ুন কবীর প্রফুল্লচন্দ্র সেনের সঙ্গে আগেই যোগাযোগ করেছিলেন। ৩রা নভেম্বর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করলেন এবং ৪ঠা নভেম্বর ১৭ জন বিধানসভা সদস্য নিয়ে পি-ডি-এফ নামে একটি ফ্রন্ট গঠন করলেন। পি-ডি এফ-এর পক্ষ থেকে রাজ্যপালকে জানিয়ে দেওয়া হল, তাঁরা ফ্রন্ট সরকারকে সমর্থন করেন না। বিধানসভায় বামফ্রন্টকে সংখ্যালঘু প্রমাণের চেষ্টাও সুরু হল।

রাজ্যপাল অবিলম্বে বিধানসভা ডেকে যুক্তফ্রন্টকে বিধানসভায় শক্তি পরীক্ষার নির্দেশ দিলেন। যুক্তফ্রন্ট থেকে রাজ্যপালকে জানিয়ে দেওয়া হল ১৮ই ডিসেম্বর

বিধানসভার অধিবেশন ডাকা হবে। কিন্তু সকলের অজ্ঞাতে ২০শে নভেম্বর যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে দেওয়া হল। গঠিত হ'ল ডঃ প্রফুল্ল ঘোষের নেতৃত্বে নতুন কোয়ালিশন সরকার।

২২শে নভেম্বর যুক্তফ্রণ্টের পক্ষ থেকে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে সভা ডাকা হ'ল। ডঃ ঘোষ মুখ্যমন্ত্রী হয়েই কলকাতায় ১৪৪ ধারা জারী করে সভাসমিতির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলেন। নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করেই ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে সভা করার চেষ্টা করা হল। পুলিশ নির্বিচারে লাঠি চালিয়ে সেই সভা ভেঙে দিল। আগের দিনও যিনি ছিলেন রাজ্যের আইনমন্ত্রী সেই অমরপ্রসাদ চক্রবর্তীকে পুলিশ এমনভাবে প্রহার করল যে তাঁকে একবছর হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল। বেঁচে থাকবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না।

রাজ্যে বে-আইনী সরকার গঠনের বিরুদ্ধে আইন-অমান্য আন্দোলন সুরু হল। হাজার হাজার মানুষ গ্রেপ্তার বরণ করল। ডঃ ঘোষ ও তাঁর মন্ত্রিসভা আঁতুড়েই প্রাণ হারালো বিধানসভায় স্পিকার বিজয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক রুলিং-এ। ২৯শে নভেম্বর বিজয় বন্দ্যোপাধ্যায় রুলিং দিলেন, 'বিধানসভাকে উপেক্ষা করে যে সরকার গঠিত হয়েছে সেই সরকার বে-আইনী।' ১৯৬৮ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী ডঃ ঘোষের মন্ত্রিসভার পতন ঘটল। সুরু হল রাষ্ট্রপতি শাসন।

রাজ্যে রাষ্ট্রপতি-শাসন জারী হবার সঙ্গে সঙ্গেই নতুন নির্বাচনের দাবী উঠল। এই দাবী উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল। ১৯৬৮ সালেই বর্ধমানে অনুষ্ঠিত হল সি পি আই (এম)-এর প্লেনাম। বর্ধমান প্লেনামে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল বিগত যুক্তফ্রণ্ট সরকারের অভিজ্ঞতা এবং আগামী দিনের সরকারের কর্মসূচী। এই প্লেনামে যে কর্মসূচী নেওয়া হয় তার মধ্যে অন্যতম প্রধান হ'ল কেন্দ্রের বিরুদ্ধে লড়াই। গণ-আন্দোলনে কোন ক্রমেই পুলিশ ব্যবহার করা হবে না—এটাই ছিল বর্ধমান প্লেনামের অন্যতম রায়। এই বছরেই পি-পি-আই (এম)-এর অষ্টম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়।

এই সময়ে প্রমোদ দাশগুপ্ত অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রশ্নে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। ১৯৬৮ সালের ১৮ই মে কোচবিহারে প্রমোদ দাশগুপ্ত বলেন, যুক্তফ্রণ্টকে কয়েকটি দলের মোর্চা হিসাবে দেখলে ভুল হবে; যুক্তফ্রণ্টকে দেখতে হবে একটা আন্দোলন হিসাবে। যুক্তফ্রণ্টের আসন বণ্টনের প্রশ্ন আলোচনাকালে সংবাদপত্রে এই মর্মে একটি খবর বেরিয়েছিল যে, যুক্তফ্রণ্ট

গঠনের প্রশ্নে সি-পি-আই (এম)-কে চীন-ভারত সংঘর্ষ, ঘেরাও প্রভৃতি বিষয়ে আগাম বক্তব্য রাখতে হবে। কোচবিহারের এই সভাতেই তিনি তার উত্তরে বলেন "সংবাদপত্রে দেখলাম, আমাদের নাকি বলতে হবে ১৯৬২ সালে চীন ভারতকে আক্রমণ করেছিল, ঘেরাও আন্দোলন চলবে না ইত্যাদি। এ সম্পর্কে আমি স্পষ্ট বলতে চাই যে, নন্দা-চ্যবন যখন পার্টির বিরুদ্ধে কুৎসা ছড়িয়ে হাজার হাজার কর্মীকে জেলে আটকে রেখে নির্যাতন করেছিল, তখনও এ কথা স্বীকার করাতে পারেনি। আর আজ ক'টা আসনের জন্য এ কথা আমাকে দিয়ে কখনই বলানো যাবে না। চীন-ভারত সীমান্ত-বিরোধ একমাত্র আলোচনার মাধ্যমেই সমাধান করা যাবে—এ কথা আগেও বলেছি, এখনও বলছি।"

১৯৬৯-এর গোড়া থেকেই মধ্যবর্তী নির্বাচনের দাবী এত জোরদার হয়ে ওঠে যে সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠানে বাধ্য হয়।

এবার আর দুই ফ্রন্টের লড়াই নয়। ১৪টি দল নিয়ে যুক্তফ্রন্ট ১৯৬৯-এর নির্বাচনী লড়াইয়ে নামলো। প্রচার অভিযানে নেতৃত্ব দিলেন প্রমোদ দাশগুপ্ত। বিধানসভার ২৮০টি আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট ২১৮টি আসন লাভ করে ক্ষমতায় ফিরে এল। অজয় মুখোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী। জ্যোতি বসু উপ-মুখ্যমন্ত্রী। স্বরাষ্ট্র দপ্তর এল জ্যোতি বসুর হাতেই।

আটচল্লিশ

১৯৬৯ সালের ৩রা মার্চ যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠনের সঙ্গে সঙ্গে কম্যুনিষ্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র উপর নতুন দায়িত্ব ও কর্তব্য এসে পড়ে। সেই দায়িত্বের ব্যাখ্যা করে প্রমোদ দাশগুপ্ত বলেন, যুক্তফ্রন্টের জয়ের মধ্য দিয়ে পার্টি পশ্চিমবঙ্গে নতুন শক্তি অর্জন করেছে। সেই শক্তিকে নতুন কায়দায় কাজে লাগাতে হবে। কংগ্রেসকে যাঁরা ভোট দিয়েছেন তাঁরাও শোষিত। কংগ্রেসী প্রচারযন্ত্র সবল হওয়ায় তাদের বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হয়েছে। পার্টি-কর্মীদের কর্তব্য হ'ল সেই সব মানুষকে অবিলম্বে যুক্তফ্রন্ট-এর পক্ষে নিয়ে আসা। তিনি বলেন, বিহারের সীমান্ত থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত কংগ্রেসের প্রভাব আজ শূন্য। এই অঞ্চলের কৃষকরা ঋণের দায়ে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে প্রায় মৃত হয়ে ছিল। আজ তারা আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে। মহাজনের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তারা

যুক্তফ্রন্ট-এর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। পার্টির দায়িত্ব, এই আত্মবিশ্বাসকে আরও বাড়িয়ে তোলা। প্রমোদ দাশগুপ্ত বলেন, বিহার এবং উত্তর প্রদেশ প্রমাণ করে দিচ্ছে যে একমাত্র গণতান্ত্রিক শক্তিই কংগ্রেস-বিরোধী শক্তি। বিহারে প্রতি-ক্রিয়াশীল দলগুলির কোয়ালিশন ঘটেছে। তাই, পার্টির কর্তব্য জনগণকে সজাগ করে দেওয়া। তিনি বলেন, গণতান্ত্রিক শক্তি ছাড়া কংগ্রেসের পতন ঘটানো অসম্ভব।

শ্রম-নীতি সম্পর্কে তিনি বলেন, শ্রম-সংক্রান্ত ব্যাপাব যৌথতালিকাভুক্ত। কেন্দ্রের অনুমোদন সাপেক্ষ। কেন্দ্র সহজে অনুমোদন দেবেনা। তাই শ্রম-নীতিকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের লক্ষ লক্ষ মানুষকে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে শ্রম-আইনকে বাস্তবানুগ করতে হবে।

৩রা মার্চ আগরতলায় এক জন-সমাবেশে প্রমোদ দাশগুপ্ত পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্বর্তী নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট-এর বিরাট জয়ের প্রসঙ্গে বলেন যে, কেন্দ্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ত্রিপুরার মানুষের পাশে এসে দাঁড়াবে পশ্চিমবঙ্গ। তিনি উল্লেখ করেন, যুক্তফ্রন্টের জয় একদিনে আসেনি। পশ্চিমবঙ্গে শ্রমিক, কৃষক, সাধারণ মানুষ বহু ত্যাগ স্বীকার করে গণ-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যুক্তফ্রন্ট গড়ে তুলেছে। ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস ভেবেছিল তারা জয়যুক্ত হবে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তা হতে দেয়নি। বসিরহাটে নুরুল ইসলামকে হত্যার প্রতিবাদে একমাসের মধ্যে দুইবার বাংলা-বন্ধ্ হয়েছিল এবং এক অপ্রতিরোধ্য সংগ্রামী ঐক্য গড়ে উঠেছিল। তার ফলেই এই রকম ভাবে কংগ্রেসকে পরাজিত করা সম্ভব হয়েছে। কংগ্রেস চক্রান্ত করে নয় মাসের সরকারকে অপসারিত করেছিল। তিনমাস ধরে ক্রমাগত আন্দোলন, ৫০ হাজার মেহনতী মানুষের কারাবরণ এবং ১৭টি তরুণের প্রাণের বিনিময়ে বেইমান ঘোষ মন্ত্রিসভাকে বাতিল করে নির্বাচন আদায় করা হয়। প্রশ্ন উঠতে পারে যুক্তফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে কী দিয়েছিল। ভূমিহীন চাষীদের মধ্যে ১ লক্ষ ৩৮ হাজার একর জমি তারা বিলি করেছে। কৃষক তার গত ২০ বছরের বঞ্চনার জীবনে কিছুই পায়নি। বরং জমি হারিয়ে ক্ষেত-মজুর হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এবার আসল শত্রুকে চিনতে পেরেছে। তাই, কংগ্রেস পরাজিত হয়েছে। ১৯৬৭ সালের পর কংগ্রেসী গণতন্ত্রের চেহারা বদলে গিয়েছে। কংগ্রেসকে ভোট না দিলে আর গণতন্ত্র হয় না—চ্যবন সাহেব এই কথা বলেই ভয় দেখাতে চেয়েছিলেন। প্রমোদ দাশগুপ্ত বলেন, "পশ্চিমবঙ্গের

পাট ও চা থেকে কোটি কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকার বিদেশী মুদ্রা পায়। আমাদের কর্তব্য, খাদ্য ও টাকা না পেলে পাট ও চা আটকে দেওয়া। ডাকঘর-গুলিকে পাহারা দিতে হবে এবং পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষকে বলতে হবে যাতে সমস্ত টাকা দিল্লী না যায়।"

১৯৬৯-এর দশই মার্চ ময়দানে এক ঐতিহাসিক সমাবেশ হ'ল। আসামের সীমান্ত থেকে, হিমালয়ের পাদদেশ থেকে, বিহার ও উড়িষ্যার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে যাঁরা এই সমাবেশে যোগ দিয়েছিলেন, প্রমোদ দাশগুপ্ত তাঁদের অভিনন্দন জানিয়ে সমাবেশে তাঁর ভাষণে বলেন, "যুক্তফ্রন্টের জয়ের ফলে আমাদের পার্টির উপর নতুন দায়িত্ব এসে পড়েছে। আমরা যদি সেই দায়িত্ব পালন করতে না পারি তাহ'লে শুধু মার্কস্‌বাদী পার্টিকেই নয়, মেহনতী সমস্ত মানুষকেও এই ব্যর্থতার জন্য দুঃখজনক মূল্য দিতে হবে। কংগ্রেসের পরাজয়ে আত্মসন্তুষ্টি নয়। এখন থেকেই বুঝে নিতে হবে, আগামী দিনের লড়াইয়ে কার কী ভূমিকা। যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন হবার পর এই সরকারের বিরুদ্ধে কংগ্রেস প্রাদেশিকতার উস্কানি দিচ্ছে। বিভেদ শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, কুড়ি বছর ধরে কংগ্রেস যে শ্রেণী-শোষণ ও শাসন-সংকট সৃষ্টি করেছে, যুক্তফ্রন্ট তার সীমাবদ্ধ ক্ষমতা নিয়ে সেই শোষণ ও সংকটের সমাধান করতে পারবে না। তার জন্য দরকার শ্রেণী-সংগ্রাম।"

তিনি বলেন, "পূর্ণ সুযোগ নিয়ে গ্রামে-গঞ্জে-কলে গড়ে তুলতে হবে শ্রেণী-সংগ্রাম, যার লক্ষ্য হবে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব। শোষণ-বঞ্চনা-অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রকৃত মুক্তির জন্য শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে আমাদের সম্পন্ন করতে হবে এই বিপ্লব।"

সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে প্রমোদ দাশগুপ্ত বলেন, "মেহনতী মানুষের প্রধান শত্রু যখন পরাজিত হয়, তখন, সেই শত্রু সংশোধনবাদীদের কাঁধে ভর রেখে আক্রমণ চালায়।"

তিনি উগ্রপন্থীদের সমালোচনা করে বলেন যে, সংশোধনবাদ এবং সংকীর্ণতাবাদ মেহনতী মানুষের প্রধান শত্রু। সংশোধনবাদ শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামকে ভোঁতা করে দেয়। আর, সংকীর্ণতাবাদ বাস্তব অবস্থাকে অস্বীকার করে সেই সংগ্রামকে আগেভাগেই ভণ্ডুল করে দেয়।

১৮ই মার্চ চেতলায় প্রমোদ দাশগুপ্ত বলেন যে জনগণ তিক্ত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে

ক্রমশঃ বুঝতে শিখছে যে সংগ্রাম ছাড়া দাবী দাওয়া আদায় অসম্ভব। বর্তমান মেহনতী মানুষকে শ্রেণী-সংগ্রামের মন্ত্রে দীক্ষিত করতে হ'বে। শ্রেণী-সংগ্রামের জন্য প্রয়োজন সুদৃঢ় সংগঠন। মালিক গোষ্ঠী ভাঁওতা দিয়ে এই সংগঠনকে ভোঁতা করবার চেষ্টা করছে।

তিনি আরও বলেন যে অন্তর্বর্তী নির্বাচন নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে। শ্রমিকরা তাঁদের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পেরেছেন ধর্মঘট করে ছাঁটাই রোখা যায় না, যদি না রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান হয়। তাই হাজার হাজার মানুষ মহাজনের রক্ত চক্ষুকে উপেক্ষা করে যুক্তফ্রন্টের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

হটকারীদের সম্পর্কে তিনি বলেন যে, ওরা এতদিন নির্বাচন বয়কট করার স্লোগান তুলে ধরমবীরের রাজত্ব রক্ষা করার কাজে লিপ্ত ছিল। কিন্তু তা সম্ভব হল না। এখন এদের উদ্দেশ্যে এখানে ওখানে হাঙ্গামা বাধিয়ে ধরমবীরের হাতে 'অরাজকতা'-র অস্ত্র তুলে দেওয়া।

২৯শে মার্চ মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যকমিটির সম্পাদক প্রমোদ দাশগুপ্ত এক বিবৃতিতে বলেন, কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশবাহিনী রাজ্য থেকে তুলে নেওয়া হোক। গত ৩০শে মার্চ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী ওয়াই বি চ্যবন লোকসভায় বলেছিলেন যে, কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশবাহিনী পশ্চিমবঙ্গে থাকবে এবং রাজ্য সরকার না চাইলে এই বাহিনীকে ব্যবহার করা হবেনা। কিন্তু এই পুলিশবাহিনী যখন যুক্তফ্রন্ট সরকারের আদেশ ছাড়াই এবং আদেশের বিরুদ্ধে হামলা চালায় তখন কে তাঁর কথা বিশ্বাস করবে? পশ্চিমবঙ্গের জনগণ এখন বুঝেছে যে চ্যবন সাহেব দু'মুখো প্রতারণামূলক কথা বলতে মহা ওস্তাদ। পাশাপাশি দু'টো পুলিশ বাহিনী এই রাজ্যে থাকতে পারে বা থাকা উচিত এমন একটা অবস্থা পশ্চিমবঙ্গের জনগণ ও রাজ্যসরকার মেনে নিতে পারে না, যখন আইন-শৃঙ্খলা রাজ্যের এক্তিয়ারের মধ্যে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলি সর্বতোভাবে চেষ্টা করবেন যাতে ফ্রন্ট সরকার জনগণের পাশে দাঁড়িয়ে রিজার্ভ পুলিশ বাহিনীকে পশ্চিমবঙ্গ ছাড়তে বাধ্য করে।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণীর সংহতি, সৌহার্দ ও সংগ্রামী শপথের দিন 'মে দিবস' উপলক্ষে ১লা মে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ড-এ এক কেন্দ্রীয় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হল। যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ভেঙ্গে দেবার নতুন যে চক্রান্ত সুরু হয়েছে, প্রধান বক্তা প্রমোদ

দাশগুপ্ত এই সমাবেশে তার প্রথম ইঙ্গিত দিলেন। তিনি কঠোর সমালোচনা করলেন নকশালপন্থী তথা উগ্রপন্থীদের।

১১ই জুন রাজ্যের পুলিশ বাহিনী প্রসঙ্গে প্রমোদ দাশগুপ্ত বলেন, এই বাহিনীকে যুক্তফ্রন্ট-এর নীতি অনুযায়ী কাজ করতে হবে। পুলিশ যেখানে সরকারের কথা শুনবেন না, সেখানে জনগণকে আহ্বান করা হবে পুলিশকে দায়িত্ব পালনে বাধ্য করার জন্য। তিনি বলেন, পুলিশের এক অংশ যুক্তফ্রন্ট গঠিত হবার পর থেকেই চক্রান্তে লিপ্ত। এদের সম্পর্কে তিনি জনগণকে সতর্ক করে দেন।

প্রমোদ দাশগুপ্তের জীবনে ১৯৬৭ এবং ১৯৬৯ সাল দুটি তাঁর চিন্তা, ভাবনা ও বক্তব্যের দিক থেকে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা যেতে পারে। বামপন্থীরা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় এলে কি জাতীয় চক্র-চক্রান্তের সৃষ্টি হয় এবং কি ভাবে রাজনৈতিক সংকটের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক পোলারাইজেশন ঘটে, এই সব প্রশ্নে প্রমোদ দাশগুপ্তের বিশ্লেষণ ও বক্তব্য আগামী দিনের রাজনীতির দিগ্ দর্শন হয়ে থাকবে। তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছেন কী ভাবে বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হল, ভিতরে বাইরে চক্রান্ত কি ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করেছে—ভিতরের চক্রান্তে লিপ্ত কিছু শরিক দল এবং বাইরের চক্রান্তে কেন্দ্রীয় সরকার। প্রমোদ দাশগুপ্তের '৬৭-'৭১ সালের বক্তব্যগুলিতে দেখা যায়, তাঁর দলকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য কি নিদারুণ চক্রান্ত চলেছে এবং তিনি কি অসাধারণ মার্কসীয় রণ-কৌশলের দক্ষ প্রয়োগে দলকে রক্ষা করছেন। ঐক্য এবং সংগ্রামের নীতিকে কত সুকৌশলে প্রয়োগ করা যায় তার দৃষ্টান্ত মেলে কাণ্ডারী হিসাবে প্রমোদ দাশগুপ্তের এই সময়ের পার্টি পরিচালনায়।

১৯৬৯ সালে প্রমোদ দাশগুপ্তই প্রথম প্রশ্ন তোলেন কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক নিয়ে। তিনি দাবী করেন, রাজ্যের হাতে আরও অধিকার ও ক্ষমতা থাকা দরকার। পরবর্তীকালে এই প্রশ্ন সর্বভারতীয় প্রশ্নে পরিণত হয়।

রাজ্যের পুলিশ বাহিনী যখন সরকারের বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত হল, তখন প্রমোদ দাশগুপ্ত পার্টির নিজস্ব স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর গুরুত্ব উপলব্ধি করলেন। তিনি মনে করতেন, একটি বিপ্লবী পার্টির পক্ষে বিপ্লবী স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী থাকা অপরিহার্য। বর্ধমানের রবিন সেনকে এই স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গড়ে তোলার বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে রাজ্যের বামপন্থী ঐক্য ভেঙ্গে তছনছ হয়েছে। নকশালপন্থী নামে একদল উগ্রপন্থী সি-পি-এম নেতাদের আক্রমণ করেছে।

যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে গিয়েছে। সন্ত্রাসের বলি হয়েছে শত শত পার্টিকর্মী। কিন্তু দেখা গিয়েছে সি-পি-এম ক্রমে ক্রমেই শক্তি বৃদ্ধি করেছে। ১৯৬৯ সালের ২রা জুলাই প্রমোদ দাশগুপ্ত স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর অভিবাদন গ্রহণ করলেন।

সরকারী আমলাদের সম্পর্কে প্রমোদ দাশগুপ্তের বক্তব্য ছিল, যে শ্রেণী থেকে এই আমলারা এসেছে সেই শ্রেণীকে তারা সমর্থন করবেই।

১৯৬৯ সালের ২৫শে অক্টোবর ময়দানে এক সুবিশাল সমাবেশ হল। ই এম এস নামবুদিরিপাদ, এ কে গোপালন এই সভায় প্রধান বক্তা থাকলেও সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখলেন প্রমোদ দাশগুপ্ত। তিনি প্রধানতঃ বক্তব্য রাখলেন ফরওয়ার্ড ব্লক এবং আর-এস-পি দলের উদ্দেশ্যে। তিনি দাবী জানালেন, রাজ্যসরকারকে আরও সাংবিধানিক ক্ষমতা দেবার এবং শিল্প নিরাপত্তা বাহিনী, সি-আর-পি, সীমান্ত রক্ষীবাহিনী, আই-এ-এস ও আই-পি-এসদের উপর আরও কর্তৃত্বের।

ময়দানে এই সভার পর থেকে পরবর্তী ১৩ বছর প্রমোদ দাশগুপ্ত সব চাইতে বেশী গুরুত্ব দিয়ে কেন্দ্র-রাজ্যের সম্পর্কের কথা বলেছেন। ১৯৬৯ সালের ১লা নভেম্বর বোরশূলে অনুষ্ঠিত বর্ধমান কৃষক সভার প্রকাশ্য সমাবেশেও প্রমোদ দাশগুপ্ত কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের আমূল পরিবর্তনের দাবী জানালেন। তিনি দাবী করলেন সংবিধানকে জনগণের পক্ষে ব্যবহার করতে হবে। রাজস্বের ৭৫ ভাগ রাজ্যসরকারকে দিতে হবে।

এই সময়ে প্রমোদ দাশগুপ্তের পরিচিতি, চিন্তা, ভাবনা ও বক্তব্য শুধু ভারতবর্ষ নয়, ভারতবর্ষের বাইরেও বিশেষভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ভারতবর্ষের সমস্ত নামী-দামী সংবাদপত্রগুলি প্রমোদ দাশগুপ্তের বক্তব্যকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে। একটি বিশ্ববিখ্যাত পত্রিকা এই সময়ে প্রমোদ দাশগুপ্ত সম্পর্কে লিখেছিল, "বিপ্লবের মুহূর্তে রাশিয়ায় লেনিনের যে অবস্থান ছিল, আজ সি-পি-আই (এম) নেতা প্রমোদ দাশগুপ্তের মার্কস্‌বাদী কম্যুনিষ্ট পার্টিতে সেই রকমই অবস্থান।"

উনপঞ্চাশ

১৯৭০ সাল। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির আর এক অধ্যায়। ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসের মধ্যে প্রগতির ছায়া দেখে সি-পি-আই তার রাজনীতির কেন্দ্র

কিছুটা পরিবর্তন করে। মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির মধ্যে কিছু ব্যক্তির দলীয় নীতিকে অগ্রাহ্য করার প্রবণতায় শরিক দলগুলির মধ্যে সংঘর্ষ দেখা দেয়। উত্তেজনা এবং প্ররোচনায় বাংলা-কংগ্রেস দলের অনেকে মরীয়া হয়ে উঠলেন কংগ্রেসে ফিরে যাবার জন্যে। প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের কাল হয়েছিল দলত্যাগ। এবার কাল হ'ল ছিন্নমস্তা রাজনীতি।

সি-পি-আই (এম-এল) গঠিত হয়েছে। 'বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস' ধ্বনি তুলে চলছে মুণ্ডু-কাটা রাজনীতি। ব্যালটের পথে একদল যখন রাজ্যে ক্ষমতা দখল করে জনগণের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়ায় ব্রতী, তখন আর এক দল বুলেটের পথে ক্ষমতা দখলে তৎপর। মুক্তাঞ্চল গঠন করে কিছু লোকের মাথা কেটে এক নতুন রাজনীতি সুরু করেছে। রাজনীতি চলেছে বুলেট ও ব্যালটে।

মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায় আবার অশান্ত হয়ে উঠলেন। যুক্তফ্রন্টের দাবী উঠল স্বরাষ্ট্র দপ্তর জ্যোতি বসুর হাতে রাখা চলবেনা। অনেক চেষ্টা হল যুক্তফ্রন্টের আভ্যন্তরীণ সংকট মোচনের। বাংলা-কংগ্রেস বাঁকুড়াতে রাজ্য সম্মেলন করে প্রস্তাব নিল যে শরিকী সংঘর্ষ রোধে বাংলা-কংগ্রেস সত্যাগ্রহ করবে। সুরু হয়ে গেল সেই সত্যাগ্রহ।

১৯৭০ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী প্রমোদ দাশগুপ্ত বলেন, এ ভাবে সরকারকে রাখা যাবেনা। স্বরাষ্ট্র দপ্তর ছেড়ে দিয়ে কোন আপস করা হবেনা। ৯ই থেকে ১৫ই ফেব্রুয়ারী গারুলিয়াতে অনুষ্ঠিত হল সি-পি-আই (এম)-এর প্লেনাম। প্লেনামের আগে রাজ্য কমিটির বৈঠকের পর তিনি বলেন : অঙ্কের হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি চলেনা। বারবার তা' প্রমাণিত হয়েছে। ডঃ ঘোষ শিক্ষা পেয়েছেন। এখনও যদি কেউ সেই ভুল করতে চান, তা'হলে একই শিক্ষা পাবেন। রাজ্য কমিটি মনে করে যে, রাজ্যে জনগণের একটি নতুন যুক্তফ্রন্ট গড়ে উঠেছে। গরীব এবং মেহনতী মানুষ পার্টির গণ্ডি অতিক্রম করে নিজেদের স্বার্থে সংগ্রামী ঐক্য গড়ে তুলেছেন। গারুলিয়ায় লেনিন নগরে প্রকাশ্য জনসভায় জ্যোতি বসু বললেন : আলাপ-আলোচনা করে যুক্তফ্রন্ট রক্ষা করা ক্রমেই অসম্ভব হয়ে উঠছে।

ইতিমধ্যে বাংলা-কংগ্রেস থেকে চেষ্টা সুরু হ'ল সি-পি-আই (এম)-কে বাদ দিয়ে সরকার বহাল রাখার। সুশীল ধাড়া ছিলেন এই উদ্যোগের প্রধান নেতা। প্রমোদ দাশগুপ্ত কিন্তু বাংলা-কংগ্রেস সম্বন্ধে ধরেই নিয়েছিলেন যে ওরা সরকার

ভেঙে দেবে। ১৫ই মার্চ তিনি বলেন, রাজ্যে শ্রেণীভিত্তিক ফ্রন্ট গড়ে উঠতে পারে। বিকল্প সরকারও হতে পারে।

শুধু কথার কথা নয়। প্রমোদ দাশগুপ্ত ছুটে গিয়েছিলেন সি-পি-আই নেতাদের কাছে। সি-পি-আই (এম) রাজ্যকমিটি সিদ্ধান্ত নিল: রাজনীতির ভিত্তিতে, ব্যক্তিগত মর্যাদা তুচ্ছ করে সি পি-আই নেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের মাধ্যমে যুক্তফ্রন্টকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করা দরকার। প্রমোদ দাশগুপ্ত সরোজ মুখোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে সি-পি-আই অফিসে গেলেন। ২৮টা প্যাঁচানো সিঁড়ি ভেঙে তিন তলায় উঠলেন। সি-পি-আই নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে বসলেন। টেবিলের এক পাশে রণেন সেন ও বিশ্বনাথ মুখার্জী; অন্য পাশে প্রমোদ দাশগুপ্ত ও সরোজ মুখোপাধ্যায়। রণেন সেন বেশী কথা না বলে আগেই আলোচনা করতে চাইলেন স্বরাষ্ট্র দপ্তর সহ কিছু দপ্তরের পুনর্বণ্টন নিয়ে। অর্থাৎ রাজনীতি নয়, দপ্তর হল বড় কথা। প্রমোদ দাশগুপ্ত বললেন: আগে রাজনীতি ঠিক হোক। আপনারা বলুন, শুধু বামপন্থীদের নিয়ে যুক্তফ্রন্ট করার রাজনীতি আপনাদের কাছে গ্রহণযোগ্য কি না। এই রাজনীতি যদি আপনারা মানেন, তাহলে দপ্তর বন্টনের ব্যাপার হবে গৌণ। এই প্রশ্নের ফয়সালা হল না। দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে গেল। বাংলা কংগ্রেস বেরিয়ে গেলেও সি-পি-আই থাকলে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার ভাঙতো না। প্রমোদ দাশগুপ্তের যুক্তফ্রন্ট সরকারকে রক্ষা করার আপ্রাণ চেষ্টা সফল হল না। মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায় নিজের সরকারকে অসভ্য বর্বর সরকার বলে ১৬ই মার্চ পদত্যাগ করলেন। দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন হ'ল।

রাজ্যের দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনে শুধু সরকারেরই পতন ঘটলো না, বাম রাজনীতিতেও প্রচণ্ড ভাঙনের সৃষ্টি হল। একদিকে সি-পি-আই (এম) এবং অন্যদিকে সি-পি-আই, ফরওয়ার্ড ব্লক ও বাংলা-কংগ্রেস। ফরওয়ার্ড ব্লক ১৯৫২ সাল থেকে অবিভক্ত কম্যুনিষ্ট পার্টির সহযোগী ছিল। সেই ফরওয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে সি-পি-আই (এম)-এর বিচ্ছেদ ঘটল। পরবর্তীকালে বাংলা-কংগ্রেসের সঙ্গে সি-পি-আই কংগ্রেস দলের সহযোগী হয়। ফরওয়ার্ড ব্লক কিছু পরেই আবার সি-পি-আই (এম)-এর সঙ্গে একই মঞ্চে ফিরে আসে। সি-পি-আই অবশ্য বাম রাজনীতির মূল ধারায় ফিরে এল অনেক পরে।

রাষ্ট্রপতি শাসন ও পরবর্তী নির্বাচন-প্রস্তুতির মধ্য দিয়ে ১৯৭০ সাল অতিক্রান্ত

হল। ১৯৭১ সাল এল। সি-পি-আই (এম) এই সময়ে দু'দিক থেকে আক্রান্ত। একদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের পুলিশ ও সি-আর-পি; অন্য দিকে নকশাল। সি-পি-আই (এম)-এর জীবনে বাস্তবিকই এক ভয়াবহ কাল।

১৯৭০ সালের ১৯শে মার্চ রাষ্ট্রপতি শাসন চালু হল। এই সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। তার ঢেউ পশ্চিমবঙ্গে এসে আছড়ে পড়ল। মুজিবনগরে অস্থায়ী বাংলাদেশ-সরকার প্রতিষ্ঠিত হল। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করছেন তাঁরাই। পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত রাজনৈতিক দল এই মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন জানায়।

পঞ্চাশ

রাষ্ট্রপতি-শাসন চালু হবার পর এই রাজ্যে প্রচুর সি-আর-পি আমদানী করা হল। খুনের সংখ্যা, অত্যাচারের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল। সি-পি-আই (এম)-এর পক্ষ থেকে সি-আর-পি বাহিনীর অপসারণের দাবীতে ৮ই ডিসেম্বর সাধারণ ধর্মঘট ও হরতাল ডাকা হ'ল; ৭ই ডিসেম্বর হাওড়া ময়দানে যুব-সমাজের উদ্দেশে প্রমোদ দাশগুপ্ত তাঁর ভাষণে বলেন : "যুব সমাজের সামনে আজকে যে সমস্যা, তার সঠিক বিশ্লেষণ না হলে ভবিষ্যত পথ ঠিক করা যাবে না। তাই বর্তমান পরিস্থিতি যুব সমাজের কাছে একটা চ্যালেঞ্জ নিয়ে এসেছে—তারা প্রতিক্রিয়াশীল প্রচারে বিভ্রান্ত হবে, না, গণ আন্দোলনে সামিল হবে। যুবকদের প্রতিক্রিয়াশীল ফাঁদ থেকে বাঁচবার জন্য সবচাইতে বড় প্রয়োজন একটি বলিষ্ঠ সংগঠন, যা যুবকদের হৃদয়ে প্রাণ-সঞ্চার করতে পারে। প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে প্রগতি, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের লড়াইয়ে যুবসমাজকে সামিল হতে হবে।

"যুব সমাজের সামনে আজ যে সমস্যা, তার সঠিক মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ না হলে সে তার আগামী দিনের পথ ঠিক করতে পারবে না। আমরা দেখছি, জনসংঘ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক মারফত এবং কংগ্রেস যুব কংগ্রেস মারফত, এমন কি সরাসরিও যুবকদের বিভ্রান্ত করতে চাইছে। তারা চায় যুবসমাজ প্রতিক্রিয়ার বাহনে পরিণত হোক। আজ প্রশ্ন উঠতে পারে, কেন আমাদের পার্টি যুব সংগঠনের উপর গুরুত্ব দিচ্ছে। বর্তমান সংকট এড়াবার জন্য শাসকশ্রেণী আজ পথ খুঁজছে। শতকরা ৭০ ভাগ মানুষ গ্রামে বাস করেন। তাঁদের কাছে আজ এক বিরাট সমস্যা। সেই সমস্যায় যুব সমাজও জর্জরিত। গ্রামে সামন্ততান্ত্রিক

শোষণের ফলে জমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে তারা সহরের কারখানায় ভীড় করছে। তার মধ্যে বেশীর ভাগই যুবক। চারটি পরিকল্পনার পরও বেকার সংখ্যা তিন কোটিতে দাঁড়াবে। দেশের বিকাশের প্রশ্নে সব চাইতে বড় সমস্যার সঙ্গে যুবকদের প্রশ্নও জড়িত। এর সমাধানের পথ পরিষ্কার হওয়া দরকার।

"অনেকে নকশালদের সম্পর্কে তত্ত্ব খাড়া করতে চাইছেন। অজয় মুখোপাধ্যায় নাকি বলেছেন, তিনি নকশালদের সঙ্গে আলোচনা করতে চান। যদি বোঝেন, ঐ পথে যাওয়া প্রয়োজন, তাহ'লে তিনি ঐ পথেই যাবেন। সোমনাথ লাহিড়ী বলছেন, ওদের বোঝাতে হবে। আবার কেউ কেউ বলছেন. ওদের মধ্যে নাকি মেধাবী ছাত্র আছে।

"কিন্তু একটা রাজনৈতিক সংগঠনকে মেধাবী অথবা মেধাবী নয়—এই দিয়ে বিচার করা যায় না। যে সব বিপ্লবী ভারতের রাজনৈতিক মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়ে গিয়েছেন তাঁদের কাছে মেধাবী বলে কোন প্রশ্ন ছিল না। উদ্দেশ্য ছিল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই। তেমনি রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধে আজ যে লড়াই তাতেও এই প্রশ্ন নেই। আজকের পথ গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ। যার মূল শক্তি শ্রমিক শ্রেণী। তাদের লড়াইয়ে তো এই প্রশ্ন আসতেই পারে না। ট্রটস্কিও এক সময়ে বলশেভিক পার্টির সদস্য ছিলেন। রুশ বিপ্লবের পরে সমাজতান্ত্রিক শিশুরাষ্ট্রকে ধ্বংসের জন্য সাম্রাজ্যবাদীরা যে চক্রান্ত করেছিল তাতে সহায়তা করেছিল ট্রটস্কিপন্থীরা। অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজে অন্তরায় সৃষ্টির জন্য এরা গোপনে বিপ্লবী নেতাদের খুন করতেও দ্বিধা বোধ করেনি। তখন স্তালিন বলেছিলেন—এরা আর সমাজতান্ত্রিক শক্তিতে নেই। তখন ট্রটস্কি মেধাবী ছিল কি না তা দিয়ে বিচার করা হয়নি।

"পশ্চিমবঙ্গেও আমরা কি দেখছি। গণ-আন্দোলনের অগ্রণী মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট কর্মী, সংগঠক ও নেতাদের নকশালপন্থীরা খুন করছে। তার প্রচার করছে বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলি। এদের উদ্দেশ্য—নকশালদের তুলে ধরো।"

প্রমোদ দাশগুপ্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত কিটিংস্-এর স্পর্ধার উল্লেখ করে বলেন, "কিটিংস্ কলকাতায় এসে বললেন, নকশালদের মধ্যে সি-আই-এ নেই। তিনি কী করে জানলেন যে, সি-আই-এ নেই। কিন্তু তাঁর কথার মধ্য দিয়ে বোঝা যাচ্ছে, সি-আই-এ আছে। লক্ষ্য করার বিষয় নকশালরা কিটিংস্-এর বিরুদ্ধে কোন উচ্চবাচ্য করেনি।"

প্রমোদ দাশগুপ্ত অষ্টবামের আসল চরিত্র উদ্‌ঘাটন করে বলেন, "এরা কংগ্রেস-বিরোধী হিসাবে পরিচয় দিতে চাইছে। কিন্তু অজয় মুখুজ্জেরাই কেন্দ্রীয় কংগ্রেসী ঘাতকদের হাতে পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে তুলে দিয়েছে। নির্বাচনের প্রাক্কালে মানুষকে ভয় দেখানোর জন্য মিলিটারী নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বাংলা-কংগ্রেস উদ্বাহু হয়ে সাধুবাদ জানাচ্ছে। আট-পার্টি জোট নীরব। দালাল আট-পার্টির মতো স্বয়ংপ্রভু কংগ্রেসীরা কী স্পর্ধায় মানুষের কাছে ভোট চাইবে। ইন্দিরা সরকারের নীতি সার্বিক জনবিরোধী।

"এবারের নির্বাচনে লক্ষাধিক নতুন কর্মী আমাদের পার্টির পাশে এসেছেন। এ ঘটনা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যখন মার্কস্‌বাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধে তথাকথিত বামপন্থী, তিন কংগ্রেস ও প্রতিক্রিয়া জোট একযোগে আক্রমণ ও ষড়যন্ত্র চালিয়েছে, যখন সমস্ত বুর্জোয়া ও বামপন্থী ভেকধারী পত্রপত্রিকা, শাসক শ্রেণীর প্রচার যন্ত্র রেডিও আমাদের বিরুদ্ধে কুৎসা ও অপপ্রচার চালিয়েছে, তখন এই দুই লক্ষ নতুন কর্মী অসম সাহস, ত্যাগ ও শৌর্যের পরিচয় দিয়ে আমাদের পাশে থেকে লড়াই করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের সংগ্রামের ইতিহাসে এই ঘটনা আমাদের মনোবলকে দ্বিগুণ করেছে। এই সমস্ত কর্মীকে আমাদের যত্নের সঙ্গে রক্ষা করতে হবে। বিশেষ ভাবে নজর দিতে হবে। কারণ, শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাবাহিনীর মূল ভিত্তি হবে এরাই। সুশৃঙ্খল কর্মীদলই হবে সংগ্রামের নতুন দিশারী। এবারের নির্বাচনে নতুন দুই শক্তি মাথা চাড়া দিয়েছে। এক মুসলীম লীগ, দুই জনসংঘ।"

প্রমোদ দাশগুপ্ত সাম্প্রদায়িক দলগুলি সম্পর্কে হুশিয়ারী দিয়ে বলেন, "মুসলীম লীগকে পাকিস্তানের সংগ্রামী মানুষই কবর দিয়েছে। আর, এই মুসলীম লীগকে নিয়ে সাম্প্রদায়িকতার জিগিরকে আরও সোচ্চার করার জন্য ইন্দিরা গান্ধী তোয়াজ করে মন্ত্রিসভায় ঠাঁই দিচ্ছেন। যশোহরে-মিলিটারীর গুলিতে একজন হিন্দু নারী মারা গেলে সেখানে মুসলমানরা মিলিটারীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে মিছিল করেছে। গর্জে উঠেছে। সেখানে যখন সাম্প্রদায়িকতাকে শেষ করে দেওয়া হচ্ছে, তখন এখানে তা' বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা হচ্ছে।"

প্রমোদ দাশগুপ্ত বলেন, "কংগ্রেসীরা জোড়াতালি দিয়ে যদি সরকার গঠন করে তবে তা' হবে কায়েমী স্বার্থান্বেষীদের কিছু পাইয়ে দেবার সরকার। গণতান্ত্রিক

মানুষের স্বাধিকার রক্ষার সংগ্রামী সরকার নয়। তাই সে সরকার টিঁকে থাকতে পারে না। অচিরেই ধ্বসে যাবে।

"এবারের নির্বাচনে আমাদের অভাবনীয় সাফল্য এসেছে। এত মানুষের অভিনন্দনকে আমরা দায়িত্বের সঙ্গেই মর্যাদা দেবো। জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই এই বিপুলসংখ্যক মানুষ এবার আমাদের পাশে এসেছেন। সমর্থন করেছেন।"

প্রমোদ দাশগুপ্ত নির্বাচনী ফলাফল বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলেন, "১৯৫২ সাল থেকে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আমরা নির্বাচনী মোর্চা গঠন করেছি। তখন আমাদের লক্ষ্য ছিল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কতগুলি দলকে আমরা এক করতে পারি। কিন্তু এবারের নির্বাচনী জোটের তাৎপর্য গভীরভাবে অনুধাবন করতে হবে। এবার আট পার্টি জোট, প্রতিক্রিয়াশীল দল, নকশাল, সমাজবিরোধী ও তিন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই করতে হয়েছে। কংগ্রেসের দালাল সংখ্যা এবার ছিল বহু। যা ইতিপূর্বে ছিল না। এত সবের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মুখ্যত আমরাই ছিলাম প্রকৃত বামপন্থী। তাই জনগণ আমাদের শক্তি বাড়িয়েছেন। আমাদের মধ্যে ছোট ছোট দল থাকলেও তাদের ত্যাগ ও সাহস কম নয়। মানুষ তাই তাঁদেরও জিতিয়েছেন।"

পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতি সবিস্তারে ব্যাখ্যা করে সমাবেশে তিনি বলেন, "খুন, গ্রেপ্তার, অত্যাচার, দমননীতি ও কুৎসা দিয়ে শাসকশ্রেণী ও তার দালালরা মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টিকে ধ্বংস করে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু পারেনি। নির্বাচনী মোকাবিলায় তা' প্রমাণিত হয়েছে। আমরা এখানে বৃহত্তর শক্তিশালী দল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছি।"

সংসদীয় গণতন্ত্রের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে তিনি বলেন, "এই পথে জনগণের মৌলিক সমস্যা সমাধানের জন্য দরকার সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন। তাই আজকের রাজনৈতিক প্রশ্ন হল: কোন্ পথ? প্রচার করা হয় কম্যুনিষ্ট পার্টি (মাঃ) ভারতীয় সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না। কিন্তু আমরা জানি, কম্যুনিষ্টদের পক্ষ থেকে সংসদীয় গণতন্ত্রে বিপদ আসেনা। বিপদ আসে শাসকশ্রেণীর পক্ষ থেকেই। শাসকশ্রেণী যতক্ষণ পর্যন্ত সংসদীয় গণতন্ত্রের মধ্য দিয়ে শ্রেণী-স্বার্থ বজায় রাখতে পারে ততক্ষণই সে সংসদীয় গণতন্ত্রের পথ মেনে নেয়। কিন্তু জনসাধারণের সচেতনতায় শাসকশ্রেণী যখন এই পথেও পরাজিত হয় তখন তারা

সংসদীয় গণতন্ত্রের পথ অস্বীকার করে। এর বাস্তব এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণ বাংলা দেশ।

"বাংলাদেশের জনগণ ভোট দিয়ে মুজিবর রহমানের আওয়ামী লীগকে ঐতিহাসিক ভাবে জয়যুক্ত করেছিলেন। এই হিসাবে ঐ দলের হাতেই বাংলাদেশের শাসনক্ষমতা আসা উচিত ছিল। কিন্তু পাকিস্তানের শাসকশ্রেণী এ সব সহ্য করতে পারল না। তাই সে জনগণের রায় অগ্রাহ্য করে সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বাংলাদেশের জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। জনসাধারণ তখন অস্ত্র হাতে তুলে নি ত বাধ্য হয়েছেন।

"আমাদের পশ্চিমবাংলাও শাসকশ্রেণীর মাধ্যমে শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা করতে পারছে না। তাই ১৯৬৭ ও ১৯৬৯ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ভেঙ্গে দেওয়া হল। এখানেও তাই মিলিটারী, সি-আর-পি, ১৪৪ ধারা ও অন্যান্য বিধি-নিষেধ আরোপ করে শাসকশ্রেণী জনসাধারণকে শায়েস্তা করতে উদ্যত হয়েছে। এখন পশ্চিমবাংলায় যা চলছে তা' বাংলাদেশের পূর্বাভাষ ছাড়া আর কি? এ বিষয়ে আমাদের সম্পূর্ণ সজাগ থাকতে হবে।"

তথ্য ও তত্ত্ব দিয়ে প্রমোদ দাশগুপ্ত বলেন, "বাংলাদেশের এই স্বাধিকারের সংগ্রাম হবে আরও দীর্ঘস্থায়ী। এই সংগ্রামের সমর্থনে আমাদের জনমত সংগ্রহ করতে হ'বে। অবিলম্বে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি, অস্ত্র-সাহায্য ও সীমান্তের বেড়া তুলে দেবার দাবীতে সরকারকে বাধ্য করতে হবে। এটাই যুব সমাজের সামনে বিরাট কর্তব্য।"

তিনি বলেন, "দেশে দেশে মুক্তি-সংগ্রামে চিরকাল যুবসমাজ ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। ইতিহাস তৈরি করেছেন পশ্চিমবঙ্গের যুবসমাজও। সমস্ত অত্যাচার, খুন, দমননীতির বিরুদ্ধে এখানকার যুবকরাও সংগ্রামী ঐতিহ্যের অধিকারী। আগামী দিনের বৃহত্তর সংগ্রামেও যুবকরা তাঁদের ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করবেন নিশ্চয়ই।"

৩০শে নভেম্বর প্রমোদ দাশগুপ্ত টিটাগড়ে এক জনসভাতে বললেন, "নকশালপন্থীরা আজ বিপ্লব-বিরোধী শক্তিতে পরিণত হয়েছে। নকশালপন্থীরা আজ কোন্ পথ নিয়েছে? আজ তাদের একমাত্র কাজ মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্টদের হত্যা করা। আমাদের পার্টিকে শাসকশ্রেণীর আক্রমণের মোকাবিলা না করতে দিয়ে আত্মরক্ষার্থে ব্যস্ত রাখাই তাদের উদ্দেশ্য।

"এই ভুল করার তো কোন বাস্তব ভিত্তি ছিল না। বাংলার সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের অভিজ্ঞতা তো তাদের সামনেই ছিল। ছিল আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের অমূল্য অভিজ্ঞতা। তবু কেন এই পথ নেওয়া হল—এরই মধ্যে নকশালপন্থীদের চরিত্র বুঝতে হবে। তাদের রাজনীতি আজ বাস্তবে প্রতিবিপ্লবী রাজনীতিতে পরিণত হয়েছে।"

একান্ন

রাজ্য-রাজনীতিতে দুটি ফ্রন্ট গঠিত হয়েছে। একটি ছ'পার্টি ফ্রন্ট। আর একটি আট পার্টি ফ্রন্ট।

যুক্তফ্রন্ট গঠিত হবার পর অনেক ভাঙ্গাগড়ার মধ্যে রাজ্যরাজনীতির এক পূর্ণ বিন্যাস সুরু হয়। যিনি একদিন কংগ্রেস ভেঙ্গে বেরিয়ে এসে রাজ্যের বাম রাজনীতির শরিক হয়েছিলেন, সেই অজয় মুখোপাধ্যায় আবার ধীরে ধীরে কংগ্রেসের দিকে ফিরতে সুরু করলেন। আট পার্টি-ফ্রন্টের পক্ষ থেকে যুক্তফ্রন্টকে বাঁচিয়ে তোলবার একটা চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু প্রমোদ দাশগুপ্ত এই আট পার্টি-ফ্রন্ট সম্বন্ধে মন্তব্য করেন : ওরা মাকড়শা। নিজের জালে জড়িয়ে মরবে।

এই সময় ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা অশোক ঘোষ দুর্ঘটনায় আহত হয়ে রামকৃষ্ণ মিশন হাসপাতালে ছিলেন। সেখানে অজয় মুখোপাধ্যায়, জ্যোতি বসু প্রভৃতি অনেকেই তাঁকে দেখতে যেতেন। অশোক ঘোষ সুস্থ হয়ে ট্যাংরার বাসায় ফিরে এলে জ্যোতি বসু একদিন তার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। সেখানেই অশোক ঘোষ জ্যোতি বসুকে আবার যুক্তফ্রন্ট বাঁচিয়ে তোলবার প্রস্তাব দেন। কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। সেদিন জ্যোতি বসু অশোক ঘোষের বাসা থেকে বেরিয়ে যাবার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় অশোক ঘোষের ঘরে গিয়ে হাজির। অশোক ঘোষের বাড়িতে জ্যোতি বসুর আসবার খবর বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় কি করে পেয়েছিলেন জানিনা। কিন্তু সে চেষ্টা সফল হল না।

রাষ্ট্রপতি শাসনের পর আবার নির্বাচন। এই নির্বাচন হল বহুমুখী। ছ'পার্টি এবং আট পার্টি জোট। আবার এই আট পার্টি জোট থেকে বেরিয়ে বাংলা-কংগ্রেস, কংগ্রেসের সঙ্গে গাঁটছড়া বাধল। নির্বাচনে সি-পি-আই (এম) একক শক্তিতে ১১৪টি আসন পেল।

অজয় মুখোপাধ্যায় কংগ্রেসকে নিয়ে সরকার গড়লেন। সি-পি-আই (এম) দলের উপর আক্রমণ সুরু হল বহুমুখে। এই নির্বাচনে সব চাইতে ক্ষতিগ্রস্ত হ'ল সি-পি-আই এবং ফরওয়ার্ড ব্লক। কিন্তু এই সরকারও স্থায়ী হলনা।

১৯৭২ সালে অনুষ্ঠিত হ'ল মধ্যবর্তী নির্বাচন। এক অভূতপূর্ব সন্ত্রাসের মধ্যে। এই নির্বাচনে এমন কারচুপি হ'ল যে জ্যোতি বসু পরাজিত হলেন বরানগরে। সি-পি-আই (এম)-এর ১১৪টি আসন হ্রাস পেয়ে মাত্র ২০টি আসনে নেমে এল।

১৯৭২ থেকে ১৯৭৭ সাল। পশ্চিমবঙ্গে এক নতুন ইতিহাস রচিত হল। অত্যাচার ও নিপীড়নের ইতিহাস। ১৯৭৫ সালের ২৫শে জুন সারাদেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে ঘোষিত হ'ল জরুরী অবস্থা।

১৯৭০ সালের পর থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত সময়ের একটি বর্ণনা প্রমোদ দাশগুপ্তের জ্যানীতে তুলে ধরছি :

"কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারের প্রত্যক্ষ পরিচালনায় এবং বাংলা-কংগ্রেস, দক্ষিণপন্থী কম্যুনিষ্ট পার্টি প্রভৃতির সহযোগিতায় ১৯৭০ সালে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারকে নীতি-বহির্ভূত উপায়ে উৎখাত করার পর থেকে ১৯৭৭ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত এই রাজ্যে এক বিভীষিকা, সন্ত্রাস ও দুর্নীতির রাজত্ব চলেছিল। কংগ্রেস পরিচালিত এই সন্ত্রাস ও দুর্নীতির উৎস-মূলে ছিলেন শ্রীমতী গান্ধী ও কংগ্রেসের জাতীয় নেতৃত্ব। পশ্চিমবাংলায় তার মূল রূপকার ছিলেন সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় ও তাঁর কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা।

"১৯৭০ সালের মার্চ মাসে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের পর থেকে সুরু করে ১৯৭২ সালের জাল-জুয়াচুরি-সন্ত্রাস চিহ্নিত নির্বাচনের পরবর্তী আধা-ফ্যাসিস্ত সন্ত্রাসের কালে, ১৯৭৫ সালের জুন মাসের পর কংগ্রেসের দলীয় স্বার্থে ও ইন্দিরা গান্ধীর ব্যক্তি-স্বার্থে চাপিয়ে দেওয়া আভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থার দম বন্ধ করা দিন-গুলিতে সিদ্ধার্থ রায়দের গুণ্ডাবাহিনী ও পুলিশ সি-পি-আই (এম)-এর ১১০০ সক্রিয় কর্মী, সভ্য ও সমর্থককে হত্যা করেছে। ১৯৭০ সালের মার্চ থেকে ১৯৭২ সালের নির্বাচন পর্যন্ত এই রাজ্যে ১৬৫৩টি রাজনৈতিক হত্যার ঘটনা ঘটেছিল। সাত বছরের কংগ্রেসী অপশাসনে গোষ্ঠী-কোন্দলে ১৩০ জন কংগ্রেসীকে প্রাণ দিতে হয়েছে ঐ দলেরই ঘাতকদের হাতে। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের শাসনকালে

১৮ জন পুলিশ আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছে। অ-রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের হিসাব নিলে দেখা যাবে ১৯৭১-৭২ সালে ২২৯৩টি, ১৯৭২ সালে ৮৩৪টি, ১৯৭৩ সালে ৯৪৩টি এবং ১৯৭৪ সালে ৯১২টি ঘটনা ঘটেছে।

"১৯৭১-৭২-এর পরে কংগ্রেস সরকারের দীর্ঘ পাঁচ-ছয় বছরের প্রত্যক্ষ শাসনকালে সি-পি-আই (এম)-এর ২০,০০০ কর্মী নিজেদের এলাকায় বসবাস করতে পারেননি। পুলিশের যোগসাজসে কংগ্রেসী গুণ্ডাবাহিনীর আক্রমণে অসংখ্য পার্টি-অফিস এবং তিনশো-র উপর ট্রেড ইউনিয়ন অফিস বন্ধ অথবা বেদখল হয়ে গিয়েছিল। বহু এলাকার বামপন্থী কর্মীদের স্বাভাবিক রাজনৈতিক কাজকর্ম, এমন কি, যাতায়াত 'নিষিদ্ধ' হয়ে গিয়েছিল।

"দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারকে উৎখাত করার পর কংগ্রেস নেতারা নকশালপন্থীদের একাংশকে বামপন্থী-আন্দোলনের উপর, বিশেষ করে মার্কস্‌বাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির উপর আক্রমণের জন্য ব্যবহার করেছিল। নকশালপন্থীদের খতম ও ব্যক্তিহত্যার রাজনীতিকে শাসকদল সুকৌশলে নিজেদের কাজে লাগিয়েছিল। হত্যা, অগ্নি-সংযোগ ও সন্ত্রাসের আবহাওয়া তৈরি করার গোপন উৎসাহ যোগান দিয়েছিল। এই সমস্ত ঘটনাকে কাজে লাগিয়ে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির অজুহাতে বিরাট সংখ্যক সি-আর-পি ও অন্যান্য কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী আমদানী করা হয়েছিল। আসল উদ্দেশ্য ছিল বামপন্থী ও বিরোধী শক্তিগুলিকে ধ্বংস করা। একই উদ্দেশ্যে কংগ্রেসদল সমাজবিরোধী মস্তানবাহিনীকে 'প্রতিরোধ'-এর নামে সংগঠিত করেছিল এবং হত্যা ও সন্ত্রাস সৃষ্টির জন্য ঢালাও অনুমতি দিয়েছিল। এই সব গুণ্ডাদের হাতে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র, গাড়ি ও অর্থ তুলে দেওয়া হয়েছিল। পুলিশ নিয়োজিত হয়েছিল এদের প্রহরা ও রক্ষার কাজে। এই সময়েই কংগ্রেস পরিচালিত দুই সংগঠন—যুব কংগ্রেস ও ছাত্র-পরিষদ মস্তানদের আখড়ায় পরিণত হয়।

"এই সময়েই নকশালপন্থীদের সম্পর্কেও দু'মুখো নীতি গ্রহণ করা হয়। যারা রাজনৈতিক কারণে কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলাতে অস্বীকার করে, পুলিশ তাদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে থাকে। অপর যে অংশের মধ্যে পুলিশ ও শাসক দলের লোক অনুপ্রবেশ করেছিল, তাদের সরাসরি বামপন্থী-নিধনের কাজে মেতে উঠতে নির্দেশ দেওয়া হয়। পরে যুব-কংগ্রেস ও ছাত্র-পরিষদের ভিতর তাদের টেনে নেওয়া হয়।

"১৯৭১ সালে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় কেন্দ্রীয় কংগ্রেস মন্ত্রিসভার সদস্য হন। কিছুদিন পরই রাষ্ট্রপতি শাসন প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি 'পশ্চিমবঙ্গের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী' নিযুক্ত হন। যে কোন যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতে এই ধরনের নিয়োগ নজির-বিহীন ও অসঙ্গত। কিন্তু সেই সময়ে কংগ্রেস নেতৃত্বের ন্যায়সঙ্গত ও শোভন আচরণ নিয়ে কোন মাথাব্যথা ছিল না। বামপন্থীদের শক্তি ও সি-পি-আই (এম)-কে নিশ্চিহ্ন করার উন্মত্ত প্রচেষ্টায় লিপ্ত কংগ্রেস নেতৃত্বের কাছে তখন একমাত্র জরুরী কাজ ছিল বামপন্থী-গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর পুলিশ-মস্তানবাহিনীর পাশবিক আক্রমণের ও সন্ত্রাসের আবহাওয়া বজায় রাখা।"

১৯৭৭-এর গোড়ায় জরুরী অবস্থা তুলে নিয়ে লোকসভায় নির্বাচনের ডাক দেওয়া হল। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসকে পরাজিত করতে বদ্ধপরিকর প্রমোদ দাশগুপ্ত জনতা পার্টির সঙ্গে হাত মেলালেন। ১৯৬৭ সালে কংগ্রেসকে ক্ষমতার বাইরে রাখতে প্রমোদ দাশগুপ্ত বাংলা-কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন। ১৯৬৯ সালে নির্বাচনে যে কোন দলের তুলনায় বেশী আসন পাওয়া সত্ত্বেও অজয় মুখোপাধ্যায়কে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে মেনে নিয়েছিলেন। ১৯৭১ সালে সি-পি-আই-কে কংগ্রেসের কোটর থেকে বের করে এনে সরকার গঠন করতে চেয়েছিলেন—সি-পি-আই সেদিন কংগ্রেসকে ত্যাগ করেনি। ১৯৭৭ সালে যখন লোকসভার নির্বাচন ঘোষণা করা হল, তখন কংগ্রেসকে পরাজিত করতে জনতা নেতাদের সঙ্গে হাত মেলালেন। লোকসভা নিবাচনে কংগ্রেস প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

কেন্দ্রে মোরারজী দেশাইয়ের নেতৃত্বে জনতা পার্টির সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। এই বিধানসভার নির্বাচনেও প্রমোদ দাশগুপ্ত জনতা পার্টির সঙ্গে ঐক্য স্থাপনে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু মোরারজী দেশাই ও প্রফুল্লচন্দ্র সেনের জিদের জন্য সেই ঐক্য হয়নি।

১৯৭৭ সালের জুন মাসে রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনে আবার ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গড়ে উঠল। ফরওয়ার্ড ব্লক, আর-এস-পি সহ কয়েকটি দলের সঙ্গে ১৯৭০ সাল থেকেই যে ফারাক সৃষ্টি হয়েছিল, জরুরী অবস্থার সময়ে যুক্ত আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সেই ফারাক হ্রাস পেয়েছিল। ৭৭-এর নির্বাচনে বামফ্রন্ট গঠিত হল। এই নির্বাচনে অসাধারণ সাফল্য ঘটল বামফ্রন্টের। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হল।

বামফ্রন্ট-এর কাঠামোগত পরিবর্তন করে প্রমোদ দাশগুপ্তকে চেয়ারম্যান করা হল। তিনি প্রথমে রাজী হন নি। পরে সরোজ মুখোপাধ্যায়, অশোক ঘোষ,

মাখন পালের অনুরোধে প্রমোদ দাশগুপ্ত বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান হন। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে বামফ্রন্ট সরকারের যাত্রা সুরু হল। নতুন বামফ্রন্ট এবং তার সরকারের পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রমোদ দাশগুপ্ত নতুন দৃষ্টিভঙ্গী আরোপ করেন—বামফ্রন্ট কমিটি নীতি নির্ধারণ করবে এবং সরকার সেই নীতিকে রূপায়িত করবে। এই নীতির ফলে বামফ্রন্ট কমিটির চেয়ারম্যান রাজ্যের সামগ্রিক পরিচালনায় এক নম্বর ব্যক্তি হয়ে ওঠেন।

১৯৭৮ সালের ৫ই থেকে ১০ই ফেব্রুয়ারী কলকাতায় সি-পি-আই (এম) দলের ত্রয়োদশ রাজ্য সম্মেলন হয়। প্রমোদ দাশগুপ্ত আবার রাজ্যপার্টির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। দলের চতুর্দশ রাজ্য সম্মেলন ১৯৮১-র ২৭শে ডিসেম্বর থেকে ১৯৮২-র ৩রা জানুয়ারী কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। এবারও রাজ্য-কমিটির সম্পাদক হন প্রমোদ দাশগুপ্ত। তিনি রাজ্য-কমিটির সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করতে ১৯৭৮ সালেও রাজী ছিলেন না, ১৯৮২-তেও নয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজী হয়েছিলেন।

১৯৮০ সালে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কেন্দ্রে ক্ষমতায় ফিরে এসে লোকসভায় নতুন নির্বাচনের ডাক দিলেন। সেই নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস এবং জনতা—দুই দলই প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। লোকসভায় ৪২টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস মাত্র তিনটি আসন পেল। জনতা একটিও নয়।

১৯৮২ সালে অনুষ্ঠিত হল বিধানসভা নির্বাচন। '৮২-তে প্রমোদ দাশগুপ্ত পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট কমিটির চেয়ারম্যান। আর রাজ্যের প্রায় সব লোকসভা ও বিধানসভা আসন বামফ্রন্ট ও সি পি-আই (এম)-এর দখলে।

১৯৮২ সালে বামফ্রন্ট সরকার গঠনের ক্ষেত্রে অনেক জটিলতা সৃষ্টি হয়েছিল। কয়েকটি পার্টির মন্ত্রিসভায় না থাকার সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছিল। কিন্তু প্রমোদ দাশগুপ্ত সব পরিস্থিতিকে সামাল দেন। বামফ্রন্টের ঐক্যই যে শুধু অটুট থাকে তাই নয়, সি-পি-আই-ও বামফ্রন্টের শরিক হয় ও সরকারে যুক্ত হয়। কঠিন অবস্থার মোকাবিলা করে পশ্চিমবঙ্গের বাম ঐক্যকে সার্বিক রূপ দেন প্রমোদ দাশগুপ্ত।

১৯৭৮ সালের জুন মাসে রাজ্যের তিন স্তরের পঞ্চায়েত-নির্বাচন পরিচালনা প্রমোদ দাশগুপ্তের জীবনে এক অসাধারণ সাফল্যের দিক্‌চিহ্ন। পঞ্চায়েতের ৫৬,০০০

আসনে বামফ্রন্টের মধ্যে সমঝোতা এবং ৩৮,০০০ আসনে জয়লাভ এক অসাধারণ নজির। একইভাবে, ১৯৮১ সালের ৩১শে মে ৮৬টি পৌরসভা নির্বাচনে প্রায় ৮৬টি পৌরসভাতেই বামফ্রন্টের জয়লাভ এক তুলনাহীন নজির।

১৯৮২ সালে প্রমোদ দাশগুপ্ত যখন বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান হন তখন পঞ্চায়েত থেকে সুরু করে লোকসভা পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব আসন বামফ্রন্টের দখলে নিয়ে আসা বামফ্রন্টের যৌথ নেতৃত্বে সফল হয়েছে। কিন্তু এই নেতৃত্বের প্রতিটি ক্ষেত্রের, প্রতিটি কৌশলের রূপকার ছিলেন প্রমোদ দাশগুপ্ত। স্বাস্থ্য অনেক আগেই ভেঙ্গে গিয়েছিল। সেই ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়েই পরিচালনা করেছিলেন দল ও বামফ্রন্টকে। বামফ্রন্টের হাতে যেমন সর্বস্তরে সার্বিক ক্ষমতা এনে দিয়েছিলেন, তেমনই পার্টিকেও সম্প্রসারিত করেছেন সর্বস্তরে। ১৯৮২ সালে প্রমোদ দাশগুপ্ত শেষবারের মতো যখন রাজ্য-কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন, তখন পার্টির এবং শাখা-সংগঠনের সদস্য সংখ্যা মিলিতভাবে এক কোটি। রাজ্যের সাত কোটি মানুষের মধ্যে এক কোটি মানুষ সি-পি-আই (এম)-এর পতাকা বহন করে। দলের এই সাফল্য সম্ভব হয়েছে প্রমোদ দাশগুপ্তের ২৩ বছর ব্যাপী রাজ্য-পার্টির পরিচালনায় যোগ্যতা ও কৌশলে।

১৯৮১ সালের গোড়ায় আমন্ত্রণ পেলেন ভিয়েতনাম যাবার। যে স্বাস্থ্য, তাই নিয়ে রাজ্য কেন, ঘরের বাইরে যাওয়া উচিত নয়। কিন্তু প্রমোদ দাশগুপ্ত ভিয়েতনাম গেলেন। এ যেন তীর্থ-দর্শন। যে সব জায়গায় ভিয়েতনামের বীর জনগণ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম করেছিল, সেই সব স্থান তিনি দেখলেন। ঘুরে দেখলেন লাওস্ ও কাম্পুচিয়া। ফিরে এলেন তীর্থ-দর্শন করে।

বাহান্ন

১৯৮২ সাল শেষ হতে চলেছে। অনেকের ইচ্ছা, চিকিৎসার জন্য তাঁকে বিদেশে পিকিং-এ পাঠানো হোক। কিন্তু তিনি কখনও রাজী হন নি। শুধু পরিহাসে বলতেন : মস্কো-পিকিং গিয়ে কি হবে। ওরা কি আমার হার্ট, লিভার বদলে দিতে পারবে ?

তবু শেষ পর্যন্ত রাজী হলেন পিকিং যেতে। রাজী হয়েছিলেন দু'টি কারণে। একটি, চীন দেশটা দেখা এবং দ্বিতীয় কারণ, চীনের কম্যুনিষ্ট পার্টির সঙ্গে সি-পি-আই (এম)-এর ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি করা। তাই শেষ পর্যন্ত চীনে যেতে রাজী হলেন। প্রকৃতপক্ষে এম বাসবপুন্নিয়া সহ পার্টি নেতাদের প্রায় ছ'মাস সময় লেগেছিল তাঁকে চীনে যাওয়ার জন্য রাজী করাতে।

১৯৮২ সালের ২৬শে অক্টোবর রাত্রি দশটায় প্রমোদ দাশগুপ্ত পিকিং-এর উদ্দেশে কলকাতা ত্যাগ করলেন। ২৬শে অক্টোবর থেকে ২৯শে নভেম্বর পর্যন্ত দিনগুলির বিবরণ তাঁর পিকিং-বাসের একমাত্র ও সর্বসময়ের সঙ্গী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের লেখা 'মৃত্যুর আগের দিনগুলি' ও 'শেষের ক'দিন' নিবন্ধ দুটিতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। প্রমোদ দাশগুপ্তের শেষের দিনগুলির বর্ণনা দিয়ে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বলেছেন :

"২৬শে অক্টোবর দমদম এয়ার-পোর্টে প্রমোদদা'কে বিদায়-সংবর্ধনা জানাতে উপস্থিত ছিলেন যাঁরা, তাঁদের সকলেরই মনে আছে কি সুন্দর একটা পরিবেশ গড়ে উঠেছিল সেই রাত্রিতে। প্রমোদদা অকাতরে সেদিন কমরেডদের উষ্ণ ভালবাসা ও শ্রদ্ধার সান্নিধ্যে ছিলেন বেশ কিছুক্ষণ। মানসিক ভাবেও নিজেও ছিলেন সহজ, সরল। অবশেষে কর্তৃপক্ষের নির্দেশে যখন এয়ার-ইণ্ডিয়ার বিমানে গিয়ে উঠলাম, তখন ওঁকে মনে হচ্ছিল সব দিক থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ। ৬ ঘণ্টা আমাদের আকাশে টানা ওড়া—মাঝখানে ব্যাংককে প্রায় ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম নেওয়ার মত থামা। হংকং-এ যখন পৌঁছলাম সে দেশে ভোর হয়েছে। দীর্ঘ ইণ্টারন্যাশনাল এয়ার পোর্ট পেরিয়ে চীন সরকারের এক প্রতিনিধি ও এক ভারতীয় বন্ধুর (সুভাষ চক্রবর্তীর বন্ধু) সাহায্যে আমরা হংকং-এর এয়ারপোর্ট হোটেলে কয়েকঘণ্টা আশ্রয় নিলাম। দুপুর ২টোয় আমাদের পিকিং যাত্রা সুরু। সন্ধ্যে ৭টায় যখন পিকিংয়ে নামলাম, তখন কি রকম অবসন্ন শীতের সন্ধ্যা। প্রমোদদাকে দেখলাম একটু গম্ভীর। পায়ে পায়ে নেমে প্লেন ছেড়ে যখন বিমান বন্দরে পৌঁছলাম তখন চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির যোগাযোগ বিভাগের অন্যতম ডিরেক্টর হো তাঁর দু'জন ডেপুটি ও একজন দোভাষী সহ আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। তাঁরা সোজাসুজি প্রমোদদা'র দিকে এগিয়ে এসে 'কমরেড দাশগুপ্ত' বলে সম্বোধন করে সম্ভাষণ করলেন। তারপর একটানা গাড়িতে প্রায় একঘণ্টা বিমান বন্দর থেকে ওয়ানসোউ (দীর্ঘ-

জীবন) পার্টির অতিথিশালায় এসে পৌঁছুলাম। পথে আসতে আসতে ডিরেক্টর হো দোভাষী চেন মারফত প্রমোদদার সঙ্গে কিছু কথাবার্তা সেরে নিলেন। কালকের দিনটা আমাদের বিশ্রাম। পরশুদিন যেতে হবে হাসপাতালে চেকআপ করাতে।

"ওয়ানসোউ—যেখানে আমাদের রাখার ব্যবস্থা হলো—একটি দোতলা মনোরম বাড়ি। বিদেশী অতিথিরাই থাকেন। চারপাশে গাছপালা, ফুলের বাগান, সাজানো ছিমছাম। সারাক্ষণ পাহারা দিচ্ছেন কয়েকজন লিবারেশন আর্মির তরুণ। একশো-এক নম্বর ঘর প্রমোদদা'র। পাশাপাশি ঘরে আমি আর দোভাষী চেন্।

"২৯ তারিখ সকালবেলা আমরা গেলাম ট্রাডিশনাল মেডিসিন অ্যাকাডেমিতে। এটি একটি গবেষণা ও চিকিৎসাকেন্দ্র। ডাক্তার শূ' এর প্রধান। দীর্ঘক্ষণ ধরে পরীক্ষা চললো। পরীক্ষা পদ্ধতি দেখে মনে হল আধুনিক ও প্রাচীন পদ্ধতির সংমিশ্রণ। পরীক্ষা শেষে ডাক্তার পরামর্শ দিলেন কিছু ওষুধ ও আকুপাংচার। অতিথিশালায় থেকেই চিকিৎসা হবে। আর যে ওষুধগুলি প্রমোদদা খাচ্ছিলেন সেগুলি চলতে থাকবে বলে জানালেন। ডাক্তার চেং লিয়াং আসতেন আমাদের ওখানে আকুপাংচার করাতে, সঙ্গে আসতেন নার্স ওয়াং মিন। কাজের ফাঁকে ফাঁকে সরল ব্যবহার ও মানবিকতার স্পর্শ আমাদের আকৃষ্ট করত। কিছুদিনের মধ্যেই চিকিৎসার কিছুটা ফল পাওয়া গেল। প্রমোদদা নিজেই বলতেন: কাশিটা বন্ধ হয়েছে। হাঁপানির সমস্যাও অনেক কম। এইভাবে চললে, বুঝলে, ফিরে গিয়ে মিটিংগুলোয় কিছুক্ষণ বলতে পারব।

"চিকিৎসার ফাঁকে ফাঁকে আমরা ঘোরাফেরাও করেছি। ৪ঠা নভেম্বর আমরা বেরোলাম মাও-সে-তুঙয়ের সমাধিভবন দেখতে। চার সারি লাইনে কাতারে কাতারে মানুষ। যদিও আমাদের লাইনে দাঁড়ানোর প্রয়োজন ছিল না তবুও বিরাট সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠতে হবে বলে প্রমোদদা রইলেন নিচে। আমি ঘুরে এসে জানালাম ভেতরে কি দেখলাম। প্রমোদদা বললেন, 'আমি দেখছিলাম মানুষের ভীড়। মাও-সে-তুঙ এদেশের মানুষের মনে কতখানি স্থান করে রেখেছেন।' তখন সকাল ১০টা। তিয়েন মিয়েন স্কোয়ারে উজ্জ্বল এক জনতা। শিশু, স্কুলের ছাত্র, সৈনিক, গ্রাম থেকে আসা কৃষক, কিছু বিদেশীর ভীড়। সেই ভীড়ের মধ্য দিয়ে আমরা চললাম 'গ্রেট হল অব্ দি পিপল্' দেখতে। তারপর

'গ্রেট অব হেভেনলি পীস', যার মাথায় গোটা পিকিংয়ের মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম মাও-সে-তুঙয়ের ছবি টাঙানো। পরের দিন গিয়েছিলাম অ্যাক্রোবেটিকস্ দেখতে, সন্ধ্যাবেলা। সহরের প্রধান রাস্তা 'চিরশান্তির সড়ক'-এর উপরেই ছোট একটি হল। সন্ত জাপান থেকে ফেরা এই দলটির কর্মসূচী নিশ্চয়ই আকর্ষণীয় ছিল। তার পরের দিনও আমরা বেরিয়েছিলাম চীনের প্রাচীর দেখতে। এইখানেই চীনা কমরেডরা প্রায় কৌশল করে প্রমোদদার আপত্তি সত্বেও একটা ফটো তুলেছিলেন। সেটিই চীনে প্রমোদার একমাত্র এবং শেষ ফটো।

"সকালে বা বিকেলের অনেকটা সময় আমাদের যেত আলাপ-আলোচনায়। চীনে প্রবাসী ভারতীয়রা আসতেন। পি-টি-আই, ভারতীয় দূতাবাস বা চীন সরকারের কর্মরত ভারতীয়রা। অনেক সময় শুধু আমি বা প্রমোদদা বসেই আলোচনা করতাম। আমাকেই জিজ্ঞাসা করতেন, 'কি দেখলে আজ? দোকানে জিনিষপত্র কিনতে গিয়ে?' আমি টুকরো টুকরো ঘটনা বলতাম। কখনও বাঁধাকপির পাহাড়, গ্লাসপাতির স্বাদ, বাসে মহিলা ড্রাইভার, বইয়ের দোকানে বিদেশী বই, রাস্তায় ঝাড়ু দিচ্ছেন যিনি তাঁর মাইনে—এই সব ঘটনা থেকেই রাজনীতির আলোচনা সুরু হত। চলত অর্ধেক রাত পর্যন্ত। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ক্ষয়ক্ষতি, দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবার নতুন উদ্যোগ, চীন সরকারের বৈদেশিক নীতি, জনস্বাস্থ্য, সহরে দূষণ-বিরোধী ব্যবস্থাপনা—সব কিছু প্রসঙ্গই আসত। প্রমোদদা বলতেন, 'এগুলো আমাদের গভীরে গিয়ে বোঝা দরকার।' কথায় কথায় দেশের কথা উঠত। খরার অবস্থা কী? কোন জেলায় কি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে? ত্রাণ তহবিলে টাকা উঠছে কি না? 'মার্কসবাদী পথ' সময় মত বেরুচ্ছে কি না? মেদিনীপুরের কৃষক সম্মেলনের সমাবেশের জমায়েত কত হলো? পার্টি মেম্বারশীপের লক্ষ্যে পৌছে নবীকরণের ডাক দিতে হবে। এই সব ভাবনা চিন্তার মাঝে আমাকে বলতেন, 'অনিল ফোন করলে যতটা খবর নেওয়া যায় নেবার চেষ্টা করো।'

"৮ই নভেম্বর চীনা পার্টির যোগাযোগ বিভাগের উপদেষ্টা কমরেড ঝাং শিয়াং সান আমাদের ডিনারে আমন্ত্রণ জানালেন। সব মিলিয়ে ১৪ জন উপস্থিত। খাওয়াদাওয়া ভালই হ'লো। প্রমোদদা সাধারণতঃ যা খান, ওদের অনুরোধে যেন একটু বেশীই খেলেন। উপদেষ্টার সংক্ষিপ্ত ভাষণের উত্তরে উনিও সংক্ষেপে

ভাষণ দিলেন, যার মূল বিষয় ছিল—চীনে সমাজতন্ত্রের সাফল্যের তাৎপর্য, ভারত ও চীনের জনগণের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের ঐতিহ্য। যোগাযোগ বিভাগের উপদেষ্টা তার দু'দিন পর পরই বিকালবেলা আসতেন প্রমোদদার সঙ্গে দেখা করতে। সেদিনও আলোচনা হলো। উপদেষ্টা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রমোদদা'র শরীর সম্পর্কেও অনেকগুলি প্রশ্ন করলেন। প্রমোদদা বললেন, খানিকটা উন্নতির লক্ষণ মনে হচ্ছে। সেদিন ঘরের মধ্যে একটা সাফল্যের পরিবেশ গড়ে উঠেছিল।

"সেদিন এও ঠিক হ'ল পরের সপ্তাহে আমরা ক্যান্টনে চলে যাব। সেখান থেকেই চিকিৎসা হবে। কারণ পিকিংয়ে ঠাণ্ডা শূন্যের নীচে নামতে সুরু করেছে। যদিও সেটা আমাদের কাছে বড় সমস্যা ছিল না। শীত নিয়ন্ত্রণের সমস্ত ব্যবস্থাই ঘরের ভেতর ছিল। আর সারাদিন ঝড়ের মতো হাওয়া। সেই দিন রাতে (১০ই নভেম্বর) রাজনৈতিক আলোচনার সাফল্য, চিকিৎসার আংশিক সাফল্য, বাইরে ঝড়ের আবহাওয়ার মধ্যে প্রমোদদা বললেন, 'আজ রাত্তিরে তুমি খেয়ে আসবে। আমি আর কিছু খাব না। এক বোতল কমলা-লেবুর সরবত নিয়ে এসো। তাই খাব। খাবার ইচ্ছে নেই।' অনুরোধ করেও খাওয়ানো গেল না। তখনও বুঝিনি এ কিসের ইঙ্গিত।

"পরের দিনগুলিতে খাওয়া ক্রমশঃই কমে আসতে লাগল। উনি বললেন 'দেখেছো তো, এ তো আগেও হয়েছে আমার। দেখা যাক কয়েকটা দিন। আবার খেতে পারি কিনা।' ডাক্তাররা কিন্তু তিন দিন পর থেকেই গ্লুকোজ স্যালাইন ওয়াটারের ইনফুউশান সুরু করে দিলেন। তাঁরা বললেন এটা না করলে শরীর দুর্বল হয়ে যাবে। এই অবস্থাতেই ১৭ তারিখ বেশ রাতে ওঁর নিঃশ্বাসের সমস্যা সুরু হলো। সমস্যাটা অনেকক্ষণ ধরে চলায় আমি মাঝরাতে চীনা কমরেডদের খবর দিলাম। তাঁদেরই অনুরোধে মধ্য রাত্রে আমরা পিকিং হসপিটালে গেলাম। শেষ রাত্রি থেকে অক্সিজেন দেবার পর উনি খানিকটা আরাম পেলেন এবং ঘুমিয়ে পড়লেন। পরের দিন সকাল থেকে সুরু হলো অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা। হাসপাতালের পরিবেশে আমার মনের উপর চাপ পড়েছিল। আমি প্রমোদদাকে বলে ফেললুম 'শেষ পর্যন্ত যখন হাসপাতালে আসতে হলো, চলুন আমরা ফিরে যাই। আর ক্যান্টনে গিয়ে লাভ নেই।' উনি বললেন, 'দেখা যাক ওরা পরীক্ষাগুলো শেষ করুক তারপর কি দাঁড়ায়।'

ওঁর মনোগত অবস্থা তখনও ফিরে আসবার নয়। পরীক্ষার ফল হিসাবে ডাক্তাররা আমাদের জানালেন, খাওয়ার অনিচ্ছা একটা বড় সমস্যা। কিন্তু ফুসফুস ও হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়াও ভাল নয়।"

"শেষ পর্যন্ত প্রমোদদা রাজী হলেন কলকাতায় পার্টি অফিসে মতামত নিয়ে ফিরে আসার ব্যবস্থায়। এর আগে পর্যন্ত বলতেন, 'কাশিটায় অনেক আরাম পেয়েছি, হাঁপানির ভাবটাও কম। আর কয়েকটা দিন দেখা যাক। ক্যাণ্টনে গেলে ঠিক হয়ে যাবে।' কলকাতায় কথা বলে ঘরে এসে যখন রিপোর্ট করলাম, বললেন, 'আমার শরীরের কথা কি বলেছ? ওরা আবার ঘাবড়ে না যায়। সরোজবাবুকে কিছু বলনি তো?' আমি বললাম, 'অনিলকে বুঝিয়ে বলেছি। ওরা দুশ্চিন্তা করবে এমন কিছু বলিনি।'

"তার দু'দিন পরই অর্থাৎ ২৫শে নভেম্বর থেকেই তাঁর জ্বর এলো। সঙ্গে আনুসঙ্গিক আরো সমস্ত সমস্যা। কিছুই খেতে পারছেন না। হাত পা ফুলে গেছে, পায়খানা-প্রস্রাবের উপরও নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছেন। সব চেয়ে বড় সমস্যা শ্বাস নেবার। খালি উঠে বসতে চাইছেন। কিন্তু উঠে বসার ক্ষমতা নেই, আবার শুয়ে পড়ছেন। ডাক্তাররা খুবই তৎপর। তাঁরা চেষ্টাও করছেন আপ্রাণ। সারাদিনের শেষে রাত্রিতে একবার আমাকে এবং চীনা কমরেডদের ডেকে পরিস্থিতি বলতে লাগলেন। তাঁরা একটি বিষয়ের উপর জোর দিলেন যে, হার্ট-ফেলিওর-এর সমস্যাটাই এখন সব চেয়ে বড় সমস্যা। এই ব্যাপারে তাঁরা কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন আমাদের বোঝালেন।

"এই ভাবে ২৬শে নভেম্বর এলো। ঐ দিন ডাঃ বিজয় বসু, সোমনাথ চ্যাটার্জী, অহল্যা রঙ্গনেকার সহ আরো কমরেডরা হাসপাতালে এলেন। ডাঃ বিজয় বসু ওখানকার ডাক্তারদের সঙ্গে অনেকক্ষণ চীনাভাষায় কথা বললেন সমস্ত বিষয়টা নিয়ে। প্রমোদদা'র সঙ্গেও কথা বলার চেষ্টা করলেন। কিন্তু প্রমোদদা'র জ্বর তখন ১০২। সবাইকে চিনতে পারলেন, কিন্তু কথা বলতে পারছেন না। ডাঃ বসু তাঁকে অনুরোধ করলেন যাওয়ার বিষয়টি দু'একদিন পিছিয়ে দিতে এবং আমাকে বললেন, তাঁর সামগ্রিক যা অবস্থা আর হার্টকণ্ডিশন যা, ২৮ তারিখে ফেরা হবে না। আমাদের ২৮শে নভেম্বর হংকং-এ ফেরা এবং ১লা ডিসেম্বর হংকং থেকে কলকাতায় ফেরার কথা ঠিক হয়েছিল। আমি কলকাতায় জানালাম ২৮ তারিখে ফেরাটা অনিশ্চিত হয়ে যাচ্ছে।

"২৬ তারিখে পরিস্থিতি একই ভাবে চললো। খাবার খেতে পারছেন না। জ্বর-শরীরে দুর্বলতা-বেদনা এবং শ্বাসকষ্ট সমস্যা। ঐ দিন বললেন, ২৮ তারিখে তো যাওয়া হবেনা দেখতে পাচ্ছি। তুমি কিন্তু এক ফাঁকে বেরিয়ে কমরেডদের জন্য যা কিছু কেনার কিনে ফেলো। দু'একটা জিনিষ কিন্তু এখনও বাকী আছে। আর আমাদের একদিনের আলোচনা—সেটাও বাকী আছে চীনা কমরেডদের সঙ্গে। রাত্রিবেলা ডাক্তাররা মিটিং করে সেদিনও জানালেন হার্টের ব্যাপারে তাঁরা এখনও ভয় পাচ্ছেন। ইতিমধ্যে কলকাতা থেকে আমাকে জানানো হয়েছে কমরেড বাসবপুন্নাইয়া পিকিং-এর পথে রওনা হয়েছেন।

"পরের দিন ২৮ তারিখ। আমি সব সময়েই ভাবছি কখন বাসবপুন্নাইয়া এসে পৌঁছবেন। উনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'পার্টি অফিসে কি খবর দিচ্ছ?' আমি বললাম, 'গতকাল বলেছি শরীরটা আপনার খুবই খারাপ।' বললেন, 'কেন বলেছ এ সব? কি অবস্থা হবে বুঝতে পারছো না? আজকে বলে দিও জ্বর সেরে গেছে।' ২৮ তারিখে সারাদিন সত্যি আর জ্বর এলো না। ভাবছিলাম, ১লা ডিসেম্বর যদি হংকং থেকে প্লেন এখনও ধরা যায়। যদি আর জ্বর না আসে নিশ্চয়ই পারবো। চিকিৎসকরাও বললেন, গত তিন দিনের চাইতে অবস্থা ভালো।

"বিকেল সাড়ে চারটার সময় বিছানায় উঠিয়ে দেবার পর বললেন, 'পা ঝুলিয়ে বসব। আর চুরুটটা দাও খাব।' চুরুটটা ধরিয়ে দেবার পর বললেন, 'এম বি কখন আসবেন? তিনি আসলে কিন্তু যাওয়ার ব্যাপার সব ঠিক করে নিও। আর পিছিয়োনা। আর পেছোলে আমাকে আর নিয়ে যেতে পারবেনা। চীনা কমরেডদের বুঝিয়ে বলতে হবে। আর জ্যোতিবাবুর সঙ্গে কথা বলো, সুভাষ যদি একদিনের জন্য হংকং আসতে পারে, যেদিন আমরা যাবো। আসার সময় তো দেখেছো আনতে আমায় কত অসুবিধা হয়েছে! দু'জনে মিলে ঠিক পারবে। এম বি আসলেই তুমি চলে যাও ওঁর সঙ্গে কথা বলতে। কি হলো কাল শুনবো।' এটাই প্রমোদদা'র শেষ কথা।

"সন্ধ্যায় এম বি এসে গেলেন। রাত্রে এম বি-র কাছে গেলাম। উনিও রাজী হলেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিয়ে যেতে। সকালে চীনা কমরেডরা যখন আমাদের কাছে আসলেন তাঁরাও রাজী হলেন। দুপুর তিনটের সময় আমরা গিয়ে ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলে সব চূড়ান্ত করবো।

"পরের দিন অর্থাৎ ২৯শে নভেম্বর অনেক সকালে আমি হাসপাতালে গেছি। বুঝতে পারলাম না, মনে হলো ঘুমোচ্ছেন। আমি এম বি-র সঙ্গে যা কথা হয়েছে সব বললাম। বুঝতে পারছিনা উনি আমার কথা বুঝতে পারছেন কি না। কোন উত্তর দিচ্ছেন না। আমি সমস্ত কথাগুলো দু'বার বললাম। উনি কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর এ পাশ ও পাশ ফিরছিলেন। দেখে মনে হচ্ছিল ঘুমোনোর চেষ্টা করছেন। কিন্তু পারছেন না। এ ভাবে দুপুর পর্যন্ত কাটলো। আমি এর মধ্যে আরও দু-একবার জিজ্ঞেস করেছি, 'আমায় কিছু বলবেন? এম বি তিনটের সময় আসবেন।' কোন কথারই উত্তর দিচ্ছিলেন না। ঘরের মধ্যে তখন একজন ডাক্তার সব সময়ে ছিলেন। তিনি একটা ইনজেকশন দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। পাশে একটি ঘরে গিয়ে আরও দু'জন ডাক্তারের সঙ্গে কি কথাবার্তা বললেন। আমি আবার এ ঘরে ফিরে আসলাম। সঙ্গে ছিলেন কমরেড চেন, ওঁর দোভাষী। তিনি সব সময়েই আমার সঙ্গে ছিলেন। ১২টা ৫০ মিনিট নাগাদ প্রমোদদা কম্বল থেকে হাতটা বের করে হাতের আঙুলগুলো দেখছিলেন। আমি আর একবার কথা বলার চেষ্টা করলাম। আমায় কি একটা বলতে গেলেন। মনে হলো, হাসতে হাসতে কথাটা সুরু করেছিলেন। সুরু করার আগেই মাথাটা নুয়ে পড়ে গেল। মুখ থেকে তাঁর বাঁধানো দাঁতটা বেরিয়ে এলো, ফেনা জমে গেল মুখে। আমি আর কমরেড চেন ছুটে ডাক্তারদের ডাকতে গেলাম পাশের ঘরে। ডাক্তাররা সঙ্গে সঙ্গেই চলে এলেন। ওঁরা এক ঘণ্টা ধরে চেষ্টা করেছেন তারপর, যা কিছু করার সবই করেছেন। পিকিং টাইম ১টা ৪৫-এর সময় ডাক্তাররা বললেন: আর পারলাম না।"

সব শেষ। মৃত্যু হ'ল প্রমোদ দাশগুপ্তের মরদেহের। কিন্তু গত অর্ধ-শতাব্দীরও অধিক সময় বাংলা তথা ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্র যাঁর বলিষ্ঠ ও বিপ্লবী পদ-চারণায় চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, ভারতবর্ষে বাম-রাজনীতির শীর্ষে যাঁর আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্টের উদ্গাতা এবং তাকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করার এক বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত যিনি স্থাপন করে গেলেন, শেষ সংগ্রামের দিগ্‌দর্শী সেই প্রমোদ দাশগুপ্তের মৃত্যু নেই।
